পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

জানুয়ারী - ডিসেম্বর 2017

গিরীন্দ্র শেখর বসু ও সিগ্‌মান্ড্‌ ফ্রয়েডের পত্রালাপ
প্রযুক্তি নিয়ে একটা এবড়ো কেবড়ো লেখা
এ সব নিয়ে কেউ লেখে নাকি
সাম্প্রতিক প্রযুক্তির আলপথ ধরে
বিজ্ঞানমনস্কতা রেনেসাঁ ও মানবতাবাদ
আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া 'আবিষ্কার'
বিজ্ঞান, গণবিজ্ঞান, জনগণ এবং আমাদের ব্যর্থতা
তিলোত্তমাও কি ক্রমশঃ ধোঁয়াশার করাল গ্রাসে ?
প্লাস্টিক এবং থার্মোকল নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করার প্রস্তাব
প্রাচীন ভারতের উত্তরাধিকার
রোগীর প্রয়োজনীয় রক্ত যোগারের কঠিন লড়াই
জুপিটারিয়ানস্‌
যৌনকর্মীদের সন্তানদের রাহুল বিদ্যানিকেতন
প্রসঙ্গ চিকিৎসা একটি অভিজ্ঞতা
এশীয় মনোচিকিৎসার পথিকৃৎ গিরীন্দ্রশেখরকে বিস্মরণ ও ধ্বংসলীলা

আমাদের পরম পরিবেশ-বন্ধু প্রয়াত বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইতের ছবি ও পরিচয়

http://speedydeletion.wikia.com/wiki/Draft:Bishuddhananda Purokait

http://commons.wikimedia.org/wiki/file:Bishuddhananda Purokait.jpg

সৌমেন গুহর নির্বাচিত রচনার ই-বুক

http://sites.gppg;e/cp,/site/saumenguha1/

অভিজিৎ লাহিড়ীর রচনার ওয়েবসাইট

http://physics and more.net/index.html

সুভাষ চন্দ্র গাঙ্গুলীর নির্বাচিত রচনার ই-বুক ও ওয়েবসাইট

http://sites.google.com/site/subhascganguly/writings

RANDOM THOUGHTS

http://sites.google.com/site/writingsofsganguly/

বিধিবদ্ধ ঘোষণা

পত্রিকার নাম	বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রকাশনার ভাষা	বাংলা ও ইংরাজি
প্রকাশনার স্থান	বি 27/1 কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কলকাতা
প্রকাশকাল	ত্রৈমাসিক
প্রকাশকের নাম	রবীন মজুমদার
জাতি	ভারতীয়
ঠিকানা	বি 27/1 কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কলকাতা
মুদ্রকের নাম, জাতি, ঠিকানা	ঐ
সম্পাদকের নাম, জাতি, ঠিকানা	ঐ
প্রেসের নাম ও ঠিকানা	ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে

আমি, শ্রী রবীন মজুমদার, ঘোষণা করছি যে, উপরি-উক্ত বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতো সত্য।

স্বা রবীন মজুমদার
প্রকাশক, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বর্ষ 40 সংখ্যা 1-4 জানুয়ারী — ডিসেম্বর 2017

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
বর্ষ 40 সংখ্যা 1-4
জানুয়ারী — ডিসেম্বর 2017

প্রযত্নে: রবীন মজুমদার
B 27/1 কালিন্দী হাউসিং এস্টেট
কলকাতা-700089

মূল্য: পঞ্চাশ টাকা

Vigyan O Vigyankarmi
Rgn. No.34929/79

Volume XL, No.1-4
January 2017 to December 2017

Contact:
Rabin Majumdar
<rabin.majumdar@gmail.com>
B 27/1 Kalindi Housing Estate
Kolkata-700089

Website: www.scienceandsocietyinbob.com

সূচীপত্র

শিরোনাম	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা: সেই মনে পড়ে.....	সম্পাদকমন্ডলী	1
অনুবাদ: গিরীন্দ্র শেখর বসু ও সিগ্‌মান্ড্‌ ফ্রয়েডের পত্রালাপ	অনুবাদ—লতিকা গুহ	2
প্রযুক্তি নিয়ে একটা এবড়ো খেবড়ো লেখা	শুভেন্দু দাশগুপ্ত	14
ছিছি, এ সব নিয়ে কেউ লেখে নাকি	অনিন্দ্য রুদ্র	17
অনুবাদ: সংবাদপত্রে বাবা রাম দেবের বিজ্ঞাপন	পুষ্প এম ভার্গভ	21
বিশুদ্ধ বিজ্ঞান তত্ত্বের বিরুদ্ধে যায়	অনুবাদ—লতিকা গুহ	
সাম্প্রতিক প্রযুক্তির আলপথ ধরে	সত্যবান রায়	22
বিজ্ঞানমনস্কতা রেনেসাঁ ও মানবতাবাদ—এক অসমাপ্ত বিপ্লব	কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়	26
একাকী দহনে	অমল আচার্য	31
আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া 'আবিষ্কার' ('Discovery')	সুভাষ চন্দ্র গাঙ্গুলী	40
বিজ্ঞান, গণবিজ্ঞান, জনগণ এবং আমাদের ব্যর্থতা	শুভাশিস মুখোপাধ্যায়	54
তিলোত্তমাও কি ক্রমশঃ ধোঁয়াশার করাল গ্রাসে?	অপর্ণা চক্রবর্তী	59
গণবিজ্ঞান আন্দোলনের একটি পত্রিকার সম্পাদকীয় আড্ডায় প্লাস্টিক এবং থার্মোকল নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করার প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা	সুমিত চক্রবর্তী (বলাই)	71
প্রাচীন ভারতের উত্তরাধিকার: হিন্দুত্ববাদীদের হাতেই ছেড়ে দেবেন সেকুলার-বামেরা?	বিশ্বজিৎ রায়	74
রোগীর প্রয়োজনীয় রক্ত যোগারের কঠিন লড়াই	মালবিকা সেনগুপ্ত	87
জুপিটারিয়ানস্‌	নিখিলেশ পাল ও সুমিত চক্রবর্তী	90
সাক্ষাৎকার: যৌনকর্মীদের সন্তানদের রাহুল বিদ্যানিকেতন গড়ে ওঠার পটভূমি ও ইতিহাস	সাক্ষাৎকার—সৌমেন গুহ অনুলিখন—মালবিকা সেনগুপ্ত ও শান্তনু ত্রিবেদী	92
প্রসঙ্গ: চিকিৎসা একটি অভিজ্ঞতা	দিলীপ বৈদ্য	105
এশীয় মনোচিকিৎসার পথিকৃৎ গিরীন্দ্রশেখরকে বিস্মরণ ও ধ্বংসলীলা	সৌমেন গুহ	108

নীতিগতভাবে আমরা লেখকদের নিজস্ব বানান ও যতিচিহ্ন পাল্টাইনি বা সংশোধন করিনি। সমস্ত মতামত, বানান ও যতিচিহ্ন লেখকের নিজেদের, এর জন্যে সম্পাদকমন্ডলীর কোনো দায়িত্ব নেই।

— সম্পাদকমন্ডলী, 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'

আমাদের কথা: সেই মনে পড়ে.....

দেখতে দেখতে চল্লিশটা বছর.....

আমাদের 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' যে ভাবেই হোক বেঁচে আছে। হয়তো অনিয়মিত, তবুও বেঁচে আছে। আমাদের কয়েকজন পুরোনো বন্ধু চলে গেছে। আমরা যে কয়েকজন মধ্যপ্রান্তিক আর বৃদ্ধ বয়সে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র সাথে এখনও রয়ে গেছি, তারা অনাগত তরুণদের জন্য পথ চেয়ে আছি। হয়তো তারা আসবে, বা আসবেই না। আজ অনেক পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে.....

ভুল হয় এখন অনেকেরই, 'বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা' বৃত্তের বাইরের সবারই। 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা' নামে কোনো দিনই কোনো সংস্থা ছিলো না। ছিলো 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা', ইংরেজিতে নাম ছিলো Scientific Workers' Forum সংক্ষেপে SWF। 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' ছিলো আমাদের দ্বি-মাসিক মুখপত্র, অর্থাৎ দু' মাসে একটা, বছরে ছ' সংখ্যা বেরোতো। তখন এ ধরণের সংগঠনগুলোর সর্ব-ভারতীয় সমন্বয় ও তার মুখপত্র ছিলো, তাদের সাথে আমরাও যুক্ত ছিলাম। এমন কি তখন 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ্ সায়েন্টিফিক ওয়ার্কাস্' ছিলো। আমরা তাদের মুখপত্রের মাধ্যমে খবর রাখতাম। অতীতের দিকে তাকালে 'বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা'র স্মৃতিটা এখন খুব মূল্যবান বলে মনে হয়। অতীতের 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা' বা 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকা কখনো কোনো বাহাদুরী বা প্রচার দাবী করেনি। আজকের 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকা দেখে, সে অতীতকে বোঝা যাবে না। এলোমেলো মনে পড়ে .....

সবে প্রকাশিত হতে হতেই, 1978 সালে পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক ভয়াবহ বন্যা নিয়ে ভাবিত 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো মূল্যবান প্রবন্ধ, আর সংস্থা থেকে সেমিনার ইত্যাদির উদ্যোগ নেওয়া হোলো। যৌথ সেমিনারে এলেন কপিল ভট্টাচার্য। আমাদের তুচ্ছ ক্ষমতায় সামান্য ত্রাণ নিয়ে কয়েক বন্ধু গেলাম বন্যা দেখতে।

এক বিরাট কাজে নেমে পড়লো সংস্থা, স্বশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার দাবীতে। সংস্থা ছিলো বিতর্কাতীত পথিকৃৎ। আমাদের সামান্য লোকবল নিয়ে কলেরা রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে গেলাম। তারপরের ইতিহাস উজ্জ্বল স্মৃতি। সংস্থা এগিয়ে এলো গণতন্ত্রীকরণের বিরাট সেমিনার আর 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' মুখপত্র নিয়ে। নানা প্রতিষ্ঠানে উঠলো উদ্যোগের ঢেউ। প্রস্তাবনা, উদ্যোগ এলো সংস্থার কাছের বন্ধুদের কাছ থেকে। জন্ম হলো 'জ্যাকারি'র (JACARI Joint Action Committee of Autonomous Research Institution)। এতোটুকু বলতে হলো, কারণ ইতিহাস লেখা হয়নি। হলে জানি, 'পথিকৃৎ সম্মান ও পুরস্কার' নিয়ে প্রতিযোগিতা হবে। সংস্থা রইলো অন্তরালের নির্বাক পথিকৃৎ।

এ রকম করেই এলো 1982 সাল। জুন মাসেই ঠিক হলো নিউক্লিয়সার বোমা শুধু নয়, শক্তির বিরুদ্ধেও আমরা কাজ করবো। প্রস্তুতি শুরু হলো, 6ই আগস্ট 'হিরোশিমা দিবস'-এর ঐতিহাসিক মিছিল আর সমাবেশের। বহু বিজ্ঞান ক্লাবকে একজোট করতে সর্বসমর্থনে একটা চলনসই নাম দেয়া হলো 'পশ্চিমবঙ্গ গণবিজ্ঞান সমন্বয়'। কখনই কোনো কেন্দ্র বা কমিটি নয়। কোনো সম্পাদক, সভাপতি, সদস্য ছিলো না। ছিলো নিপাট নির্ভেজাল উদ্দীপনা, উদ্যোগ, গণতন্ত্র। আজ সেদিনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে, 'পশ্চিমবঙ্গ গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র'র অস্তিত্ব খোঁজা ও তার উল্লেখ করা ইতিহাসবিকৃতি, মিথ্যাভাষণ। কারণ, এ এক অবাক উদ্যোগ। সর্বোদয়, সংগঠন কংগ্রেস থেকে শুরু করে অজস্র বিজ্ঞান ক্লাব এই সুদীর্ঘ মিছিলে সামিল, উদার বুকে নির্দিষ্ট এক লক্ষ্যে। আর মাত্র পনেরো দিনে লেখা ও পনেরো দিনে ছাপা হলো, 'না হিরোশিমা নাগাসাকি চাই না' পুস্তিকা। এ পুস্তিকা ভেজা সদ্য বাঁধাইয়ের দোকান থেকে পৌঁছে গেলো মনুমেন্ট ময়দানের সমাবেশে। এগারো শত কপি বিক্রী হলো দু'তিন মাসে। বাণিজ্যিক বা ছোটো পত্রিকার পাতায়, প্রদর্শনীর পোস্টারে উঠলো এ পুস্তিকার 'কার্জন পার্কে এক মেগাটন' অধ্যায়। এমন করে.....চলতে চলতে চল্লিশ.....

2018 সালকে স্বাগত জানাই, সমস্ত পাঠক ও বন্ধুদেরকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানোর সাথে।

— সম্পাদকমন্ডলী

গিরীন্দ্র শেখর বসু ও সিগ্‌মান্ড্‌ ফ্রয়েডের পত্রালাপ

বাংলা অনুবাদ — লতিকা গুহ

[পুস্তিকাসূত্র: *The Beginnings of Psychoanalysis in India : Bose-Freud Correspondence* (Indian Psychoanalytical Society, Calcutta, 1999)]

[সম্পাদকীয় ভূমিকা: গিরীন্দ্র শেখর বসু ও সিগ্‌মান্ড্‌ ফ্রয়েডের পত্রালাপ শুরু হয় 1921 সাল থেকে। ইন্ডিয়ান সাইকোঅ্যানালিটিকাল সোসাইটি প্রকাশিত *The Beginnings of Psychoanalysis in India : Bose-Freud Correspondence* ['ফ্রয়েড-বসুর পত্রালাপ'] পুস্তিকার ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, এই পত্রালাপের কয়েকটি *Samiksa* (Vol.10, No.2&3) পত্রিকায় 1938 সালে প্রকাশিত। এই পত্রাবলী 1953 সালে গিরীন্দ্র শেখর বসুর মৃত্যুর পরে শ্রীমতী বসুর কাছে ছিলো। পরে 1963 সালে শ্রীমতী অ্যানা ফ্রয়েড এই চিঠিপত্রগুলো সংরক্ষণ করার জন্য চেয়ে পাঠায়, ও তাকে এগুলো দিয়ে দেয়া হয়। ইন্ডিয়ান সাইকোঅ্যানালিটিকাল সোসাইটি প্রকাশিত 'ফ্রয়েড-বসুর পত্রালাপ'পুস্তিকা 1964 সালে প্রকাশিত হয়, ও পরে 1997 ও 1999 সালে এর দুটি সংস্করণও প্রকাশিত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'লাইব্রেরী অফ্‌ কংগ্রেস' তাদের ফ্রয়েড সংগ্রহশালায় এই সংকলনটি রাখার জন্যে ইন্ডিয়ান সাইকোঅ্যানালিটিকাল সোসাইটির কাছে অনুমতি চায়। ইটালিয়ান গবেষক লিভিও বনি এই সংকলনটির ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করার অনুমতি চায়, যেটি 2018 সালে প্রকাশিত হওয়ার কথা।

তবে এই পত্রাবলীর বাংলা অনুবাদ সম্ভবত 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হলো।]

অধ্যাপক এস. ফ্রয়েডকে ডক্টর জি. বোসের চিঠি

14 পার্শি বাগান
আমহার্স্ট স্ট্রীট ডাকঘর
কলকাতা
ভারত

অধ্যাপক সিগ্‌মন্ড্‌ ফ্রয়েড, এল. এল.ডি
ভিয়েনা IX
বারগাস 19
ভিয়েনা
অস্ট্রিয়া

প্রিয় মহাশয়,

একটি পৃথক মোড়কে 'দ্য কন্‌সেপ্ট্‌ অফ্‌ রিপ্রেশন্‌' (*The Concept Of Repression*) নামে বইটি লেখকের একটি নগণ্য উপহার হিসাবে আপনাকে পাঠানোর স্বাধীনতা নিচ্ছি।

বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনসহ আমি আপনার তত্ত্বসমূহ ও বিজ্ঞানকে আন্তরিক প্রশংসা করি। আপনার কৌতূহল জন্মাতে পারে এ কথা জেনে যে গত এক দশক ধরে আমাদের পরিবারে আপনার নাম একটি ঘরেয়া শব্দ হয়ে গেছে।

আমার কাজটি সম্বন্ধে আপনার মতামত ও প্রস্তাবাদি জানলে আমি আনন্দিত হবো।

যথাক্রমে আপনার কাছ থেকে উত্তরের আশায়,

প্রিয় মহাশয়,

আপনার বিশ্বস্ত জি. বোস

29 মে, 1921 সালে ডক্টর জি. বোসকে অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েডের চিঠি

অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েড 29 মে, 1921

ভিয়েন IX, বারগাস 19

প্রিয় মহাশয়,

আপনার *দি কন্‌সেপ্ট্ অফ্ রিপ্রেশন্* বইটির প্রাপ্তি স্বীকার করছি এবং এর প্রধান অভিমতগুলির সঠিকতা ও এর মধ্যে নিহিত সদর্থটি যাচাই করে আমি খুশি। আমার বড় বিস্ময় হয়েছিল যে আপনাদের ওই দূরবর্তী দেশে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এত বেশি আগ্রহ ও স্বীকৃতি লাভ করতে পেরেছে।

এটা একটা কৌতূহলের বিষয় যে তাত্ত্বিক বিচার ও সিদ্ধান্ত আপনাদের বিষয়টির প্রতিপাদনে কত বড় অংশ নিতে পারে যেটা আমাদের ক্ষেত্রে বরং পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা করা হয়। এটা গভীর আক্ষেপের বিষয় যে জার্মান সাহিত্য আপনাদের আয়ত্বে নেই কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে অনুবাদের কাজ যেটা আমরা এখানে করছি (*The Internat. Journal of Psych.*) ধীরে ধীরে অবস্থাটার উন্নতি ঘটাবে।

শ্রদ্ধাসহ প্রিয় মহাশয়, আপনার বিশ্বস্ত

ফ্রয়েড

পুনশ্চ: আমি সর্বদাই আপনার আরও খবর পেয়ে খুশি হবো।

অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েডকে ডক্টর জি. বোসের চিঠি

অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েড

ভিয়েন, IX

বারগাস 19

অষ্ট্রিয়া

প্রিয় মহাশয়,

আপনার গত ২৯ মে-র সহৃদয় চিঠি পেয়ে আমি চূড়ান্ত আনন্দিত হয়েছি। আমি অত্যন্ত বাধিত হবো যদি আপনি দয়া করে ইন্টার্ন্যাশনাল জার্নাল অফ্ সাইকোঅ্যানালিসিস্-এর প্রকাশক, মূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত জানান। কোনও অ্যাসোসিয়েশন কি জার্নালটি প্রকাশনের দায়িত্ব নিয়েছে?

আমি আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন যদি আমি আপনাকে আপনার একটি ফটো আমাকে পাঠাতে বলি। আমি নিজে, আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব এবং আপনার গুণমুগ্ধ ব্যক্তিদের এক বিস্তৃত চক্র দীর্ঘ সময় ধরে এটির জন্য উদগ্রীর হয়ে আছে। আমি এখনো পর্যন্ত কোন বই, অথবা সাময়িকীতে আপনার ফটো দেখতে পাইনি, তা না হলে আমি এই অনুরোধ করে আপনাকে বিরক্ত করতাম না। আপনার হাত থেকে পাওয়া এ রকম একটি উপহারের সঙ্গে মূল্যবান সম্পর্ক জড়িয়ে থাকবে।

আমার বইয়ের এজেন্ট আপনাকে লেখার জন্য আমাকে বলেছে যে সে প্রকাশনার জন্য এই বইটি সম্পর্কে আপনার কোন অভিমত পেতে পারে কি না এবং সে জানতে চায় ইংরেজিতে লেখা বইটির সাফল্যের কোন সুযোগ অষ্ট্রিয়া বা জার্মানিতে আছে কি না এবং বিজ্ঞাপনের জন্য কোন্ সাময়িকী সব চাইতে উপযুক্ত হবে।

আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত হচ্ছি কিন্তু অষ্ট্রিয়া ও জার্মানি সম্পর্কে আমার অজ্ঞতাই এর কারণ।

আপনার বিশ্বস্ত

জি. বোস

3 আগস্ট, 1921 তারিখে ডক্টর জি. বোসকে অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েডের চিঠি

ব্যাড্‌গ্যাস্টাইন
আগস্ট 3, 1921

প্রিয় মহাশয়,

আমি এখন শহর থেকে অনেক দূরে পর্বতাঞ্চলে আছি এবং পয়লা অক্টোবরের আগে ফেরার সম্ভাবনা নেই। এই সময়টুকুর পরে আমি আপনার দুটো অনুরোধেই মনোযোগ দেবো। আমি এখন এটা করতে পারছি না, যেহেতু আমার সঙ্গে আপনার বইও নেই, আমার ফটোও নেই। ইন্টার্ন্যাটিৎসাইৎস্ (Internat Zeitsch) এবং ইংরেজি জার্নাল পি.এ. (P.A)-এর প্রকাশক আপনাকে জানাবেন যা আপনি জানতে চান।

অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহ আপনার
ফ্রয়েড

24.11.21 তারিখে ডক্টর ফ্রয়েডকে ডক্টর জি. বোসের চিঠি

24 নভেম্বর 1921

প্রিয় ডক্টর ফ্রয়েড,

ব্যাড্‌গ্যাস্টাইন থেকে পাঠানো আপনার পোস্টকার্ড আমি যথাসময়েই পেয়েছি এবং আপনার ছুটির দিনগুলোতে আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি বলে আমি আপনাকে চিঠি লেখা থেকে বিরত ছিলাম। আশা করি আপনি এখন ভিয়েনায় ফিরেছেন এবং সাহস করে আমি আবার আমার দুটি অনুরোধ আপনার কাছে রাখছি — প্রথমটি আমার জন্য আপনার একটা ফটো এবং অপরটি আমার এজেন্টের হয়ে প্রকাশনার উদ্দেশ্যে আমার বই সম্পর্কে আপনার মতামত প্রকাশ।

ইন্টার্ন্যাশনাল জার্নাল অফ্ সাইকোঅ্যানালিসিস্ (International Journal of Psychoanalysis) সম্পর্কে খবরটির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেই হবে। আমি এটা খুব পছন্দ করছি। আপনি জেনে খুশি হবেন যে আমি চেষ্টা করছি ইন্টার্ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কলকাতায় যাতে একটি অ্যাসোসিয়েশান থাকে। এই আন্দোলনে কিছু সংখ্যক চিকিৎসা সম্পর্কিত ব্যক্তি ও মনস্তত্ত্ববিদ নিজেদের নিয়োজিত করেছেন এবং আমরা আশা করি আগামী জানুয়ারিতে অ্যাসোসিয়েশানটি শুরু করবো। আমি অ্যাসোসিয়েশন প্রসঙ্গে ডক্টর জোন্সের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি এবং তিনি আমাকে অনেক বাস্তব ও বিচক্ষণ পরামর্শ দিয়েছেন। এই বিষয়ের ওপর আপনার প্রস্তাবগুলি পেলে আমি অত্যন্ত খুশি হবো। আমি আশা করি নিকট ভবিষ্যতে এই অ্যাসোসিয়েশানের নিয়ম কানুনের খসড়ার একটি প্রতিলিপি আমি আপনাকে পাঠাবো।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ও এম.এস্‌সি.-র ছাত্রদের জন্য এই বছরের 'মেন্টাল প্যাথোলজি'র ওপর একটি প্রশ্নপত্র আপনাকে পাঠানোর স্বাধীনতা নিচ্ছি। এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজির এটি দ্বিতীয় পত্র — অন্য তিনটি পত্র হচ্ছে 'ফিজিওলজিক্যাল সাইকোলজি', 'চাইল্ড অ্যান্ড এডুকেশনাল সাইকোলজি' এবং 'অ্যানিম্যাল সাইকোলজি'। সমস্ত বিষয়টির ওপর চারটি প্র্যাকটিক্যাল পত্রও আছে। সঙ্গের পত্রটির প্রথম অর্দ্ধাংশের প্রশ্নগুলি আমি তৈরি করেছি এবং দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশটি করেছেন ডক্টর বি. সি. ঘোষ। সাইকোঅ্যানালিস এখানে প্রতিদিন জনপ্রিয়তা অর্জন করছে এবং এমন কি অপেশাদার পত্রপত্রিকা ও স্বদেশীয় ভাষার দৈনিকে এই বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে।

আশা করি পত্রটি আপনাকে সুস্থ ও প্রাণবন্ত দেখবে।

আপনার বিশ্বস্ত
গিরীন্দ্রশেখর বোস

26.1.22 তারিখে ডক্টর ফ্রয়েডকে ডক্টর জি. বোসের চিঠি

26.1.22

প্রিয় ডক্টর ফ্রয়েড,

খুব সম্ভবত আপনি আমার গত চিঠিটা পেয়েছেন যেটার একটা উত্তর আমি প্রত্যাশা করছি। আপনি শুনে আনন্দিত হবেন যে আমরা কলকাতাতে একটা মনঃসমীক্ষণ সমিতি শুরু করতে সক্ষম হয়েছি। সমিতির উদ্বোধনী সভার কার্যবিবরণী এর সঙ্গে পাঠাচ্ছি এবং আমাদের সমিতি সম্পর্কে

আপনার কিছু প্রস্তাব পেলে আমি অত্যন্ত খুশি হবো। ইন্টার্ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশানের কাছে সংযুক্তির জন্য আমি আবেদন করেছি।

একজন প্রখ্যাত ভারতীয় শিল্পী এবং আপনার একনিষ্ঠ ভক্ত, আমার বন্ধু শ্রী জে. সেন তাঁর কল্পনা থেকে আপনার একটা পেন্সিল স্কেচ এঁকেছেন, যেটা 'আপনার মতনই দেখতে হবে' বলে তিনি মনে করেন। আমি আপনাকে মূল ছবিটা পাঠাচ্ছি আমার নিজের কাছে এর একটা কপি রেখে, যেটা আমি আপনার ফটোটা এলে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবো। বলা বাহুল্য, আপনার আকৃতি সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র তথ্যও জানা নেই।

আপনার পক্ষে কি কয়েক সপ্তাহের জন্য ভারতে আসা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক প্রস্থ বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব? যদি তা হয়, তা হলে আপনার শর্তাবলী জানতে পারলে আমি প্রীত হবো, যাতে আমি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সামনে সেগুলি রাখতে পারি।

শুভ নববর্ষ কামনায়
আপনার বিশ্বস্ত
জি. বোস

20 ফেব্রুয়ারি 1922 সালে ডক্টর জি. বোসকে অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েডের চিঠি

অধ্যপক ডক্টর ফ্রয়েড ফেব্রুয়ারি 20, 1922
ভিয়েন IX, বারগাস 19

প্রিয় শ্রী বোস

অবশেষে আপনার বাসনা অনুযায়ী আমি ফটোটা পাঠাতে পারছি— এটা আপনার কাছে পৌছবে হামবুর্গ থেকে এবং আপনার এজেন্টের হয়ে চাওয়া কয়েকটি পংক্তিও পাঠাচ্ছি। যেহেতু আমার ইংরেজি খুব ত্রুটিপূর্ণ, তাই আপনার উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করে আমার অভিব্যক্তিগুলি পরিবর্তন করতে অনুরোধ করছি।

"এটা একটা বিরাট ও সুখকর বিষয় যে পৃথিবীর ওই প্রান্ত (ভারত) থেকে আমাদের কাছে আসা মনঃসমীক্ষণ বিষয়ের ওপর একটা বই মনঃসমীক্ষণের বিষয়ে এত ভালো জ্ঞান, এর অসুবিধাগুলিতে এত গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং এত বেশি প্রগাঢ় মৌলিক ভাবনা প্রদর্শন করতে পারে। ডক্টর বোস তাঁর অনুসন্ধানের জন্য অবদমন (Repression)-য়ের ধারণাটিকে বেছে নিয়েছেন এবং এই তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আরও অধ্যয়নের জন্য তিনি আমাদের মূল্যবান পরামর্শ ও গভীর প্রেরণা দান করেছেন। ডক্টর বোস আমাদের নীরস, ব্যবহারিক ধারণাগুলির একটা দার্শনিক ক্রমবিকাশ ও বিশদীকরণের লক্ষ্যে এগোচ্ছেন এবং এটাই কামনা করি যে মনঃসমীক্ষণ সেই উচ্চতায় শীঘ্রই পৌছাক যেখানে উন্নীত করতে তিনি চেষ্টা করছেন।"

আপনাদের দেশে মনঃসমীক্ষক গোষ্ঠীর সূত্রপাতের সাফল্যের কথা শুনে আমি আপনাকে হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা একদিন সাক্ষাৎ করতে পারি যেটা খুব দূরবর্তী হবে না, যেহেতু আমি বৃদ্ধ হয়েছি (60 বছর)।

আপনার বিশ্বস্ত
ফ্রয়েড

1 মার্চ 1922 তারিখে ডক্টর বোসকে অধ্যাপক ফ্রয়েডের চিঠি

ভিয়েন, 1 মার্চ 1922

প্রিয় ডক্টর বোস,

আমি আপনার চিঠি ও 25শে জানুয়ারির রিপোর্টের প্রাপ্তি স্বীকার করে আনন্দিত হচ্ছি এবং আশা রাখি আমার 24শে ফেব্রুয়ারির চিঠিটা নিরাপদে পৌছবে।

যে কাল্পনিক প্রতিকৃতি আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন তা বাস্তবিকই খুব সুন্দর, উপলক্ষ্যটির চাইতে আরও বেশি চমৎকার। আপনি শীঘ্রই ফটোটা নিয়ে এর বিরোধিতার মুখোমুখি হওয়ার পরিস্থিতিতে পড়বেন এবং দেখবেন কিছু বর্ণ (Racial) সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য শিল্পী তাঁর হিসেবে ধরেননি।

আপনার বিশ্বস্ত
ফ্রয়েড

পুনশ্চ: ভারতে উজিয়ে যাওয়ার পক্ষে আমি অতিবৃদ্ধ হয়ে গেছি। আপনি অন্যভাবে এটা চেষ্টা করুন এবং ইউরোপে আসুন।

অধ্যাপক এস. ফ্রয়েডকে ডক্টর জি. বোসের চিঠি

অধ্যাপক সিগমন্ড ফ্রয়েড, এম.ডি., এলএল.ডি.
বারগাস 19
ভিয়েনা IX

প্রিয় ডক্টর ফ্রয়েড,

আপনার সহৃদয়ভাবে পাঠানো 1-3-22 তারিখের চিঠি এবং ফটো পেয়ে আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। আপনার ছবি বৃহৎ বন্ধুগোষ্ঠীর কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

আমার বইয়ের ওপরে আপনার আন্তরিক মতামতের জন্য অনুগ্রহ করে আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন।

আপনি আমাকে ইয়োরোপ যেতে বলছেন এবং আমি অবশ্যই স্বীকার করবো যে আপনাকে সাক্ষাৎ করা এবং সেই উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করাটা আমাকে মহত্তম আনন্দ দেবে। সম্ভবত এমন একটা সুযোগের সময়টা এসে যাবে।

আপনার শুভেচ্ছা জানানোর জন্য আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

আপনি জেনে খুশি হবেন যে ডক্টর জোন্স্ সদয়ভাবে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটির সঙ্গে আমাদের সাইকোঅ্যানালিটিক্যাল সোসাইটিকে সংযুক্ত করেছেন।

বিশ্বাস করি চিঠিটা আপনাকে স্বাস্থ্য ও প্রাণবন্ততায় দেখতে পাবে।

আপনার সদা বিশ্বস্ত
জি. বোস

27-10-22 তারিখে ডক্টর জি. বোসকে প্রফেসর ডক্টর ফ্রয়েডের চিঠি

অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েড 27 অক্টোবর, 1922
ভিয়েন IX, বার্গাস্ 19

প্রিয় ডক্টর বোস,

এক মাস আগে অনুষ্ঠিত বার্লিন কংগ্রেসে ইন্টার্ন্যাট. পিএস. অ্যাসোসিয়েট (Internat. Ps. Associate)-য়ের একটি শাখা হিসাবে আপনাদের সমিতিকে গ্রহণের জন্য আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এখন জার্মান ৎসাইৎশ্রিফ্ট্ ফুর্ পিএস. এ (German Zeitschrift fur Ps. A)-য়ের এবং পিএস এ (Ps A)-র ইংরেজি জার্নালের সম্পাদক হিসাবে আমি আপনার সম্মতির জন্য অনুরোধ করছি যাতে ভারতীয় শাখার পথপ্রদর্শক এবং প্রতিনিধি হিসাবে দুটি জার্নালের প্রচ্ছদে আপনার নাম মুদ্রণ করতে পারি, ঠিক যে ভাবে অন্যান্য সভাপতিদের নাম উল্লেখ করা হয়। যদি আপনি সম্মত হন তা হলে এটা 1923 সালের প্রথম সংখ্যাতে প্রথম করা হতে পারে।

আমাদের পত্রিকায় শীঘ্রই আপনার কিছু লেখা দেখার আশা রাখি।

সহৃদয় শ্রদ্ধাসহ,

আপনার
ফ্রয়েড

23.11.22 তারিখে প্রফেসর ফ্রয়েডকে ডক্টর জি. বোসের চিঠি

23 নভেম্বর, 1922
14 পার্শি বাগান

প্রিয় অধ্যাপক ফ্রয়েড,

আপনার 27 অক্টোবর, 1922 তারিখের অতি সহৃদয় চিঠির জন্য আমি অত্যন্ত বাধিত। কিছু কাল আগে আমি ডক্টর আর্নেস্ট জোন্সের কাছ থেকে একটি পত্র পাই যেখানে তিনি আমাকে ভারতের পক্ষে ইন্টার্ন্যাশনাল জার্নাল (International Journal) ও ৎসাইৎশ্রিফ্ট্ ফুর্ পিএ (Zeitschrift fur PA)-য়ের সহ-সম্পাদক হিসাবে কাজ করার কথা বলেছেন। জার্নালগুলির সম্পাদনায় আপনাদের কোন কাজে এলে আমি যারপরনাই খুশি হবো এবং কাজটির যে কোন অংশ আমার ওপর ন্যস্ত করলে আমি তা করার আপ্রাণ চেষ্টা করবো। যাই হোক, আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি যে আমি জার্মান ভাষা জানি না, তবুও আমি এখানে জার্মান ভাষা জানা বন্ধুদের সাহায্য পেতে পারি। নিকট ভবিষ্যতে জার্নালের জন্য আমি আপনাকে কিছু লেখা পাঠাতে পারি।

আনন্দময় বড়দিন ও শুভ নববর্ষ ও এদের বার বার আগমন কামনা করে।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত
জি. বোস

28.12.23 তারিখে ডক্টর জি.বোসকে ডক্টর ফ্রয়েডের চিঠি

ভিয়েন, 28.XII.23

প্রিয় অধ্যাপক বোস,

শুভ নববর্ষ এবং আপনার কাজের যোগ্য সাফল্য কামনায়।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত
ফ্রয়েড

2.1.29 তারিখে ডক্টর জি.বোসকে প্রফেসর ডক্টর ফ্রয়েডের চিঠি

প্রফেসর ডক্টর ফ্রয়েড 2.1.1929
ভিয়েন IX,বার্গাস্ 19

প্রিয় ডক্টর বোস,

আপনার চিঠি পেয়ে আমি খুশি হয়েছি। যখন থেকে আপনারা আমাদের সমিতিতে যোগ দিয়েছেন, আমি ক্ষুব্ধ যে তখন থেকে আমাদের ভারতীয় শাখা অন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলেনি। বিপরীত কোন নিদর্শন আমার কাছে প্রীতিদায়ক হবে।

এটা অবশ্যই যে টেগোরের (রবি ঠাকুরের) কাব্য নিয়ে অধ্যাপক হালদারের বিশ্লেষণের ফলাফলে আমি বিস্মিত হইনি। কিন্তু অন্যদের কাছেও এটা একই রকম প্রত্যয়ী হতে পারে এবং তাই আমি মনে করি এটা প্রকাশিত হওয়া উচিত। আমার সুপারিশসহ ডক্টর জোন্সের কাছে এটা পাঠানোর জন্য আমি কি আপনার অনুমোদনের অপেক্ষা করতে পারি?

আপনার লেখার যে অংশটি আমাকে পাঠাবেন সেটি আমার তীব্র আগ্রহে নিশ্চিত হতে পারে। আমার স্বাস্থ্য শক্তপোক্ত নয়, আমার মন এখনও সক্রিয় যদিও সৃজনশীল নয়।

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শভেচ্ছাসহ

আপনার বিশ্বস্ত
ফ্রয়েড

31-1-29 তারিখে অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েডকে ডক্টর জি বোসের চিঠি

14 পার্শিবাগান
কলকাতা, 31 জানুয়ারি 1929

প্রিয় অধ্যাপক ফ্রয়েড,

আপনার সহৃদয় চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমি ইতিমধ্যেই অধ্যাপক হালদারের লেখার একটা অনুলিপি ডক্টর জোন্সের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি এবং আপনি যদি এটা অনুগ্রহ করে ইন্টার্ন্যাশনাল জার্নাল অফ্ সাইকো-অ্যানালিসিস্য়ে ছাপানোর জন্য সুপারিশ করেন তা হলে অধ্যাপক হালদার অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকবেন।

একটা আলাদা মোড়কে আপনাকে আমার নিজের কিছু লেখা পাঠাচ্ছি। পি(P) চিহ্নিত প্রবন্ধগুলি লোকায়ত ধারায় লিখিত এবং অন্য কতগুলি লেখার সঙ্গে এগুলি একটি বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা স্থির হয়েছে যেটি এখন প্রস্তুত করা হচ্ছে সাধারণ মানুষের জন্য। অন্য প্রবন্ধগুলি টেক্নিক্যাল ধাঁচের এবং এগুলি অন্য বইয়ের উদ্দেশ্যে রচিত। যখন প্রকাশিত হবে তখন এই ধারার সমস্ত প্রবন্ধের সঙ্গে সংযোজিত হবে এগুলির অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর সমর্থনে চিকিৎসা সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্যবিবরণী। কয়েকটি লেখা আরও সংবর্দ্ধিত করতে হবে। ওয়েদিপাস বাসনা (Oedipus Wish) নিয়ে লেখাটির দিকে আমি আপনার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করছি যেখানে আমি কিছু কিছু বিষয়ে আপনার সঙ্গে মতপার্থক্য করার সাহস করেছি। প্রবন্ধগুলি যে ক্রমপর্যায়ে পাঠ করতে হবে আমি তা নির্দেশিত করে দিয়েছি (15 পৃষ্ঠা দেখুন)।

আমি স্বপ্নের ওপরে একটা বাংলা বই এর সঙ্গে পাঠাচ্ছি যেটা আমি সম্প্রতি প্রকাশ করেছি। বইটিতে আপনার দয়া করে পাঠানো ফটো থেকে আমার বন্ধু, বিখ্যাত শিল্পী শ্রী জে. কে. সেন পেন্সিল অঙ্কন করেছেন। মনঃসমীক্ষণের পিতা (Father of Psychoanalysis)-র প্রতি গভীর শ্রদ্ধার চিহ্ন হিসাবে আপনি অনুগ্রহ করে এই বইটি গ্রহণ করুন। এই বইটির বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ইংরেজি অনুবাদ আমার লোকায়ত ধারার বইটিতে থাকবে।

আপনার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

আপনার বিশ্বস্ত
জি. বোস

অধ্যাপক ডক্টর সিগমন্ড ফ্রয়েড
ভিয়েন IX ,বারগাস 19
অষ্ট্রিয়া

যে ক্রম অনুযায়ী প্রবন্ধগুলি পড়তে হবে

লোকায়ত ধারার প্রবন্ধাবলী

1. ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন মেথড ইন সাইকোঅ্যানালিসিস (Free Association Method in Psychoanalysis)
2. সেক্স ইন সাইকোঅ্যানালিসিস (Sex in Psychoanalysis)
3. সাইকোঅ্যানালিসিস ইন বিজনেস (Psychoanalysis in Business)
4. টেম্পার অ্যান্ড সাইকোঅ্যানালিসিস (Temper and Psychoanalysis)
5. ক্রাইম অ্যান্ড সাইকোঅ্যানালিসিস (Crime and Psychoanalysis)

টেকনিক্যাল প্রবন্ধাবলী

1. রিলেশনশিপ বিটুইন সাইকোলজি অ্যান্ড সাইকিয়াট্রি (Relationship between Psychology and Psychiatry)
2. রিলায়েবিলিটি অফ্ সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল ফাইন্ডিংস্ (Reliabitty of Psycho-analytical Findings)
3. ইজ্ পার্সেপ্শন্ অ্যান্ ইল্যুশন্? (Is Perception Illusion)
4. নেচার অফ্ উইশ্ (Nature of Wish)
5. অ্যানালিসিস্ অফ্ উইশ্ (Analysis of Wish)
6. প্লেজার্ ইন্ উইশ্ (Pleasure of Wish)
7. দ্য জেনেসিস্ অফ্ হোমোসেক্সুয়ালিটি (The Genesis of Homosexuality)
8. দ্য জেনেসিস্ অ্যান্ড অ্যাড্জাস্ট্মেন্ট্ অফ্ ওদিপাস উইশ (The Genesis and Adjustment of Oedipus Wish)

9.3.29 তারিখে ডক্টর জি. বোসকে অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েডের চিঠি

অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েড

9 মার্চ 1929
ভিয়েন IX, বারগাস 19

প্রিয় অধ্যাপক বোস,

আপনি যেগুলি পাঠিয়েছেন তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি আপনার সব লেখা পড়েছি, লোকায়ত ধারার এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিকগুলিও এবং আপনার প্রতিশ্রুতি মতো সেগুলি বই আকারে প্রকাশিত দেখতে অধীর হয়ে আছি।

আপনি বিশেষ করে ওয়েদিপাসের ওপর আমার মনোযোগ নির্দেশিত করেছেন। এবং সেটা করে আপনি সঠিকই করেছেন। এটা আমার ওপর বিরাট প্রভাব ফেলেছে। বস্তুতপক্ষে আপনার যুক্তিবিন্যাসে আমাব প্রত্যয় জন্মাচ্ছে না। আপনার বিপরীত কামনার তত্বটি একটি গতিশীল উপাদানের চাইতে বরং একটা প্রথাগত উপাদানের ওপর গুরুত্বদান বলে আমার মনে হচ্ছে। আমি এখনও মনে করি, আপনি নপুংসকরণ ভীতিটার কার্যকারিতাকে কম গুরুত্ব দিয়েছেন। এটা সাগ্রহে লক্ষ্যনীয় যে আপনার লোকায়ত প্রবন্ধগুলিতে একমাত্র ভুল যা আমি আবিষ্কার করেছি তা ওই একই বিষয়ে সম্পর্কিত। সেখানে আপনি বলছেন ওয়েদিপাস অন্ধ হওয়ার পর নিজেকে খুন করেছিল যেটা সে কখনোই করেনি। বৈজ্ঞানিক লেখায় আপনি গল্পটা সঠিকভাবেই দিয়েছেন। অপর দিকে, নারী হওয়ার কামনার সঙ্গে নপুংসকরণের সম্পর্ক অথবা নারী হয়ে যাওয়ার আতঙ্কের সঙ্গে নপুংসকরণের ভীতির সম্পর্ককে আমি কখনোই অস্বীকার করিনি। আমি আমার 'পাসিং অফ্ দ্য ওয়েদ্ কম্প্লেক্স' (Passing of the Oed. Complex)-য়ে একটা নতুন অধিমনস্তাত্বিক (Metapsychological) সম্ভাবনা উপস্থাপনার চেষ্টা করেছি যা একটা মানসিক

জটিলতা (Complex) ধ্বংস করে এটির একটি মাত্র খাতে সমস্ত মানসিক শক্তি কেন্দ্রিভূতকরণের ভারটাকে (Cathectic charge) হরণ করে, যা অন্যান্য খাতে চালিত হয়, একটি মাত্র খাতে মানসিক শক্তি কেন্দ্রিকরণ (Cathexis) হ্রাস না পাওয়ায় তাকে দমন করার অন্যতর ধারণাটা ছাড়াও।

কিন্তু আমি স্বীকার করছি আমি কোন রকমেই আমার নিজের অনুমানগুলির সঠিকতা সম্পর্কে অধিকতর নিঃসন্দেহ নই। আমার এখনও এই জটিল ওয়েদিপাস বিষয়টি গভীরে দেখা হয়নি। আমাদের আরও পর্যবেক্ষণ দরকার।

সবিনয়ে আপনার

ফ্রয়েড

পুনশ্চ: বাংলা বইটির জন্য ধন্যবাদ।

11.4.29 তারিখে অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েডকে ডক্টর জি.বোসের চিঠি

14 পার্শিবাগান

কলকাতা, 11 এপ্রিল 1929

প্রিয় অধ্যাপক ফ্রয়েড,

আপনার লেখা 9 মার্চ, 1929 তারিখের সহৃদয় চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমার লেখাগুলি আপনি পড়েছেন এবং আমার লোকায়ত প্রবন্ধে ওয়েদিপাস কাহিনীর ভুলটা দেখিয়ে দিয়েছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ। যখন ছাপাখানায় পান্ডুলিপিটা যাবে আমি এটা সংশোধন করবো।

অবশ্যই আমি আশা করি না যে ওয়েদিপাস অবস্থা সম্পর্কে আমার ব্যাখ্যা আপনি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করবেন। ইউরোপীয় ক্ষেত্রগুলোতে নপুংসকরণ আশঙ্কার গুরুত্বকে আমি অস্বীকার করি না; আমার যুক্তি হচ্ছে আশঙ্কার কার্যকারিতা নারী হওয়ার কামনার সঙ্গে সম্পর্কিত। বাস্তব লড়াইটা ঘটে পুরুষ হবার আকাঙ্খা এবং এর বিপরীতে নারী হবার আকাঙ্খার মধ্যে। আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি এই তথ্যটি যে নপুংসকরণ আশঙ্কাটা ভারতীয় সমাজে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু আমার ভারতীয় রোগীরা নপুংসকরণ লক্ষণ ততটা সুস্পষ্ট মাত্রায় প্রদর্শন করেন না যতটা আমার ইউরোপীয় রোগীরা করে থাকে। নারী হবার আকাঙ্খা ইউরোপীয় পুরুষ রোগীর চাইতে ভারতীয় পুরুষ রোগীদের মধ্যে সহজেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে আমি আপনার কাছে সমকামিতা (Homosexuality)-র ওপর আমার লেখাটি উল্লেখ করছি যেখানে এই প্রশ্নটি আমি অধিকতর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছি। ওয়েদিপাস মাতা খুব প্রায়শঃই একটি পিতামাতার মিলিত প্রতিমূর্তি এবং এটা একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা বিশ্বাস করার আমার কারণ আছে যে 'মাতৃ দেবী' ('maternal deity')-র প্রবর্তনটি এই উৎসে খুঁজে পাওয়া যাবে।

আমার বিপরীত কামনার তত্বটি নিছক একটি রীতিবদ্ধ দার্শনিক বয়ান নয় যা আপনি অনুমান করছেন। অন্য যে কোন বৈজ্ঞানিক তত্বের মতো এটাও একটা সুনির্দিষ্ট সূত্র বন্ধন যা মানসিক জীবনের অনেক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলা যায় এটা অবদমনের সঠিক গতিসূত্রটা নির্দেশ করে যখন একটা বিশেষ কামনাকে অচেতনে ঠেলে দেওয়া হয়; এটা অনুকরণ, প্রতিশোধ, বিবেকবোধ, দেখনদারিতা ইত্যাদিকে সরলভাবে ব্যাখ্যা করে। তৃপ্তিবোধ নীতিসহ পুনরাবৃত্তির বাধ্যবাধকতার অস্তিত্বের ধারণায় যে ঘটনাগুলি আপনাকে চালনা করেছিল সেগুলি এই তত্বের ভিত্তিতে অধিকতর সহজে ব্যাখ্যা করা যাবে। যখন কোন ব্যক্তি আবেগাহত হয় তখন নিষ্ক্রিয় ধরণের কোন কোন কামনা তৃপ্ত হয়, অবশ্যই যে বাহক এই আবেগাঘাত এনেছে তার পরিস্থিতি অনুযায়ী বিপরীত ধরণের কামনা মুক্তির দিকে চালিত করে। এটা অপরাধী বাহকের সঙ্গে একটা একীকরণের প্রচেষ্টা। স্বপ্নগুলির মধ্যে আবেগাঘাতের অবস্থার বারবার উত্থান অতৃপ্ত বিপরীত কামনার দিক থেকে তৃপ্তি সাধনের একটা প্রচেষ্টা মাত্র। এটা নির্দ্ধারিত হয় তৃপ্তিবোধ নীতি দ্বারা। পুনরাবৃত্তির বাধ্যবাধকতার ক্রিয়া অনুমান করে নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

বিপরীত কামনার তত্বটি একই ব্যক্তির মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় এই রকম প্রলক্ষণের ঘটনা ব্যাখ্যা করবে যেমন ধর্ষকাম ও মর্ষকাম, নজরদারিতা ও দেখনদারিতা ইত্যাদি। এই তত্ব বিভিন্ন কামনার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে যেগুলি বিশ্লেষণের সময় নির্দিষ্ট পর্যায় ক্রমে মনের নির্জ্ঞান স্তর থেকে বেরিয়ে আসে।

এই তত্বের দরুণ কথার ব্যাকরণ গত আকারের সমীক্ষা থেকে একজন বিশ্লেষক চেতনায় একটা অবদমিত কামনার

আবির্ভাবের সম্ভাবনার পূর্বাভাষ আগেই দিতে সক্ষম হন।

এই তত্ত্ব প্রয়োগের বাস্তব বিষয়গুলির আলোচনা আমি আমার বইয়ে একটা পৃথক অধ্যায় হিসাবে সংরক্ষিত করে রেখেছি। আমার 'কন্‌সেপ্ট্ অফ্ রিপ্রেশন্' (Concept of Repression)-য়ে তত্ত্বটির বিশদীকরণের সময় থেকে, কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিনাটি বিষয়ে এটাকে আমি পরিবর্তন করেছি বিশ্লেষণের সময় আমার কাছে নতুন নতুন তথ্য আসার দরুন। এই অধ্যায়টি লেখা হলে আমি এর একটা প্রতিলিপি আপনাকে পাঠাবো।

আমি দুঃখিত আপনাকে এই দীর্ঘ চিঠি দিয়ে কষ্ট দেওয়ার জন্য; আমার একমাত্র ওজুহাত আমি চাই আমার গবেষণাগুলি আপনার অসাধারণ অভিজ্ঞতার আলোকে পরীক্ষিত হোক।

এই চিঠি আপনাকে সুস্বাস্থ্যে দেখবে এই আস্থায় এবং আপনার দীর্ঘ জীবন কামনায়।

আপনার বিশ্বস্ত
জি. বোস

12.5.29 তারিখে ডক্টর জি.বোসকে অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েডের চিঠি

অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েড

12 মে, 1929
ভিয়েন IX, বারগাস 19

প্রিয় অধ্যাপক বোস,

আপনার ব্যাখ্যার জন্য ধন্যবাদ। ভারতীয় ও ইউরোপীয় রোগীদের মধ্যে নপুংসকরণ পরিক্রিয়ার প্রভেদটা নিয়ে আমি পরিপূর্ণভাবে মুগ্ধ এবং আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে বিপরীত কামনার সমস্যা নিয়ে, যার ওপর আপনি জোর দিয়েছেন, আমি আমার মনোযোগ নিবিষ্ট করবো। তাড়াহুড়ো করার পক্ষে পরবর্তীটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি খুশি যে আপনার আরও একটা বই প্রকাশের আশা করতে হবে আমাকে, আমি ভাবিত হচ্ছি উভয়বলতার লক্ষণের সঙ্গে বিপরীত কামনার সম্পর্ক কী "হতে পারে"।

আমি দুঃখিত যে ডক্টর সরকারকে আমার হতাশ করতে হচ্ছে, যিনি চিঠিপত্রের লেখক হিসাবে আমাকে নানা আকর্ষণীয় চিঠি পাঠিয়েছেন, কিন্তু আমার কর্মক্ষমতা আর ততটা নেই যতটা আগে থাকতো।

সহৃদয়তম শ্রদ্ধাসহ।

আপনার বিশ্বস্ত
ফ্রয়েড

অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েডকে ডক্টর জি. বোসের চিঠি

আমার প্রিয় অধ্যাপক ফ্রয়েড,

আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ইন্ডিয়ান সাইকোঅ্যানালিটিক্যাল (Indian Psychoanalytical Society)-র হয়ে ডাকযোগে বিমাকৃত মোড়কে হাতীর দাঁতের একটা ছোট বেদিসহ মূর্তি এবং রেশমি কাপড়ে ছাপানো আপনার উদ্দেশ্যে সংস্কৃতে একটি সম্ভাষণের দুটি পাকানো প্রতিলিপি ও কাগজে টাইপে ছাপানো ওই একই লেখার অনুবাদের তিনটি প্রতিলিপি এবং 6 মে সোসাইটির সভার কার্যবিবরণীর তিনটি প্রতিলিপি আপনাকে পাঠাচ্ছি আপনার পঁচাত্তরতম জন্মবার্ষিকী পালনের উদ্দেশ্যে। এই সামান্য উপহার আপনি দয়া করে গ্রহণ করলে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকবে। আপনার জন্য বিশেষভাবে তৈরি ছোট মূর্তির জন্য কিছু সময় লেগেছিল, তাই দেরি হয়ে গেল। জিনিষগুলি সাবধানে পৌঁছনোর খবরটা চিঠির এক ছত্র উত্তরে আমাকে জানালে তা অত্যন্ত প্রশংসিত হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,
জি. বোস

13.12.31 তারিখে ডক্টর জি.বোসকে অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েডের চিঠি

অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েড

13 ডিসেম্বর, 1931
ভিয়েন IX, বারগাস 19

প্রিয় ডক্টর বোস,

আপনাদের পাঠানো মূর্তি, এর বেদি, কার্যবিবরণী ও কবিতা — সব কিছু এখন আমার হাতে এসে গেছে। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে আনন্দিত এবং এগুলি আমি গ্রহণ করছি এই

দুঃখজনক ঘটনার এক ধরণের ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে আপনার সঙ্গে বা আপনাদের সোসাইটির অন্য সদস্যের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। [আপনাদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি যাঁকে আমি চিনি তিনি হচ্ছেন ডক্টর বার্কলে হিল] অনুগ্রহ করে আপনাদের সমস্ত সদস্যকে আমার সহৃদয় ধন্যবাদ দেবেন এবং বিশেষ করে আপনার নিজের জন্য গ্রহণ করবেন।

ছোট মূর্তিটি অত্যন্ত মনোহর। একে আমি আমার ডেস্কের ওপর সম্মানিত স্থানে রেখেছি। যতদিন আমি জীবন উপভোগ করবো এ আমায় মনে করিয়ে দেবে মনঃসমীক্ষণের অগ্রগতি, বিদেশে এর গর্বিত বিজয় সংঘটন এবং আমার জন্য সহৃদয় অনুভব যা এ অন্ততপক্ষে আমার কয়েকজন সমসাময়িকদের মধ্যে জাগিয়েছে।

ভালোবাসাসহ শুভেচ্ছায়।

আপনাদের
সিগ্‌ম. ফ্রয়েড

অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েডকে 4.10.32 তারিখে ডক্টর জি. বোসের চিঠি

14 পার্সিবাগান
কলকাতা, 4 অক্টোবর, 1932

প্রিয় অধ্যাপক ফ্রয়েড,

আমার কন্যা ও জামাতা যখন ভিয়েনায় ছিলো আপনি তাদের প্রতি যে সহৃদয়তা দেখিয়েছেন তার জন্য আমি অত্যধিক কৃতজ্ঞ। তারা আপনার নিজের কাছে, আপনার স্ত্রী, কন্যা ও শ্যালিকার কাছে পরিপূর্ণভাবে কৃতজ্ঞ। আমার কন্যা তার শিশুকাল থেকে আপনার সম্বন্ধে শুনে আসছে এবং আপনার সম্বন্ধে তার গভীর অনুভূতির উজ্জ্বল বিবরণ সে আমাকে লিখে পাঠিয়েছে। আমি শুধু কামনা করি আমার যদি আপনাকে সশরীরে ধন্যবাদ জানানোর সুযোগ থাকতো।

শুভেচ্ছাসহ।

আপনার বিশ্বস্ত,
জি. বোস

8.11.32 তারিখে ডক্টর জি.বোসকে অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েডের চিঠি

অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েড 8 নভেম্বর 1932
ভিয়েন IX, বারগাস 19

প্রিয় ডক্টর বোস,

বিব্রত বোধ না করে আপনার সহৃদয় চিঠি পড়তে পারিনি। বস্তুতপক্ষে আমি আপনার ছেলেমেয়ের কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত নই এই কারণের দরুন যে আমি এবং আমার কন্যা কাজে ডুবে ছিলাম, আমার স্ত্রী ও তার বোন আপনাদের ভাষা জানে না এবং আমাদের গৃহস্থালিতে অসুবিধা থাকার দরুন তাদের খেতে নেমতন্ন করাও কঠিন ছিলো। তাই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিলো যে আমার এক বন্ধু ও ছাত্র আমার হয়ে এটা করেছিলো। আমি খুব দুঃখিত হয়েছিলাম যে আপনার চমৎকার মেয়েটি আমাদের কুকুরগুলিকে পছন্দ করেনি। কিন্তু আপনি জানেন জীবদ্দশায় আমরা প্রায়ই প্রশংসিত অথবা নিন্দিত হই নিজেদের কোন দোষগুণের জন্য নয়।

সহৃদয় শ্রদ্ধাসহ।

আপনার
ফ্রয়েড

1.1.33 তারিখে ডক্টর জি. বোসকে অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েডের চিঠি

অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েড 1 জানুয়ারি 1933
ভিয়েন IX, বারগাস 19

প্রিয় ডক্টর বোস

এই নতুন বছরের প্রথম চিঠিটা আপনার কাছেই যাচ্ছে। অনুগ্রহ করে পাঠানো আপনার প্রবন্ধটা পড়ে ফেলেছি এবং এর দ্বারা গভীরভাবে অভিভূত হয়েছি। বর্তমানে আমাদের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের মধ্যকার পরস্পর বিরোধিতাগুলি অনেক এবং তা গভীরে যাচ্ছে এবং আপনার ধারণাগুলির প্রতি আগে মনোযোগ না দেওয়ার জন্য আমি নিজেকে তিরস্কার করি। এটা শুধু আমার ক্ষেত্রেই নয়। আমি

সন্দেহ করি আপনার বিপরীত কামনার তত্বটি আমাদের মধ্যে বাস্তবিকই অজানা এবং কখনোই উল্লেখ বা আলোচনা করা হয় না। এই দৃষ্টিভঙ্গীটার অবসান করা উচিত ছিল। সর্বত্র ইংরেজ ও জার্মান বিশ্লেষক দ্বারা এটার মূল্য নির্ধারণ এবং গুণবিচার দেখার জন্য আমি আগ্রহী। আপনি অনুমতি দিলে ধরুন আমি প্রস্তাব দিচ্ছি: বিশেষ করে বিশ্লেষক জনগোষ্ঠীর জন্য এই তত্বের ওপরে আসুন আমরা লিখি যেটা ৎসাইৎশ্রিফ্ট্ (Zeitschrift) ও জোন্স্ জার্নালে (Jones' Journal)-য়ে একই সঙ্গে প্রকাশ পাবে। আমি এখানে ভিয়েনায় জার্মানিতে অনুবাদ করবো। যে প্রবন্ধটা আপনি পাঠিয়েছেন তা সম্পূর্ণ যথাযথ নয়, বিশেষ করে প্রথম অংশগুলিতে, যেহেতু এটা ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে রচিত।

আমার নিজের যে সিদ্ধান্ত আপনি জানতে চেয়েছেন সে সম্বন্ধে আমি শুধু আমার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াগুলি দিতে পারি যেগুলোর খুব বড় কিছু মূল্য নেই। এত কাল ধরে মেনে আসা একটা তত্ব থেকে এত আলাদা একটা তত্বের যখন মুখোমুখি হই তখন অপরিচয়ের অনুভূতিটা জয় করতে অনেক সময় ও প্রচেষ্টা দরকার হয়। এবং চিন্তার অভ্যস্ত পথ থেকে বেরিয়ে আসাটা সহজ নয়। তাই আপনি মনঃক্ষুন্ন হবেন না যখন আমি বলি যে বিপরীত কামনার তত্বটা আমার কাছে মনে হয় এমন একটা কিছু যা অঙ্গসংস্থানগত (morphological) হওয়ার চাইতে কম গতিময় যা আমাদের রোগনির্ণয় উপাদানের গবেষণা থেকে বিকশিত হতে পারে না। বলতে গেলে এটা আমার কাছে নিরস মনে হয়, এর একটা তৃতীয় মাত্রার অভাব আছে বলে মনে হয়। আমি মনে করি না এটা উদ্বেগ অথবা অবদমনের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। আমি এমন ছাড়ও দিতে পারি না যে আমাদের মনস্তত্বে জীববিদ্যাসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলি অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু আমি এখনও আমার নিজের আপত্তিগুলির পক্ষে দাঁড়াতে প্রস্তুত নই। আমি এখনও বিমূঢ় এবং অনিশ্চিত। আমি দেখছি, উভলিঙ্গতা (নর ও নারী), উভবলতা (প্রেম-ঘৃণা) এবং সক্রিয়-নিষ্ক্রিয়ের বিরোধিতা — এই তিনটি উৎস থেকে বিপরীত বাসনার ঘটনাটার অস্তিত্ব আমরা অবহেলাই করেছি। এই বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের ধারায় নিয়ে আসতে হবে আমরা যাতে দেখতে পারি কী কী সংস্কার অথবা সংশোধন প্রয়োজন এবং আমরা কত দূর পর্যন্ত আপনার ধারণাগুলি বিনা আপত্তিতে মেনে নিতে পারি। আপনার লেখাটা আমাদের বিশ্লেষকের মনোযোগে আনার পর আমি আশা করছি এটাই হবে আলোচনার সিদ্ধান্ত এবং আমিই প্রথম আপনার মনের ক্রিয়াশীলতার প্রতি ঋণ স্বীকার করবো।

আপনার ও আপনার পরিবারের প্রতি ভালোবাসাসহ শ্রদ্ধা জানিয়ে।

আপনার
ফ্রয়েড

1.2.33 তারিখে অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েডকে ডক্টর জি.বোসের চিঠি

1 ফেব্রুয়ারী, 33

আমার প্রিয় অধ্যাপক ফ্রয়েড,

আমার কাজে আপনার সহৃদয় আগ্রহের জন্য আমি আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। ইউরোপের মনঃসমীক্ষক গোষ্ঠীর জন্য বিপরীত কামনার ওপর একটা উপযুক্ত লেখা আপনার কাছে পাঠিয়ে আমি খুব খুশি হবো। এটা বাস্তবিকই আপনার মহত্ব যে আপনি বলেছেন এটা ভিয়েনায় অনুবাদ করাবেন। প্রবন্ধটির লোকায়ত অংশগুলি আমি ছেঁটে বাদ দেবো এবং কিছু বিষয় আমি যোগ করবো বা বদলাবো যার ফলে আমি আশা করি প্রবন্ধটা আপনাদের সব প্রয়োজন মেটাবে। আপনার চিঠিতে উল্লেখিত বিষয়গুলি আমি বিশদে ব্যাখ্যার চেষ্টা করবো যেমন তত্বটির গতিময়তার দিক, অবদমন ও উদ্বেগের ব্যাখ্যা। অবশ্যই আমি বলছি না যে আমার তত্ব আমাদের জানা স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে জড়িত উদ্বেগ বৈশিষ্ট্যের ভিন্ন ভিন্ন সব ঘটনার ব্যাখ্যা করবে। কিন্তু আমি আশা করছিই যে আমার তত্বের ভিত্তিতে আপনাকে একটা বেশ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হবো। আমি আরও আশা করি আমি আপনাকে দেখাতে পারবো যে আমার অবদমনের ব্যাখ্যা সরলতর এবং অধিকতর সন্তোষজনক এর সম্পর্কে চলতি মতামতের চাইতে। বস্তুতপক্ষে, আমি দাবি করি যে বিপরীত কামনার তত্ব অবদমন ব্যাখ্যা করতে বিশেষ করে উপযোগী। (কামনা ছাড়া, যেটা আমারই সংজ্ঞা অনুযায়ী একটা গতিময় মানসিক উপাদান, প্রদত্ত কোন মানসিক উপাদানগুচ্ছে পরিবর্তন আনতে সক্ষম অন্য কোন মানসিক উপাদানকে আমি স্বীকার করি না। আমার অনুভূতির তত্ব আমার কামনার তত্বের

ওপর প্রতিষ্ঠিত)। তত্ত্বটিতে তৃতীয় মাত্রার অভাব আছে— এ কথা বলে আপনি কী বোঝাতে চেয়েছেন আমি তা বুঝতে পারিনি। আপনি যদি এটা স্পষ্টতর করে বলতে পারতেন তা হলে আমি আপনার আপত্তিটা মিটিয়ে নিতাম। আমি নিতান্ত কৃতজ্ঞ থাকবো আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাকে জানান আর কী কী বিষয়ে আমার আরও ব্যাখ্যার আপনার প্রয়োজন আছে।

দুর্ঘটনাবশত আমার মুখ ও ডান হাতটা খুব খারাপভাবে পুড়ে গেছে। এর জন্য আপাতত কোন কাজ করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি কোন রকমে আমার নামটা স্বাক্ষর করতে পারছি। আমি আশা করছি এক মাসের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবো যখন আমি প্রবন্ধটার পুনর্লিখন শুরু করবো। যে কোন পরিস্থিতিতেই আমি এটা আপনার কাছে মার্চ মাস শেষ হবার আগেই পাঠাতে চেষ্টা করবো।

আপনি কি লেখাটার মাপ সীমিত করে দিতে পারেন যাতে পত্রিকাগুলির পক্ষে খুব বেশি বড় না হয়ে যায়?

আমার প্রতি যে বিরাট সহৃদয়তা আপনি সর্বদাই দেখিয়েছেন তার জন্য আবারও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্বাস করি চিঠিটা আপনি ভাল আছেন দেখবে।

আপনার অতি বিশ্বস্ত
জি. বোস

25.10.37 তারিখে ডক্টর জি. বোসকে অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েডের চিঠি

অধ্যাপক ডক্টর ফ্রয়েড 26/X/1937
ভিয়েন IX, বারগাস 19

মাননীয় সহকর্মী,

আপনি আমাকে জানিয়েছেন আপনি কংগ্রেসের মনস্তত্ব বিভাগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন যে কংগ্রেসটা অনুষ্ঠিত হবে আপনাদের নগরে 1938-য়ের জানুয়ারি মাসে, আমি আপনাকে অভিনন্দিত করছি এই সু-অর্জিত সম্মানের জন্য।

কিছু পরে "স্বাভাবিক মনস্তত্বের প্রতি অস্বাভাবিক মনস্তত্বের অবদান" (Contributions of Abnormal Psychology to Normal Psychology) নামে এস.সি. মিত্রের একটা লেখা আপনি পাঠিয়েছেন এবং কংগ্রেসের জন্য ওটির সম্বন্ধে আমার মন্তব্য পাঠাতে বলেছেন। যদিও কংগ্রেস বসবে কয়েক মাস বাদে তবু আমি আজ আপনার অনুরোধে দ্রুত সম্মত হচ্ছি শুধু আমাদের মধ্যে 'ডাক পার্থক্যের' জন্য নয়, তা ছাড়াও আমার বয়সের মধ্যে নিহিত অনিশ্চয়তার জন্যও।

মিত্রর ব্যাখ্যা আমাকে বিব্রত বোধ করিয়েছে। তিনি সব কিছুই বলেছেন যা আমি নিজেই বলতে পারতাম যার জন্য আমি বড় জোর তাঁকে কেবল সমর্থন করতে পারি। তিনি স্পষ্ট এবং নির্দিষ্টভাবে প্রতিটি বিষয় ব্যক্ত করেছেন যা আমি কদাচিৎ দেখেছি। আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ বোধ করি আমার অনুসারীর প্রতি যিনি নিশ্চয়ই আমাদের অবস্থানের সাহসী বিবরণ দেওয়ার পক্ষে অবশ্যই নবীন। তিনি বুঝতে অবশ্যই ব্যর্থ হননি যে মনঃসমীক্ষণ এখনও পর্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং অনেক বিষয়ে এখনও অনিশ্চিত, কিন্তু মনঃসমীক্ষণ অপরিণত এবং নিশ্চয়ই অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত মনস্তত্বের বিজ্ঞানের প্রতি এর অবদানের মূল্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকবে না।

আপনার সুস্বাস্থ্যের জন্য ও কংগ্রেসের জন্য হার্দিক শুভেচ্ছা।

আপনার বিশ্বস্ত
ফ্রয়েড

31-10-37 তারিখে ডক্টর জি. বোসকে আনা ফ্রয়েডের চিঠি

আনা ফ্রয়েড অক্টোবর 31,1937
ভিয়েন IX, বারগাস 19

প্রিয় ডক্টর বোস,

আমি বাবাকে আপনার চিঠি দিয়েছি এবং তিনি নিজেই ইতিমধ্যে উত্তর দিয়েছেন। ডক্টর এস. সি. মিত্রের আলোচ্য বিষয়ের চমৎকার ব্যাখ্যা পাঠে আমরা দুজনেই অত্যধিক আগ্রহী হয়েছি। আমি কামনা করি ভারত যেন বেশি দূরে আর নয় যাতে কোন এক সময়ে আমি সেখানে আসতে পারি এবং আপনাদের কাজে অংশ নিতে পারি।

সহৃদয় শ্রদ্ধাসহ

আপনার অতি বিশ্বস্ত
আনা ফ্রয়েড

প্রযুক্তি নিয়ে একটা এবড়ো খেবড়ো লেখা

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

টুকরো টুকরো ছোটো ছোটো কথা, অভিজ্ঞতা, শোনা, জানা, দেখা চলে, চলতে থাকে আমাদের জীবনে। যদি কান খোলা রাখি, চোখ মেলে রাখি, মাথা তৈরি রাখি তাহলেই।

এমনই টুকরো গুলো জমতে জমতে বেশ ভারি হয়, চাপ তৈরি হয়, তখন হালকা হতে চেয়ে, চাপ কমাতে চেয়ে নিজেরটা, নিজের কাছে থাকাটা, রাখাটা অন্যের সাথে ভাগ করে নেওয়া, নিলে একটা আরাম হয়, ভার কমে যাওয়ার আরাম।

এমনই এক তাগিদে এই লেখাটা। নিজে থেকে চেয়ে লেখা নয়। রবীনদা, রবীন চক্রবর্তীর বলাতে, আদেশ দেওয়াতে। আর একটা কারণে লিখতে রাজি হওয়া।। রবীনদার কাছে শুনলাম সৌমেনদা সম্পাদনার দায়িত্বে।

খুব যে গুছিয়ে একটা তাত্বিক কথা তেমনটি নয়। খুব যে সাজিয়ে একটা বিবরণ তাও নয়। টুকরো টুকরো কথা যেভাবে আসে, জমে, অগোছালো, তেমনই রাখা না গুছিয়ে। এবড়ো খেবড়ো।

ইস্পাত বানানোর একটি বড়ো কম্পানির কলকাতার হেড আপিসের কয়েকজন কর্মীর সাথে বছর দুতিনের আগে পরিচয় হয়েছিল। ওরা ওদের ইউনিয়নের জন্মদিনে বলতে ডেকেছিলেন। গিয়েছিলাম। এ বছর আবার এসেছিলেন বলার জন্য ডাকতে। রাজি হইনি। বলেছি আমাদের মতো বাইরের লোকদের নিয়ে বলাবেন কেন। নিজেরা বলাবলি করুন। আড্ডা দিতে দিতে জানা গেল অফিস কর্মচারির সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। এমন নয় যে কম্পানির কাজ কমে যাচ্ছে। তা নয়, বরং বাড়ছে। হেডআপিসের সবাইয়ের কাজ কমপিউটারের সামনে বসে। প্রতিদিন কমপিউটার এমন এমন ব্যবস্থাপনা নিজের মধ্যে ঢুকিয়ে নিচ্ছে, যাতে সেই ব্যবস্থাপনার কাজে কম কম কর্মী লাগে। একজন নারীকর্মী বললেন, খানিকটা মজা করে, সেই ব্যবস্থাপনাটা আমরাই বানিয়ে দিচ্ছি। আমাকে 'অদরকারি' আমিই বানিয়ে দিচ্ছি। এই ব্যবস্থাপনা আদপে একটা প্রযুক্তি। ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তি। কাজ প্রযুক্তি। যত এই প্রযুক্তির পরিসর বড়ো হতে থাকবে, তত কর্মী মানুষ কম দরকার পড়বে। তারা ছাঁটাই যত থাকবেন।

আমি ওদের কথায় কথায় বললাম এবার আপনাদের ইউনিয়নের জন্মদিনে বাইরে থেকে কোনও বক্তা না এনে নিজেরা বলুন, মঞ্চ না বানিয়ে চেয়ার টেনে গোল হয়ে বসুন। কথা বলুন প্রতিদিন নিজেদের অদরকারি বানানোর ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনে নিজেরাই যুক্ত হয়ে থাকার প্রক্রিয়াটা নিয়ে। কি করা যায়। কি ভাবে আটকানো যায়। কি ভাবে আটকানোর লড়াইটা বানানো যায়।

ব্যাঙ্কে গেলেই দেখা যায় ক্রমশঃ কর্মী সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ব্যাঙ্কের কোনও কোনও কাউন্টারের পিছনে কেউ বসে নেই। কাউন্টারটাই বন্ধ। কর্মী ছাঁটাই। ছাঁটাই না বলে ছাঁটাই করা। পুরনো কর্মী অবসর নিচ্ছেন। নতুন কর্মী নেওয়া হচ্ছে না। দুজন পুরনো কর্মী অবসর নিচ্ছেন। একজন নতুন কর্মী নেওয়া হচ্ছে। ব্যাঙ্কের ব্যাবস্থাপনা এখন এমন যে আমাকে বিশেষ কোনও দরকার না পড়লে ব্যাঙ্কে যেতে হয় না। টাকা তোলো যখন তখন এটিএম মেশিন থেকে। চেক জমা দাও বাক্সে কিংবা যন্ত্রে। টাকা ব্যাঙ্ক থেকে না পাঠিয়ে পাঠাও অনলাইনে। ব্যাঙ্ক ব্যাবস্থাপনা প্রযুক্তি এমন জায়গায় চলে যাচ্ছে। যখন একটি ব্যাঙ্ক শাখা, একজন কর্মী, অনেক কটি মেশিন। কর্মীর প্রয়োজন নেই।

টেলিফোন বিল, ইলেকট্রিক বিল জমা দিতাম কাউন্টারের লাইনে দাঁড়িয়ে। ক বছর ধরে শুরু করেছি একজনকে দিতাম জমা দেবার জন্য। তাকে টাকা দিতাম। সে লাইনে দাঁড়িয়ে কাউন্টারে বসে থাকা কর্মীকে বিল আর টাকা দিতেন। আমার একটি কাজে দুজনের প্রয়োজন। দুজন আয় করতেন। এখন যদি অনলাইনে জমা দিই, দুজনের আয় কমে গেল, দুজনের শ্রম বাতিল হয়ে গেল। অনলাইন প্রযুক্তি এখন সব কাজে। ট্রেনের টিকিট, সিনেমার টিকিট, বই কেনা, জিনিস কেনা, চিঠি দেওয়া নেওয়া, বই বানানো, পত্রিকা বানানো, কর্মীর বদলে যন্ত্র, প্রযুক্তি।

ক্যাশলেশ ইকনমির মতো একটা 'ম্যানলেশ' ইকনমি জন্ম নিচ্ছে, জন্ম দেওয়া হচ্ছে।

মারুতি সুজুকি কারখানার শ্রমিক আন্দোলনের সময়টাকে

নিয়ে একটা তথ্যসিনেমা দেখেছিলাম। এমনভাবে গাড়ি বানানোর প্রযুক্তি, প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক-প্রযুক্তি, শ্রমিক-উৎপাদন, শ্রমিক-শ্রমিক ব্যবস্থাপনা বানানো যাতে একটা গাড়ি বানানো পিছু যতটা কম শ্রমিক লাগে। সম্ভাব্য শ্রমিক নিয়োগকে কতটা কমিয়ে দেওয়া যায়। 'লেবারলেশ' প্রডাকশন। ম্যানলেশ ইকনমি।

রাস্তা দিয়ে হাঁটলেই, দাঁড়ালেই চোখে পড়ে, রাস্তা, বাড়ি ইত্যাদি বানানোয় এমন যন্ত্র ব্যবহার, যন্ত্রের এমন ব্যবহার, যা আগে শ্রমিকদের কাজ ছিল। 'ওয়ার্কারলেশ' কনস্ট্রাকশন। ম্যানলেশ ইকনমি।

আর উদাহরণ বাড়িয়ে লেখায় পাতা বাড়াচ্ছি না।

প্রথম যখন কলকাতায় অটোমেশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল তখন যতটা মনে পড়ছে আন্দোলনের সমর্থন থেকে বিরোধিতাই বেশি ছিল। এমন সব যুক্তি ছিল — অটোমেশন তো হবেই, যন্ত্র তো আসবেই, প্রযুক্তির উন্নতি তো হবেই। শ্রমিকের শ্রমের কষ্ট কমাতে, শ্রমিকের অবসরের, বিনোদনের, নিজের জন্য সময়কে বাড়াতে। কিন্তু সেদিন কেউ কেউ এমনটিও ভেবেছিলেন, বাড়তে বাড়তে এমন দিন আসবে যেদিন শ্রমিকই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। 'ওয়ার্কারলেশ' প্রডাকশন।

এর একটা উত্তর ছিল। প্রযুক্তির উন্নতির জন্য শ্রমিক, কর্মচারি একটা কারখানায়, কাজে উদ্বৃত্ত হবে, কিন্তু অর্থনীতির অগ্রগতিতে কারখানা বাড়বে, উৎপাদন বাড়বে, নিয়োগ বাড়বে, ভারসাম্য আসবেই প্রযুক্তি আর কর্মের মধ্যে। কিন্তু এমনটি তো হলো না। হবেই এমন ভরসার দেখা নেই। তা হলে?

আর একটা উত্তর ছিল। শিল্প জায়গা দিতে না পারলে পরিষেবা দেবে। উত্তর মেলেনি।

উৎপাদনে যে পরিমাণ প্রযুক্তির আক্রমণ, পরিষেবায় তার থেকে কর্ম নয়। এই লেখাটির প্রথমে তার উদাহরণ রয়েছে। আই টি সেক্টরে ক্রমাগত ছাঁটাই, ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। অনলাইন বিপনন সংস্থায় কর্মীদের ছাঁটাই খবরের কাগজের পাতার কোণা থেকে উঁকি মারে।

শ্রম নিয়োগের হার কমতে কমতে এবার তো প্রায় শূণ্য।

ছাঁটাই একটা ফল। আর একটা হলো প্রযুক্তির ভয় দেখিয়ে, ভয়ের মুখে মাইনে কমিয়ে দিয়ে, সুযোগ সুবিধা ছেঁটে দিয়ে, কাজের সময় বাড়িয়ে দিয়ে, কাজে রেখে দেওয়া।

প্রযুক্তি এখন ভয় দেখানোর বিষয়। দৈত্যদানোর গপ্পো বলে যে ভাবে ছোটদের ভয় দেখানো হতো, ভিতু বানানো হতো।

এ বিষয়ে আর তেমন কিছু বলার নেই। যা বলবো একই কথা আবার বলা হবে।

বরং একটা পাশের কথায় চলে যাই।

শিল্প থেকে পরিষেবা থেকে ফিরে আসাদের জায়গা দেবার জন্য পরে রইল কৃষি। স্বাধীনতার পর থেকে এই সেদিন সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম পর্যন্ত ডান, বাম সবার মাথায় ছিল, আছে কৃষি অনুন্নত, শিল্প উন্নত। দেশের অগ্রগতি মানে কৃষি থেকে শিল্পে যাওয়া, কৃষক থেকে শ্রমিক হওয়া। বামপন্থীদের অংকে 'প্রলেতারিয়েত' হওয়া। এখন হলো উল্টোটা। শিল্পে, পরিষেবায় জায়গা না পেয়ে কৃষিতে ফেরা, গ্রামে ফেরা, মাথা গুঁজবার জন্য, পেট ভরাবার জন্য।

এবং কৃষিতেও প্রযুক্তি। সেই কবে থেকে। প্রযুক্তির যন্ত্র, প্রযুক্তির বীজ, প্রযুক্তির সার, প্রযুক্তির কীটনাশক, প্রযুক্তি ভিত্তিক এগ্রিকালচারাল প্রডাকশন। ফলে চাষে কর্মী উদ্বৃত্ত। শিল্পের মতন, পরিষেবার মতন। যে প্রযুক্তি শিল্পে কর্মী বাতিল করেছে, পরিষেবায় বাতিল করেছে, কৃষিতেও কর্মী কমালো। কৃষিতে যারা ফিরে এলো তারাও উদ্বৃত্ত।

প্রযুক্তি এই যে কর্মী ছাঁটাই, কর্মী উদ্বৃত্ত বানিয়ে চলেছে, তা থামবে কোথায়? উত্তর জানা নেই।

প্রশ্নটাকে খুব একটা এগোলে সেই শোনা পাল্টা প্রশ্নটা ধেয়ে আসবে — তাহলে কি এরোপ্লেন ছেড়ে দিয়ে গরুর গাড়িতে ফিরে আসবো?

এখন এর উত্তর হতে পারে — 'এরোপ্লেন' চড়বো, 'গরুর গাড়ি'ও চড়বো। সবাইকে তো আর 'এরোপ্লেন' চড়ানো গেল না, যাবেও না। যাদের 'এরোপ্লেন'-এ চড়ানো হবে না, কোনও দিনও হবে না, তাদের 'গরুর গাড়ি'টা 'এরোপ্লেন'-এর নাম করে কেড়ে নেওয়াটাও তো ঠিক হলো না।

অন্য সব কিছুর মতো, সব জায়গার মতো প্রযুক্তিরও 'শ্রেণী' থাকে। 'শ্রেণী সংঘাত' থাকে।

'এরোপ্লেন' চড়ানোর কথা বলে 'গরুর গাড়ি' ভেঙ্গে দেওয়ার একটা বড়ো উদাহরণ কৃষি। চাষিদের নিজেদের বীজ, স্থান অনুযায়ী, কাল অনুযায়ী, গড়ে ওঠা, থেকে যাওয়া বীজকে 'গরুর গাড়ি' বলে সরিয়ে দিয়ে 'এরোপ্লেন'-এর

2-F

দামে কোম্পানি বীজ ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। 'ভিতর'কে সরিয়ে দিয়ে 'বাইরে'কে একবার ঢুকিয়ে দিলে সে 'ভিতর'টাকে তছনছ করে দেবে 'বাইরে'র সব কিছু ঢোকাতে। কোম্পানি পুঁজি, উৎপাদন পুঁজি, বাজার পুঁজি, একটুতে একটাতে সন্তুষ্ট হয় না, হওয়া যায় না। হুর হুর করে 'এরোপ্লেন'রা ঢুকে পড়লো। ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। ঢুকিয়ে দিল বড়ো পুঁজির পাশে থাকা সরকার, সরকারের কৃষি আমলারা, সরকারের কৃষি পন্ডিত, কৃষি সংস্থা, কৃষি গবেষণা সংস্থা। 'এরোপ্লেন'রা এসে সরিয়ে দিল 'গরুর গাড়ি'দের। চাষির নিজের বীজ, সার, কীটনাশক, যন্ত্র, চাষ জ্ঞান, চাষ অভিজ্ঞতা, জল, মাটি। 'গরুর গাড়ি'দের ভেঙ্গে দেওয়া হলো, এবার চাষির অসুখ, মাটি শক্ত, জল নিচে নেমে গেছে, খরা, ধার দেনা, ব্যাঙ্কে ভিক্ষা, আত্মহত্যা, কৃষি পন্ডিতদের নিদান, আরও ঋণ নাও, আরও 'এরোপ্লেন' বীজ নাও, বড়ো বাজারের জন্য এক ফসলে মাঠ ভরে দাও। না পারলে দড়ি লাগিয়ে ঝুলে পড়ো, কীটনাশক খেয়ে নাও। রাজনীতিক দলেরা কৃষকের বাড়ি গিয়ে বৌ ছেলের সঙ্গে দেখা করবে, কাগজে ছবি বেরবে, টিভিতে তক্কাতক্কি হবে। ক্ষতিপূরণের দাবিতে ভোটের রাজনীতি হবে। কেউই 'এরোপ্লেন'-এর বদলে 'গরুর গাড়ি'র কথা বলবে না।

বলতে বলতে অনেকটা পথ, অলিগলিতে চলে এসেছি। এবার বড়ো রাস্তায় ফিরি।

বড়ো রাস্তাটা ছিল প্রযুক্তি আর উচ্ছেদ, উৎখাত, বাতিল এর সম্বন্ধ নিয়ে। কর্মী বাতিলের কথা বলতে গিয়ে অসংখ্য বাতিলের কথায় চলে এলাম।

মাঝখানে একটা সময় 'শ্রেণী' বিষয়টাতে পৌঁছেছিলাম। সেখানে একটু দাঁড়িয়ে নিই। 'প্রযুক্তি' যে একটি শ্রেণী বিষয় সেটা বুঝতে অনেকটা সময় নেওয়া হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি যে শোষক শ্রেণীর পক্ষে, শোষিত শ্রেণীর বিপক্ষে এখন এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলাবলি হোক, কথা উঠুক।

কখনও যে তোলা হয়নি তাও নয়। তখন উত্তরটা আসতো 'সমাজতান্ত্রিক প্রযুক্তি'র দিক থেকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চিন-এর দিক থেকে। উত্তর মেলেনি। 'সমাজতন্ত্র' 'শ্রমিক', 'কৃষক'-এর পক্ষে প্রযুক্তি বানাতে পারেনি, প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে পারেনি। প্রযুক্তি সমাজতান্ত্রিক না হয়ে পুঁজিবাদীই থেকে গেছে। প্রযুক্তির মালিকানা পুঁজির মালিকানার মধ্যেই ঢুকে আছে। তাহলে?

কথা যখন পারা চলছেই আর একটা চলতি কথা পেরে নিই।

বন্ধুদের সাথে নানা জায়গায় কাজ করতে গিয়ে এমন কথাটি শুনেছি।

পাথর খাদান। স্টোন চিপ বানানো। যারা বানাচ্ছেন তারা স্থানীয় আদিবাসী এবং দরিদ্র অঞ্চল থেকে আসা মানুষজন। এমন বানানোর প্রযুক্তিতে ক্ষতি হচ্ছে, ক্ষতি হয়ে চলেছে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, জীবন, চারপাশের পরিবেশ, গাছ, জল, মাঠ, চাষ, বাড়ি, অধিবাসী।

আন্দোলনের জোরটা যতটা পড়েছে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিয়ে, ততটা প্রযুক্তি নিয়ে নয়। একই কথা স্পঞ্জ আয়রন কারখানা নিয়েও। যখনই প্রযুক্তি বদলের কথা উঠেছে তখনই উত্তর এসেছে: ঠিকঠাক প্রযুক্তি দিয়ে উৎপাদন করতে হলে উৎপাদন খরচ বাড়বে, জিনিসের দাম বাড়বে, সাধারণ ক্রেতার ক্ষতি হবে। সাধারণ ক্রেতার ক্ষতি হলে বাজারের ক্ষতি হবে, বাজারের ক্ষতি হলে পুঁজির ক্ষতি হবে, পুঁজির ক্ষতি হলে শাসকদের ক্ষতি হবে। যুক্তিটাকে পিছন দিকে হাঁটালে শাসকদের ক্ষতি হবে তাই শোষিতদের ক্ষতি বন্ধ করার প্রযুক্তি নয়।

এমন যুক্তির পাতা ফাঁদে আমাদের পা যে আটকে যায়নি তেমনটি জোর কদমে বলা যাবে না। আমরা শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণে যতটা মন দিয়েছি প্রযুক্তি নিয়ে ততটা নয়। কোথাও যেন ধরে নিয়েছি প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলাটায় নামলে পা আটকে যাবে।

পা আটকালে পা তুলেও নেওয়া যায়। তুলে নেওয়াটা জেনে নেওয়া যায়।

এতদিনে অনেক নতুন নতুন কথা, লেখা, বোঝা, অনুভব, তক্কো, বিষয়, বোধ, অভিজ্ঞতা, জানা এসে গেছে, আসছে। আমরা আবার একটু জড়ো হতে পারি। যেমনটি একদিন 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'তে 'বি-ও-বি'তে হতাম।

আমি না পারি, আমরা না পারি। অন্যরা হতে পারে। হোক না।

স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা **অসুখ-বিসুখ** 254 লেক টাউন, B ব্লক, কলকাতা, ফোন: 9038994931

ছিছি, এ সব নিয়ে কেউ লেখে নাকি

অনিন্দ্য রুদ্র

বেশ কিছুদিন আগের কথা। একজন কবি এবং বিখ্যাত একটি মননশীল পত্রিকার সহ-সম্পাদক আমাকে আর একটি অন্য পত্রিকার জন্য লেখা দিতে অনুরোধ করেন। এই পত্রিকাটি একটি জেলা শহর থেকে বেরোয়। উনি বেশ জোর দিয়ে বলেছিলেন পত্রিকাটি খুবই ঋদ্ধ এবং ঐ জেলার বেশ কিছু বিশিষ্ট সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ, যাঁদের বেশীর ভাগই অধ্যাপনার সংগে যুক্ত নাকি এই পত্রিকাটির সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। উনি বললেন, আমার মাধ্যমে দেওয়ার দরকার নেই, আপনি লেখাটি সরাসরি পত্রিকার অফিসে পাঠিয়ে দেবেন।

আমি তো ওনার কথায় যথারীতি লেখা দিলাম। তারপর প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে। একদিন প্রায় রাতে সাড়ে এগারোটার সময় কবি ভদ্রলোকের আমাকে ফোন। ফোন করেই উনি প্রায় ধমকাতে শুরু করলেন।'কি মশাই, কি সব বাড়ীর কাজের লোকটোক নিয়ে কি সব লিখেছেন, আপনাকে লিখতে বলে তো আমারই মাথা কাটা গেল। সবাই যা-তা বলছে। ছি ছি এসব নিয়ে কেউ লেখে নাকি? আমাদের সবায়েরই একটা ভদ্রতার আলাদা মুখোশ থাকে, বিশেষ বিশেষ সময় যা খুলেও পড়ে। বুঝলাম ওনার তখন সেই মুখোশটা খুলে যাচ্ছে।

উনি ঠিকই বলেছিলেন। আমার লেখাটা ছিল বাড়ীতে যাঁরা কাজ করেন, অর্থাৎ 'ঝি চাকর' তাদের সম্বন্ধে তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। কাজেই এক অর্থে তো অপরাধ হয়েই ছিল। উনি অবশ্য লেখাটি পড়েননি, কিন্তু ঐ সব বিদগ্ধ মানুষজন, যাঁদের বেশীর ভাগই আবার কলেজে পড়ান, কখনও ভুল বলতে পারেন নাকি? আর তাঁদের মতামত ও নিশ্চয়ই এতটাই আক্রমণাত্মক ছিল যে উনি এই কারণে রাত্রে সাড়ে এগারোটার আমায় ফোন করে ধমকাচ্ছিলেন। (যদিও পরে এই ভদ্রলোক লেখাটি নিজে পড়ে আমাকে বলেছিলেন যে ওটা নাকি ওনাদের 'শ্রেণী চেতনা'র সমস্যা ছিল)

ooo

আমার মতো এলেবেলে কলমচির এই রকম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে টেনে আনার একটাই কারণ যে সাধারণভাবে বাড়ীতে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের প্রতি আমাদের অর্থাৎ যাঁরা তাঁদের কাজে নিয়োগ করি তাঁদের কি মানসিকতা সেটা বোঝার জন্য এই ঘটনাটা একটা উদাহরণ হতে পারে। যতই শিল্প সংস্কৃতি করি না কেন, আদপে তো আমরা বাবু শ্রেণীর শিক্ষিত ভদ্রলোক, আলাদা কোনও দেখার চোখ কি করেই বা থাকবে? আরে ঝিচাকররা সে ঝিচাকর, তাদের আবার অধিকার কি, আবার দাবীই বা কিসের? আজ এই বিষয়ে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক, লারেলাপ্পা পার্টি, বুদ্ধিমান, গাড়োল, কবি, কেরাণী, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী কারুরই মানসিকতার তফাৎ নেই।

কিন্তু এত দূরের উদাহরণের দরকারই বা কি? যে কোন সামাজিক মেলামেশার জায়গায় যদি কান পাতেন, তবে দেখবেন অধিকাংশ আলোচনাই ঘুরপাক খায় বাড়ীর কাজের লোকদের অবাধ্য আচরণ আর অত্যাচার নিয়ে। 'আর বলবেন না দিদি, এত দিই, এত করি, তবু খালি ফাঁকি, খালি ফাঁকি, আজ ছেলের জ্বর তো কাল মেয়ের বিয়ে। অথচ মাইনের বেলায় দেখুন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে' — এই জাতীয় কথাবার্তা শুনতে খুব দূরে যাওয়ার দরকার পড়ে না।

এই এত মাইনে এবং এত ছুটি প্রশ্নটাকে একটু ঠান্ডা মাথায় বোঝা দরকার। কাজের প্রকৃতি এবং কাজের সময়ের ওপর নিশ্চয়ই হেরফের হয়, কিন্তু সাধারণভাবে কোলকাতা বা শহরাঞ্চলে একজন পুরো সময়ের লোকের সর্বোচ্চ মাইনে আড়াই থেকে তিনহাজার টাকা, যাওয়া থাকা ছাড়া। এর চেয়ে বেশী মাইনে যে পায় না কেউ তা হয়ত না, কিন্তু সেটা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম, যদিও এর চেয়ে কম মাইনের উদাহরণ ভুরি ভুরি আছে। খাওয়া থাকার হিসাবটাকে টাকার পরিমাপে আনা একটু কঠিন। আমি আলোচনার সুবিধার জন্য মাইনেটাকে দ্বিগুণ করে দিচ্ছি, অর্থাৎ পাঁচ কি ছ হাজার মাসে। যদিও থাকা এক কোণে ছেঁড়া মাদুরের ওপর ফাটা তোষকে ছেঁড়া বালিশে শুয়ে কোনোরকমে রাত কাটানো, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা হয় সিঁড়ির তলায় বা রান্নাঘরের

এক কোণে। খাওয়ার কথাও না বলাই ভালো, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুরকম ব্যবস্থা চলে, অর্থাৎ বাড়ীর লোকদের জন্য এক রকম মেনু, আর ঝিচাকরদের জন্য আলাদা। আমরা যা খাবো ওরাও তা খাবে, সেটা সম্ভব? তার ওপর গাঁয়ের লোক, এত খায়। খাইয়ে খাইয়ে আর পেরে উঠছি না, যার অভিযোগ প্রচুর শোনা যায়। ফলে সেই সব অবাঞ্ছিত খরচ এড়াবার জন্য সস্তা চাল কেনা, চায়েতে চিনির বদলে গুড় দেওয়া, সে সবও চলে। আরে এখানে আছে বলে তো এত খেতে পাচ্ছে, গ্রামে হলে পেত কি?

একটা কথা মনে রাখতে হবে, এই যে মাইনেটার কথা লিখলাম সেটা কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা কাজের হিসাব। কোনো সাপ্তাহিক ছুটি নেই, প্রফিডেন্ট ফান্ড, ই.এস.আই., গ্র্যাচুইটি বা কোনো চাকরী সংক্রান্ত সুযোগের প্রশ্নই নেই। চাকরীর নিরাপত্তার কথাটা হাস্যকর। যে কোন সময়ে দশ মিনিটের নোটিশেও ঘাড় ধাক্কা দেওয়া যেতে পারে। বছরে একবার দেশে যাওয়ার জন্য পনেরো দিন থেকে এক মাস ছুটি সাধারণত পাওয়া যায়। ঠিকে ঝি হলে মাঝে মধ্যে কামাই। কিন্তু সব মিলিয়েও বছরে বাহান্ন দিনের কম। অর্থাৎ সপ্তাহে একদিন ছুটি হচ্ছে না।

আমাদের দেশে Minimum Wage Act 1872 নামে একটা আইন আছে। এই আইনটাই মূলতঃ যে কোন শ্রমিকের নূন্যতম বেতন কত হবে সেটা ঠিক করে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার দুজনরাই নূন্যতম মজুরী বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের জন্য ঠিক করতে পারেন। নিয়ম হচ্ছে রাজ্য বা কেন্দ্র যাদের মজুরী বেশী সেটাই দিতে হবে। এই মজুরী কিন্তু আট ঘন্টা সময়ের জন্য, সপ্তাহে একদিন ছুটি সহ। কাজ করালেই তার প্রডিভেন্ট ফান্ড কাটতে হবে এবং সমপরিমাণ টাকা মালিককে জমা দিতে হবে, অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা হিসাবে (এমন কি কর্মীর সংখ্যা একজন হলেও)।

পশ্চিমবঙ্গে নূন্যতম মজুরীর আওতায় গৃহসহায়ক বা বাড়ীর কাজের লোকরা পড়ে না, যদিও ভারতের সাতটি রাজ্য তাদের তালিকায় গৃহ সহায়ক/সহায়িকাদের অন্তর্ভূক্ত করেছে। অর্থাৎ বাড়ীতে কাউকে দিয়ে কাজ করাতে গেলে তাকে নুন্যতম মজুরী দিতেই হবে। এই লেখা যখন লিখছি তখনই খবর পেলাম কেন্দ্রীয় সরকারও ভাবনাচিন্তা করছেন সারাদেশে যে 42লক্ষ গৃহসহায়ক/সহায়িকা আছেন তাঁদেরকে, নূন্যতম মজুরীর আওতায় আনার জন্য। সেই উদ্দেশ্যে লোকসভায় বিলও পাশ করানোর ইচ্ছা তাঁদের এবং তার উদ্দেশ্যে সবায়ের কাছ থেকে তাঁরা মতামতও চাইছেন।

নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আইন থাকলেও তার রূপায়ণ করা অত্যন্ত কঠিন, প্রায় অসম্ভব। কেন না কোথাওই তো নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না। অন্য কোনও নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থাও নেই। ফলে এই নূন্যতম মজুরী দেওয়া হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা দেখবে কে? তা ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে কম মাইনে দিয়েও যদি বেশী টাকার রশিদে কেউ সই (বা টিপ সই) করিয়ে নেয়, ধরা যাবে কি? এই সব লোকরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তো অশিক্ষিত।

কিন্তু যদি নূন্যতম মজুরী দেওয়ার বিষয়টাকে সুনিশ্চিতও করা যায় কোনো ভাবে তা হলে মাইনে কত হবে? অন্য রাজ্যগুলির হিসাব বা অন্য ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মজুরীর হিসাবে (রাজস্থান, যেখানে প্রথম এদের ন্যূনতম মজুরীর আইন আসে, সেখানে বেতন 5600 টাকা মাসে) অন্তত সাড়ে পাঁচ থেকে ছ হাজার টাকা মাসে, (অন্যান্য ক্ষেত্রের অদক্ষ শ্রমিকদের মাসিক মজুরীও মোটামুটি এটা) কিন্তু সেটা হল দিনে আট ঘন্টা কাজের হিসাবে, চব্বিশ ঘন্টা বা কমপক্ষে বারো ঘন্টা বা আঠরো ঘন্টা নয় কিন্তু। অর্থাৎ আমরা যেটাকে খুব বেশী মাইনে বলছি সেটা এক তৃতীয়াংশও নয় ন্যূনতম মজুরির পরিপ্রেক্ষিতে।

আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখানে আছে সেটা হল কর্মী সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ানের প্রশ্ন। ওয়েব সাইট ঘেঁটে একটি সংগঠন দেখলাম বটে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিশেষতঃ কোলকাতায় এ রকম কোনো সংগঠনের অস্তিত্ব আমার অন্ততঃ জানা নেই। আমার মনে আছে বহুদিন আগে, খবরের কাগজে কয়েকজন গৃহ সহায়ক/সহায়িকা মজুরীবৃদ্ধি এবং সংগঠনের অধিকারের দাবী জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল একেবারে। সম্পাদকের কাছে ভদ্রলোকদের প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠির পর চিঠি ছোট লোকদের এ রকম অস্পর্ধা দেখে। একটা জিনিস ভালো লাগল যে প্রস্তাবিত আইনে ন্যূনতম মজুরীর সঙ্গে সংগঠন গড়ার অধিকারকেও স্বীকার করা হয়েছে। যদিও সংগঠন থাকলেও তা কতটা কার্যকর হবে, ওঁৎ পেতে বসে থাকা রাজনৈতিক দলগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে একেবারে তা গিলে নেবে কি না তা নিয়েও

যথেষ্ট চিন্তার কারণ আছে। তবুও সংগঠন থাকলে অধিকার অর্জন নিঃসন্দেহে অনেকটা সহজ হবে।

ooo

আসলে মূল সমস্যাটা হল একটা দৃষ্টিভঙ্গীর সমস্যা, শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণী কী চোখে অশিক্ষিত শ্রমজীবী প্রান্তিক মানুষকে দেখে। এটা শুধু যে 'কাজের লোক'দের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ তা নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গীই শ্রমজীবী, বয়স্ক গরীব মানুষকে 'আপনি'র বদলে 'তুমি' বলতে শেখায়, সাফাই কর্মী, মুটে-মজুরকে 'তুই' বলতে শেখায়। কৃষককে চাষা, যৌনকর্মীকে 'বেশ্যা' ভাবতে শেখায়। তাঁদের প্রতি যে কোন রকমের অসম্মান ও অপমানের অধিকার জন্মে যায়। 'ওরা' আসলে 'ওরা', 'আমরা' আসলে 'আমরা' — 'ওরা' আর 'আমরা' কখনও এক হতে পারি? সমান হতে পারি? ওরা লেখাপড়া শেখেনি, গায়ে গতরে খেটে খায়, আর আমরা স্কুল কলেজে পড়েছি, দু পাঁচটা পাশ দিয়েছি, চাকরী বাকরী করি — ওদের সংগে আমাদের তুলনা চলে কি?

স্কিল বা যোগ্যতার কথাটা এই প্রসঙ্গে খুব শোনা যায়। কি এমন স্কিল আছে এই কাজের লোকগুলোর যে এত টাকা দিতে হবে? কিন্তু একটা কথা আমরা সবাই তখন ভুলে যাই যে স্কিল আসলে তৈরী হয় সুযোগ পাওয়ার ওপর। এই যে একটা সমাজ, যার সমস্ত সুযোগ পাওয়ার জায়গাগুলো আমাদের ভদ্রলোকশ্রেণীর দখলদারীতে, সেখানে অন্য কেউ সেই মৌরসী পাট্টা ভেঙে স্কিল আদায় করবে কী ভাবে? তারপর অনেক ক্ষেত্রেই শিশু বয়সেই বাড়ীতে কাজে লাগতে হয়।

স্কিল শেখার সুযোগ তৈরীর আগেই তাকে নেমে পড়তে হয় কাজের জগতে, নিজে বা নিজের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার নিষ্ঠুর বাস্তবের দাবীতে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যত রকমের শোষণ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে নির্মমতম শোষণ চলে শিশু শ্রমিকদের ওপর। একটা দশবারো বছরের বাচ্ছা ছেলে বা মেয়ে, যার এখন হেসে খেলে আনন্দ করে কাটানোর কথা। স্কুলে যাওয়ার কথা, বিকেলে বল পিটোনোর কথা — তারা কতদূর অসহায়তায় পড়লে তবে একটা সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা পরিবেশে অন্য একটা লোকের বাড়ীতে স্নেহহীন, মায়াহীন, ছায়াহীন একটা জীবন কাটায়, দাঁতে দাঁত চেপে তার সর্বস্ব দিয়ে (এমন কি কখনও কখনও গায়ে গরম খুন্তীর ছ্যাঁকা বা ফুটন্ত জল ঢেলে দেওয়া সহ্য করেও) টিকে থাকার চেষ্টা করে তা সহজেই অনুমেয়।

মানুষ আসলে যেভাবে দেখে, যেভাবে শোনে, সেভাবেই শেখে, সেভাবেই বড় হয়, ভাবতে শেখে, বুঝতে শেখে। আমরা ছোটো বেলা থেকে এভাবেই দেখে আসছি, ফলে এভাবেই শিখছি। ভাবছি বাড়ীর কাজের লোক মানে অবজ্ঞার জিনিস। তাদের অধিকারের কথা বলা মানে উপহাসের পাত্র হওয়া। আমাদের ভাবনার যে 'কোজি.' তা এইভাবেই প্রোগ্রামড্ হয়ে গেছে, সেটা থেকে আমি আপনি কেউই আর বেরিয়ে আসতে পারছি না।

আমাদের সবারের মাথায় পেছনে দুটো জিনিস চালচিত্রর মতো ছেয়ে থাকে। এক সমাজ আর দুই অর্থনীতি। সমাজের কথাতো আগেই কিছুটা বলেছি, অর্থনীতির কথাটাও কিন্তু এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেই যে কার্ল মার্কস বলেছিলেন না শ্রমের যথায়ত মূল্য না দেওয়া থেকেই যাবতীয় মূলধনের সৃষ্টি, যাবতীয় শোষণের শুরু, এই কথাটা কিন্তু এখানেও প্রযোজ্য। আমি যদি আমার বাড়ীতে যিনি কাজ করেন, তাঁকে সঠিক মাইনে দিই, আমার উদ্বৃত্ত, আমার সঞ্চয় কিন্তু কমে যাবে। ফলে যে টাকার আমি ফুটানি করি, আঁতলামি করি, রাজনীতির বুলি কপচাই, সিনেমা থিয়েটার দেখি, ব্যাঙ্কে ব্যালেন্স বাড়াই, শেয়ার কিনি, সিগারেট খাই, সে টাকাও কিন্তু কমে যাবে। ফলে এই খরচাগুলো বাঁচিয়ে রাখতে হলে যেখানে বিনা আয়াসে খরচ কমানো যায়, অর্থাৎ লোকজনের মাইনে কম দিয়ে বেশী খাটিয়ে নেওয়া, সেটাই আমার করা দরকার। অর্থাৎ আমি আর একজন মুনাফাবাজ শিল্পপতির মধ্যে আসলে কিন্তু আদপে কোনো তফাৎই নেই। অথচ এই আমিই কিন্তু আবার আমার অফিসে বা কারখানায় নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন করছি। মনে করছি যে আমার যা যোগ্যতা তার চেয়ে আমায় কম বেতন দিয়ে ঠকানো হচ্ছে। অর্থাৎ একই লোক এক জায়গায় শোষিত আর অন্য জায়গায় শোষণকারীর ভূমিকা পালন করছে।

মার্কসের কথা এল বলে মার্কসবাদীদের কথাও মনে পড়ল। একটা জিনিস খুব দুঃখের সংগে দেখেছি যে বহু মার্কসবাদীর বাড়ীতেই কিন্তু কাজের লোক আছে এবং সেখানে তাদের ভূমিকাও কিন্তু শোষণকারীর থেকে আলাদা কিছু নয়। আমি মার্কসবাদী নই, জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর মার্কস দিতে পারেন তাও বিশ্বাস করি না। কিন্তু একথা দ্বিধাহীন

ভাবে মানি যে মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে কমিউনিস্টদের উজ্জ্বল ঐতিহ্য আছে। কিন্তু তাঁরাও কিন্তু এখানে চুপ। তবে কি যখন একটা আদর্শ, ব্যক্তিগত আচরণের পর্যায় চলে আসে তখন কোথাও আমরা হেরে যাই, নিজেকে টপকে যেতে পারি না? সামাজিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হই?

অবিশ্বাসের দেওয়ালটাকে টপকে যেখানে কিন্তু সম্পর্কটা ভালোবাসায় পৌঁছেছে সেখানে কিন্তু আমরা অন্য রকম ছবি দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' থেকে আজকের বহু পরিবারে আমরা দেখেছি যে একজন আর একজনের পাশে মানুষী ছোঁওয়া নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। একদিকে যেমন সন্দেহ আর অবিশ্বাস (জিনিস হারালেই বাড়ীর কাজের লোক চোর), নৃশংস অত্যাচার (ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলোকে মারধোর থেকে গায়ে গরম খুন্তির ছ্যাঁকা) তেমন অন্যদিকে বাড়ীর তরুণী গৃহবধূর (যে একইভাবে কর্মরতা ও লড়াই করছে) জন্মদিনে কাজের মাসী নিজের সামান্য মাইনে বাঁচিয়ে জিনিস কিনে আনছে, এমন উদাহরণও কিন্তু আছে। অর্থাৎ যেখানে দৃষ্টিভঙ্গীটা পাল্টাছে, যেখানে ঝি চাকরের জায়গায় লোকটাকে মানুষ ভাবছি, সেখানেই কিন্তু সম্পর্কটারও উত্তরণ ঘটছে।

❀❀❀

এই অজস্র হতাশার মধ্য থেকেও এই লেখাটা আমি শেষ করতে চাইছি কিন্তু হতাশার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে।

এই লেখাটা যিনি পড়ছেন আমি ধরে নিতে পারি যে তিনি একজন সচেতন মানুষ। আসুন না অমরা সবাই মিলে কিছু চেষ্টা করি।

এক: বাড়ীতে কাজের লোক যথাসম্ভব না রাখতে বা কম রাখতে চেষ্টা করব। রাখলেও তাঁকে ন্যূনতম, ভদ্র বেতন দেব।

দুই: শিশুশ্রমিক কখনও কোনো অবস্থাতেই রাখব না।

তিন: সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন ছুটি দেব। চেষ্টা করব ক্যালেন্ডারে লাল কালির দাগগুলোয় ছুটি দিতে।

চার: সবচেয়ে বড় কথা ভদ্র ব্যবহার করব। মনে রাখব ইনিও আমাদের মতো একজন মানুষ যাঁর আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, পরিবার আছে। এমন কিছু বলব না বা করব না যাতে এঁদের অসম্মান হয়।

আসলে কোথাও একটা শুরু করা দরকার। এই যে এতক্ষণ এত জ্ঞানের জ্ঞানের কথা লিখলাম এগুলো আসলে নিজেকেও শোনানো। কেন না স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে আমি ও আসলে আমরা, আমিও পারিনি এগুলো করতে। আমাদের যা দোষ ত্রুটি আমার মধ্যেও তা ষোল আনার জায়গায় আঠেরো আনা বিদ্যমান। কিন্তু পারিনি বলেই কি পারা সম্ভব নয়? চলুন না সবাই মিলে বেঁচে থাকাটাকে একটু সুন্দর করি।

[সম্পাদকীয় মন্তব্য — অনিন্দ্য রুদ্রর 'ছিছি, এ সব নিয়ে কেউ লেখে নাকি' নিবন্ধটি হুবহু প্রকাশ করাটা ছিলো আমাদের একান্ত নীতিগত ব্যাপার। সেটা সযত্নে ও সাদরে করেছি। কিন্তু গুরুতর কিছু তথ্যগত ত্রুটি ও অনুপস্থিতি উল্লেখ করতে চাই।

সর্ব প্রথমেই জানাই, লেখকের উল্লেখিত Minimum Wage Act 1872 নামে একটা আইনের তথ্যটি সর্বৈব ভুল। মূল আইনটি হলো The Minimum Wages Act, 1948, এটি 15ই মার্চ 1948 সালে আইনবদ্ধ ও কার্যকরী হয়। আর The Minimum Wages (Central) Rules, 1950 আইনটির প্রয়োগবিধি কার্যকরী করে 1950 সালে। উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রয়োগবিধিতে 24(1) ধারায় প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 9 ঘন্টা ও শিশুদের জন্য সাড়ে চার ঘন্টা কাজের সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ শিশুশ্রম ভারতে আইনসিদ্ধ।

শুধু তাই নয়। ওই ধারার উপধারায় বলা আছে, নাবালক বা কিশোর (adolescent) ডাক্তারের অনুমতিতে প্রাপ্তবয়স্কদের সমান সময় কাজ করতে পারবে!

লেখকের তথ্য 'রাজস্থান, যেখানে প্রথম এদের ন্যূনতম মজুরীর আইন আসে, সেখানে বেতন 5600 টাকা মাসে', ভুল। সরকারী সূত্র (Report On The Working Of The Minimum Wages Act, 1948 For The Year 2008) অনুযায়ী (পৃষ্ঠা 23, Table–2: Employments in which the Minimum Wages were fixed for the first time during the Year 2008) অনুযায়ী রাজস্থান 'গৃহ শ্রমিক' বা 'কাজের লোক'-এর বেতন দিনে 81 টাকা বরাদ্দ করে, অর্থাৎ মাসে 2500 টাকারও কম।]

অনুবাদ

সংবাদপত্রে বাবা রাম দেবের বিজ্ঞাপন বিশুদ্ধ বিজ্ঞান তত্ত্বের বিরুদ্ধে যায়

পুষ্প এম ভার্গভ

[14-5-2016]

বাংলা অনুবাদ — লতিকা গুহ

[সম্পাদকীয় ভূমিকা: মূল নিবন্ধটি Baba Ramdev's Newspaper Ads Go Against the Grain of Sound Science শিরোনামে The Wire ইন্টার্নেটে প্রকাশিত। বাংলা অনুবাদে এখানে নিবন্ধের প্রথমের কিছুটা অংশ বাদ দেয়া হয়েছে।]

বেসরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলি ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠার সাথে সাথে রাষ্ট্র পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি প্রদত্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার মান ও বিস্তারের অবনমনে স্বাস্থ্য হয়ে উঠেছে অসত্য বিজ্ঞাপনের বলি।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, প্রায়ই, বিজ্ঞাপনে এত উদ্ভট দাবি করা হয় যার ফলে একই সঙ্গে করা সঙ্গত দাবিগুলিও জোলো হয়ে যায়। আমি এ রকম একটা সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপন নিয়ে কথা বলবো। বিজ্ঞাপনটিতে বাবা রামদেবের ছবি আছে অন্য এক ব্যক্তির ছবিসহ। পতঞ্জলি যোগপিঠ এবং দিব্য ফার্মেসি — এই দুটি সংগঠনের নাম আছে বিজ্ঞাপনটিতে। এই দুটি সংগঠনই রামদেবের বলে পরিচিত যদিও দুটির কোনটিই বিজ্ঞাপনটা দিয়েছে বলে মনে হয় না। বস্তুতপক্ষে, অধিকতর সম্ভব বলে মনে হয় যে বাবা রামদেব নিজে বিজ্ঞাপনটি ঢুকিয়েছেন বা তাঁর নির্দেশে ঢোকানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপনটির কিছু বক্তব্য বিবেচনা করা যাক।

বিজ্ঞাপনটি বলছে, "25 বছর ধরে গভীর গবেষণার পর, এবং এক কোটি মানুষের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে, আমাদের আয়ুর্বেদ মিশন দেশের জনগণকে সফলতার সঙ্গে একটা সুস্থ জীবনযাত্রা এনে দেবেই।" যদি গভীর গবেষণা চালিয়ে যাওয়া হয়েছে 25 বছর ধরে, তা হলে এটা অবশ্যই কোন প্রতিষ্ঠানে গবেষক বিজ্ঞানীদের দ্বারা করানো হয়েছে এবং গণ পরিসরে এর ফলাফলগুলি রাখা হয়েছে — যেমন উদাহরণ স্বরূপ, সম্মানিত সাময়িকীগুলিতে সেগুলি প্রকাশ করেছে যেটা বিশ্বব্যাপী চলতি নিয়ম। এ রকম কোন প্রকাশনার কথা বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়নি অথবা আছে বলে জানা নেই। এ রকম কোন প্রকাশনার অনুপস্থিতিতে যে কেউ সঙ্গ তভাবেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন কারা এই বিজ্ঞানীরা এবং কিই বা এঁদের যোগ্যতা? প্রতিষ্ঠানের নাম কী ও এলাকাটা কোথায়? কী গবেষণা প্রদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিলো? এমন কি যদি একজন ব্যক্তির সমস্ত পরীক্ষার ফল একটি পৃষ্ঠাতে আপনি পেয়ে থাকেন, তা হলে এক কোটি ব্যক্তির জন্য আপনার দরকার হবে নথিভুক্ত তথ্যের এক কোটি পৃষ্ঠাতে; 300 পৃষ্ঠা প্রতিটি ভল্যুমে, তথ্যের ভল্যুমের সংখ্যা হবে ত্রিশ হাজারেরও বেশ ওপরে। সেগুলি কোথায়? রামদেব কি এ সব প্রশ্নের জবাব দেবেন? বস্তুত, অন্ততপক্ষে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞাপনটাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য তাতে থাকা উচিৎ ছিলো না? বিশেষত যে দাবিটা করা হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে যখন সেটা সঠিক হওয়া অত্যধিক সম্ভাবনাহীন। এটাই সব নয়। বিজ্ঞাপনটি বলছে, "বহুমূত্র (Diabetes) ও বহুমূত্রজনিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াতে দিব্য মধুমাসিনি খুব উপকারী। এটা অগ্ন্যাশয় (Pancreas)-কে শক্তি দেয় এবং বহুমূত্রকে স্বাভাবিকভাবেই নিয়ন্ত্রন করে।" যিনিই এটা লিখে থাকুন তিনি বহুমূত্রের কারণের প্রক্রিয়াটা সম্বন্ধে অল্পই জানেন! এবং আপনি কী ভাবে অগ্ন্যাশয়কে "শক্তি" দেবেন?

পতঞ্জলি যোগপীঠের কার্যাবলি হিসেবে যা বলা হয়েছে

তা আরও বেশি মজার। বিজ্ঞাপন অনুযায়ী 10,000, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও চিকিৎসা কেন্দ্র আছে যেগুলি "স্বামীজির ও আচার্যজির দৈব দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে চালিত"। কে এই স্বামীজি এবং আচার্যজি যাঁদের নাম বলা যাবে না? তাঁরা যেইই হোন তাঁদের সম্বন্ধে - "দৈব"টা কি সেটা বিজ্ঞাপন কিছু বলে না। এবং কোথায় এই 10,000 হাজার স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা কেন্দ্র অবস্থিত?

"গবেষণা ও প্রকাশনা" শিরোনামে এটা বলা হয়েছে, "যোগ, আয়ুর্বেদ ও ভেষজের ওপর অহোরাত্র গবেষণা করেন 200 সুপন্ডিত বিজ্ঞানী। একটা চমৎকার গ্রন্থতালিকা প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে।" কোথায় এই গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত এবং এই "200 সুপন্ডিত বিজ্ঞানীদের" যোগ্যতাগুলি কী? ভারতে ব্যবহার করা হয় এমন ওষধির ওপর নানা গ্রন্থপঞ্জী ইতিমধ্যেই বর্তমান। দ্য কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ (CSIR) একটা প্রকাশ করেছিলো অনেক বছর আগে। ডক্টর দর্শন শঙ্করের নেতৃত্বে দ্য ফাউন্ডেশন ফর রিভাইটালাইজেশন অব লোকাল হেলথ ট্র্যাডিশনস্ ইন বেঙ্গালুরু (The Foundation for Revitalization of Local Health Traditions in Bangalore) এ রকম ওষধির একটা তালিকা তৈরি করেছে কমপিউটারে। কী ধরণের "সুপন্ডিত" বিজ্ঞানী তাঁরা যাঁরা ওয়াকিবহাল নন যে দেশে ইতিমধ্যেই তাঁদেরই আগ্রহের এলাকায় কী করা হয়েছে?

সব শেষে "ঔষধবিজ্ঞান ও রোগ সংক্রান্ত পরীক্ষা" শিরোনামে এই বক্তব্যটি রাখা হয়েছে: "আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানে ঔষধ তৈরির একটি নির্দ্ধারিত প্রক্রিয়া আছে। তাঁরা ইঁদুর ও খরগোসে (রক্তচাপ), ক্যান্সার, বহুমূত্রের মত রোগের ভাইরাস সূচি-প্রয়োগ (inject) করে ঢুকিয়ে দেয় এবং তারপর তাঁদের উদ্ভাবিত ওষুধ দিয়ে সেগুলির চিকিৎসা করেন। তাঁরা পরিমান ও ফলাফল পরীক্ষা করে মানুষের ওপর প্রয়োগ করেন।" যতটা হতে পারে ততটাই বৈজ্ঞানিকভাবে অসঙ্গত তাঁদের পুরো বক্তব্যটাই কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে এই ধারণাটা যে রক্তচাপ ও বহুমূত্র ভাইরাস দ্বারা ঘটিত! বাবা রামদেবের পতঞ্জলি যোগপিঠের যে "200 সুপন্ডিত বিজ্ঞানী" আছেন তাঁদের জ্ঞানের বহর কি এটাই?

শারীরচিকিৎসার (Physiotherapy) শক্তিশালী ও কার্যকরী উপায় হিসাবে যোগকে জনপ্রিয় করার জন্য আমি অবশ্যই রামদেবকে কৃতিত্ব দেবো কিন্তু এ রকম সব বিজ্ঞাপন দিয়ে তিনি নিজের ও অনুসারীদের উভয়ের ক্ষতি করছেন।

সাম্প্রতিক প্রযুক্তির আলপথ ধরে

সত্যবান রায়

আকাশভরা সূর্যতারা ছিল সেই কবে থেকেই, সম্ভবত 1200 কোটি বর্ষ আগে সর্বধারক এই মহাবিশ্বের জন্মলগ্ন থেকে। সেই দুরন্ত উত্তপ্ত যে মহাবিস্ফোরণ বিগ ব্যাং-এর মুহূর্ত থেকেই। আকাশভরা সূর্যতারা আজও আছে। প্রশ্ন জাগে — আজও কি সেভাবে বিস্ময়ে জাগে আমার প্রাণ? যে বিস্ময় আমাকে এতকাল প্রাণিত করেছে আর্যভট্ট গ্যালিলেও নিউটন আইনস্টাইন-এর বিজ্ঞানযাত্রার পদচিহ্ন ধরে? কিংবা সেক্সপীয়র মিল্টন রবি ঠাকুরের হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া কাব্যের সিগনেচার খুঁজে? পাশাপাশি কি বিস্ময়ের প্রতিদ্বন্দী হয়ে উঠছে অমিতসম্ভবা প্রযুক্তি?

আন্তর্জাল-উত্তর যে প্রযুক্তির সর্বত্রগামিতা, তার আগেও তো প্রযুক্তি ছিল। সভ্যতার বিকাশ তো তার ভালমন্দ নিয়ে প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সমান্তরাল। গুহামানবের পাথরে পাথর ঠুকে আগুন জ্বালানো সেও তো প্রযুক্তি। চাকার আবিষ্কার, সেও প্রযুক্তি। শিল্পবিপ্লবের হাত ধরে আসা স্টিম এঞ্জিন, টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ সবই প্রযুক্তির এক একটি মাইলফলক। কিন্তু সেই প্রয়োগ প্রকৌশলের সঙ্গে মানবিক চিন্তাভাবনা ও যাপনের একটা সাযুজ্য ছিল। সন তারিখ বলা না গেলেও, মোটামুটি এই সাযুজ্য বজায় ছিল গত শতাব্দীর সাতের দশক বা বড়জোড় মধ্য-আটের দশক অবধি। অতঃপর স্পিডোমিটারের কাঁটা ঘুরেছে অবিশ্বাস্য গতিতে। পার্সোনাল কম্পিউটার এদেশে এসেছে আটের দশকের

একেবারে শেষে। তারপর নয়ের দশক। নতুন সহস্রাব্দ। ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, স্কাইপি, স্মার্টফোন, হোয়াটসঅ্যাপ, টুজি-থ্রিজি-ফোরজি সেইসঙ্গে আকাশ-বেচে-খাওয়ার স্ক্যাম-সহ কত কিছু, ব্যপ্ত বলিষ্ঠ অশ্বখুরে ধুলো উড়িয়ে। 'যেন নয়নে লাগিল আঁধি'। এক পর্বে অভ্যস্ত হওয়ার আগেই দরজায় ঘা পড়ছে পরের পর্বের। পেশায় যাপনে সংস্কৃতিতে উপলব্ধ হওয়ার আগেই কালকের পর্ব আজ আউটডেটেড। পর্ব থেকে পর্বান্তর যেন একটি পলক।

সাধারণভাবে প্রযুক্তির কোন ফ্ল্যাগশিপ ব্র্যান্ড বা পর্বকে আত্মসাৎ করে সংস্কৃতি ও শিক্ষার চর্চা ও চর্যায় তার মিশে যাওয়ার প্রকরণে অনেকটা সময় লাগে। হতে পারে তা পঞ্চাশ বা একশ' বছর। বা তারও অধিক। এই সময় পরিসরেই নব্য প্রযুক্তির সঙ্গে আমাদের জীবন ও যাপনের ইচ্ছায়-ইচ্ছানিরপেক্ষতায় মানিয়ে নেওয়ার একটা অবকাশ তৈরি হয়। যেমন হয়েছে শিল্পবিপ্লবের কালখন্ডে। যেমন সন-তারিখ ধরে ঘটনাক্রম—

1760-1820	:	শিল্পবিপ্লবের কালপরিসর
1781	:	জেমস ওয়াটের স্টিম এঞ্জিন
1803	:	প্রথম রেলওয়ে লোকোমোটিভ (বিশ্বে)
1853	:	প্রথম রেলওয়ে লোকোমোটিভ (ভারতবর্ষে - মুম্বই থেকে)
1863	:	প্রথম রেলওয়ে লোকোমোটিভ (বাংলায়: হাওড়া - বারাণসী)

যেটা বলতে চাইছি — আড়াইশ বছর আগে ইওরোপে শিল্পবিপ্লবের প্রধানতম আইকন যে স্টিম এঞ্জিন, তার আবিষ্কারের পরে প্রথম রেল বিশ্বে আসতে সময় লেগেছে 22 বা 23 বছর। ভারতবর্ষে আসতে আরও 50 বছর, বঙ্গদেশে আরও 10 বছর পরে। অর্থাৎ একটি যুগান্তসূচক আবিষ্কারের পরে বঙ্গে তার প্রয়োগ ঘটতে 80 বছর কেটে গেল। এবারে দেখা যাক সাহিত্যে তার প্রভাব। সেই রেলগাড়ির প্রথম দর্শনে নিশ্চিন্দিপুরের বালক অপু বিস্ময়াভিভূত। বিভূতিবাবু 'পথের পাঁচালি' লেখেন 1924-এ। 1781 থেকে 1924, প্রযুক্তির অভিনব আবিষ্কার সাহিত্যে প্রতিফলিত হতে সময় লেগে গেল দেড়শটি বছর। আমি অবশ্য জানি না বিভূতিভূষণের আগে আর কারও সাহিত্যে রেলগাড়ির উল্লেখ থাকলেও তা এ রকম সক্রিয় চরিত্রপ্রতিম রূপে এসেছে কি না। যদি অটোমোবাইলের কথা ধরি, তার বিকাশকাল মোটামুটি 1769 থেকে 1893 পর্যন্ত যখন চালিকাশক্তি হিসেবে স্টিম, বিদ্যুৎ থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত গ্যাসোলিন চালিত টু-স্ট্রোক গাড়ি। ভারতবর্ষের রাস্তায় প্রথম মোটর গাড়ি আসে 1897 সালে। আর গল্পে — সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক' - যেখানে লজঝড়ে অস্টিন গাড়িটিই নির্বাক নায়ক, সম্ভবত গত শতকের চারের দশকে লেখা। ঋত্বিক ঘটক ছবি বানালেন 1958য় এসে, এখানেও তো কেটে গেল কতগুলো দশক এমনকি ভারতে অটোমাবাইলের প্রথম যাত্রার দিন থেকেও। আবিষ্কারের কথা তো আরও কতকাল আগের।

1760 নাগাদ শুরু শিল্পবিপ্লব ব্যাপারটা কী বুঝে উঠতেই খোদ ইংল্যান্ডে লেগে গেল 50টি বছর। এই 'শিল্পবিপ্লব' শব্দটিই প্রথম পাওয়া গেল 1800 সালের আগে নয়। শেলি, কিটস, বায়রন, ওয়ার্ডসোয়ার্থ, কোলরিজের রোম্যান্টিক রেভল্যুশনের কাব্যদ্যুতি শিল্পবিপ্লবের বিরুদ্ধেই ধ্বনিত হয়েছিল, কিন্তু তাও প্রায় অর্ধশতক সময় লেগেছিল। অথচ এই সময়ের তথ্যপ্রযুক্তির একটি পর্যায়ের লাভ-লোকসান বা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞান অনুধাবনের আগেই দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে পরের সোপান। ঘরেতে ভ্রমর আসছে গুনগুনিয়ে নয়, হুড়মুড়িয়ে।

বর্তমান চিন্তাধারা ও প্রযুক্তি স্রোতের এই বিপুল অসম গতির জন্যই সম্ভবত প্রযুক্তির দর্শন তুলনামূলকভাবে নতুন বিষয়। পাশ্চাত্যে আধুনিক দর্শনের ইতিহাসে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতক এবং রেনেসার দার্শনিকবৃন্দকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দর্শনের চিরায়ত শাখাগুলির চর্চা হয়ে আসছে দুহাজার বা বাইশশ' বছর ধরে, কিন্তু বিজ্ঞানের দর্শন অধীত হয়ে আসছে সবেমাত্র রেনেসাঁর কালখন্ড থেকে। প্রযুক্তির দর্শন এখনও শৈশবে। প্রযুক্তির বিকাশের দ্রুতগামিতাকে ছুঁতে পারছে না দর্শন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে কিছু স্বনামসিদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানী এবং দার্শনিকের প্রকাশনায় মূলত আলোকিত হয়েছে বিজ্ঞানের দর্শন, প্রযুক্তির দর্শন নয়। অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে কিছু স্কলার দর্শনের পরিসরে প্রযুক্তি-প্রসঙ্গ এনেছেন তাঁদের অনন্য মেধাবীয়ানায় - যেমন 1600 সন নাগাদ বেকন অথবা ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে কার্ল মার্ক্স। ব্যস, এই পর্যন্ত। দর্শনের অঙ্গনে যে বিপুল পরিসর বিজ্ঞান পেয়েছে তার কণাও পায়নি প্রযুক্তি। এছাড়া প্রযুক্তি সম্পর্কিত

ধ্যানধারণার নির্যাস ছিল সীমাবদ্ধ ও সরলীকৃত। যেমন, প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সরল প্রয়োগ। দ্বিতীয়ত, সেই প্রয়োগ মানবহিতকারী। তখনও প্রযুক্তিকে ঘিরে সন্দেহের দিন আসেনি। ক্লান্তিকর অমানবিক দৈহিক শ্রমের বিকল্প বর্ণমালাই ছিল তাকে দেখার দৃষ্টিকোণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর রোম্যান্টিক ঐতিহ্য অবশ্য সেই শতাব্দীর শেষ থেকেই কিছুটা নৈরাশ্যবাদী ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উভয় সম্বন্ধেই - বিশেষত জার্মানীতে। সামগ্রিক সমাজের চালচিত্রে প্রযুক্তির মূল্যায়ন কিছুটা শুরু হয়েছে তখন। তবু সমগ্রতার প্রশ্নে দেখতে গেলে ইংরাজী-ভাষী দেশসমূহে ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রমুখ রোম্যান্টিক কবি এবং মধ্য-উনবিংশ শতাব্দীর কার্লাইল, ম্যাথু আর্নল্ড-এর মতো কিছু সমালোচক অথবা সমাজবাদী শিল্পী উইলিয়াম মরিস ব্যতিরেকে আধুনিক প্রযুক্তির বিপ্রতীপ ভাষ্য সেভাবে দানা বাঁধেনি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে হিরোশিমার ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মানবমনের উপলব্ধিতে প্রথম রেখাপাত করল পরমাণুর ক্ষমতা কী ব্যাপক হতে পারে যা আক্ষরিকভাবে এই গ্রহের মানবসভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করার ক্ষমতা রাখে। তখনই ব্যাপকতর অর্থে শুরু হল প্রযুক্তির ব্যবচ্ছেদ ও মূল্যায়ণ। ব্যাপকতর জন-অবগতির প্রাঙ্গনে এল শিল্পে দূষণ, পরিবেশের ক্ষয় ইত্যাদি বাগধারা। জেনেটিক এঞ্জিনীয়ারিং-এর অগ্রগতির সঙ্গে সাতের দশকের শেষে মানব-ক্লোনিং চর্চায় বোঝা গেল খোদার (প্রকৃতির) ওপর খোদগিরির সম্ভাবনা - মানব বংশানুক্রম মানবপ্রকৃতিকেও প্রযুক্তিগতভাবে ম্যানিপুলেট করতে পাবার সম্ভাবনা। এইক্ষণেই ইওরোপে স্থাপিত হল দ্য সোসাইটি ফর দ্য ফিলজফি অব টেকনোলজি - বিজ্ঞানার্জিত জ্ঞানের নিরীক্ষার শুরুর তিন শতক পরে এবং বিজ্ঞানের দর্শনের সিরিয়াস চর্চা শুরুর এক শতক পরে।

তাই প্রযুক্তির দর্শন যে সময়ের বিস্তারের স্কেলে নবজাতক - শুধু তাই নয়, এর ক্ষেত্র ও পরিসর এখনও যথেষ্ট সংহত হওয়ার অপেক্ষায়, প্রযুক্তির দর্শন বিকাশের মুখ্য চ্যালেঞ্জ এটাই যে এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীকতায় জড়িত রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত শাখার সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া - যেমন বিজ্ঞানের দর্শন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দর্শন, এথিকস, নন্দনতত্ব, সর্বোপরি ধর্মের দর্শন। এতগুলি পরিসরের অনুধাবন ও সমন্বয় বড় সহজ কাজ নয়। প্রযুক্তির দর্শনের স্বনামখ্যাত ব্যক্তিত্ব ভ্যাকিউস ইলুল-এর মতে যেহেতু কোন ব্যক্তিত্বই এতগুলি সম্পর্কিত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হতে পারেন না তাই প্রযুক্তি প্রবাহকে দিকনির্দেশ বা দিক পরিবর্তনের ক্ষমতাও রাখেন না। প্রযুক্তি এগিয়ে চলেছে অশ্বক্ষুরে ধুলো উড়িয়ে অথচ তার সমান্তরাল যাত্রাপথে দর্শন নেই, একে শুধু তাত্ত্বিক অসঙ্গতি হিসেবে দেখা যায় কি? না কি এ এক বিপন্নতার সংকেত।

এই মুহূর্তে সমাজ ও সংস্কৃতির উপর প্রযুক্তির প্রভাবের প্রশ্নে দুটি দার্শনিক তত্ব উঠে আসে। প্রথমটি প্রাযুক্তিক নিয়তিবাদ (Technological Determinism) - যার সোজাসাপ্টা অর্থ প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের জন্য মূলত দায়ী। আর দ্বিতীয়টি, স্বশাসিত প্রযুক্তি (Autonomous Technology) যার নিগলিতার্থ প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে তার নিজস্ব লজিকে যেখানে মানবিক নিয়ন্ত্রণের কোন জায়গা নেই।

এদিকে অ্যাপস আর গ্যাজেটে ঢেকে উঠছে জীবন। বিগত পনেরো-বিশ বছর ধরে ইন্টারনেট আমাদের যাপনের অন্ধি-সন্ধিতে অনেকটাই অনুপ্রবেশ করেছে, বদলে দিয়েছে, দিচ্ছে আমাদের অনেক পুরানো অভ্যাস। হাতে লেখা পোস্টকার্ডকে নাগরিক জীবন প্রায় ছেড়েই এসেছে পুরানো জলসাঘরের মতো। টেলিগ্রামতো কবেই সরকারিভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। ইমেল এসএমএস হোয়াটসঅ্যাপে রাতভোর। ডিজিট্যাল ইন্ডিয়ার হ্যামলিনের বাঁশিতে নুতনতর মাত্রা পেতে চলেছে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড। ঘরে বসেও অনলাইন কেনাকাটায় পারঙ্গম হয়ে উঠছি নিরন্তর। অবশ্য এই ডিজিটাল প্রশ্নেও আমাদের বিভাজন লক্ষ্য করার মতো, যে বিভাজনের গ্র্যান্ড ন্যারেটিভে আছে ভারত বনাম ইন্ডিয়া।

এই সন্দর্ভের সাধারণ বিষয়াবলীর প্রেক্ষিতে একটু বিশেষ দৃষ্টি যদি রাখি দেশের দিকে। রাষ্ট্রীয় স্তরে স্বাধীনতা উত্তর সময়ে রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে বিশেষত প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি স্তরের কথা যদি ধরি তবে প্রযুক্তি পেশা থেকে উঠে আসা একটি মানুষের কথা বলতেই হয় - ড. এপিজে কালাম। তাঁর মৃত্যুর বছর দুয়েক আগের একখানা নাতিদীর্ঘ ভাষণের টেক্সট (Dreams and Vision) এই মুহূর্তে আমার সামনে রয়েছে। সময়কাল এপ্রিল 2013। এখানে প্রাথমিক স্বীকার্য হচ্ছে - বিশ্ব এখন পথ হাঁটছে শিল্প যুগ থেকে তথ্য ও নলেজ যুগের পথে। ভারতবর্ষেও লক্ষ্যণীয়ভাবে জিডিপি-তে শতকরা হারের হিসেবে দেখা যাচ্ছে কৃষি আয় কমেছে, বৃদ্ধি হয়েছে

ম্যানুফ্যাকচারিং ও পরিষেবা ক্ষেত্রে। তথ্য-প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে পরিষেবার মধ্যেই ধরা হয়েছে। এই হ্রাস-বৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটেছে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মানবসম্পদের সংখ্যাতেও। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আশাবাদী ছিলেন যে ভারতের আর্থিক বিকাশে এই ঘটনা সহায়ক হবে, সেই সঙ্গে কৃষি ও শিল্প-উৎপাদনের ভিত্তিকেও মজবুত করবে ইনোভেশন ও মূল্য-সংযোজনের মাধ্যমে। এই ইনোভেশন আসবে জ্ঞান-নিবিড় (knowledge intensive) পণ্যের মাধ্যমে। ছাত্রদের প্রতি অভিভাষণে তাঁর বক্তব্য ছিল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ইতিমধ্যেই সংযোগ হয়েছে, আই-টি এখন তাই আই-সি-টি। আবার বায়ো-টেকনোলজির সঙ্গে আই-টির সংযোগে এসেছে বায়ো-ইনফর্মেটিক্স। দরজায় ঘা দিচ্ছে ন্যানো-প্রযুক্তি। তাঁর প্রত্যাশ্য—

When Nano technology and ICT meet, integrated silicon electronics, photonics are born and it can be said that material convergence will happen. With material convergence and biotechnology linked, a new science called Intelligent Bioscience will be born which would lead to a disease free, happy and more intelligent human habitat with longevity and high human capabilities. Convergence of bio-nano-info technologies can lead to the development of nano robots. Nano robots when they are injected into a patient, my expert friends say, it will diagnose and deliver the treatment exclusively in the affected area and then the nano-robot gets digested as it is a DNA based product.

কিছুটা পরিভাষাগত কারণে কিছুটা লেখায় গতি রাখার স্বার্থে অনুবাদে না গিয়ে প্রযুক্তির অভিসরণ (Convergence) নিয়ে তাঁর ভাষ্যের প্রত্যাশা-সূচক কিছু অংশ হুবহু উদ্ধৃত করলাম বিনা মন্তব্যে। শোনা গেছে 2019 সালের মধ্যে পার্সোনাল কম্পিউটারের গণন-ক্ষমতা মানব-মস্তিষ্কের ক্ষমতার 1000 গুণ হবে। একদিন তবে মানুষের চিন্তনের সঙ্গে তারই সৃষ্ট মেশিনের বুদ্ধির অভিসরণ অনিবার্য। একথা মেনে নিয়েও কালাম সাহেবের কথায় ভেসে আসে আশা ও শঙ্কার টেক্সট। তাঁর মতে মানবমনের সৃজনশীলতা নিরন্তর সবচেয়ে শক্তিমান কম্পিউটারের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর হবে এবং এই সৃজনশীলতাই হবে আইবিএম ও অন্যান্য নলেজ কোম্পানীর ব্যবসা। আবার শঙ্কা - যে দিন মানব ও কম্পিউটারের মধ্যে কোন বিভাজন থাকবে না সেদিন মলিকিউলার বায়োলজিস্ট কী ভাবে মেশিনের ওপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে ধরে রাখতে সহায়ক হবে?

Computers are going to challenge us. The entire scientific community, not just the ICT and biotechnologists would have greater responsibility of keeping the mankind above the man-made computers, human creativity being the prime mover. Organizations like Infosys have to perform and grow in this dynamic and competitive environment

আইবিএম বা ইনফোসিসের শুভবোধের ওপর প্রত্যাশী ডঃ কালাম। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (AI) সাম্প্রতিক গবেষণা ও অগ্রগতির নিরিখে আজ হয়ত দেখা যাচ্ছে চালকহীন গাড়ির মতো বিস্ময়-পণ্য। কাল তবে আসবে কি দারিদ্র্য ও জরা থেকে মুক্তি। শাক্যবংশীয় রাজকুমারের আর বিষন্নতা ও গৃহত্যাগের প্রয়োজন হবে না। কালাম সাহেবের পাশে নিয়ে আসি স্টিফেন হকিং-কে। একদা ফিজিসিস্ট কূলে নব্য প্রযুক্তির ষোলআনা-পন্থী বলে যাকে শুনে এসেছি, যেখানে আইনস্টাইন, হাইজেনবার্গও প্রিয় পদার্থবিজ্ঞানের শুদ্ধতাকে কখনও বল্গাহীন প্রযুক্তির পাশে রাখতে পারেননি। একদা হকিংকে বলতে শোনা গিয়েছিল আমাদের হাতের সুপার কম্পিউটারের মনন উজ্জ্বলতম মেধাবী মননের চেয়েও শ্রেয়। সেই তিনি জীবনসন্ধ্যায় ভীত পীড়িত বোধ করলেন। বছর-দুই আগে বলেই ফেললেন পরিপূর্ণ স্বয়ংশাসিত কৃত্রিম বুদ্ধির অধিকারী সফটওয়্যার সত্তাটি তার বুদ্ধিদীপ্ত 'মন' নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করবে, তার নিজের চেয়েও উন্নততর চিন্তাবিদের জন্ম দেবে। সেই মনের পরিসর এখন অনুধাবন করা দুরূহ। সেই 'কৃত্রিম' যেদিন জন্মদাতা 'আসল'কে অতিক্রমণ করবে হকিং সাহেব সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সেদিন কে কাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। আসল নকলকে না নকল আসলকে? সেদিন ডারুইনীয় বিবর্তনের শ্লথতা রূপান্তরিত হবে বিশাল

উল্লম্ফনে। হকিং সাহেব একা নন। ঐ যে মস্ত প্রযুক্তির অন্ত্রেপ্রেনর ইলন মাস্ক - যার প্রবাদপ্রতিম কোম্পানি 'Space X' আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে মহাকাশযান ফিরি করে, তিনিও বললেন পরিপূর্ণ বিকশিত AI মানবসত্তার অস্তিত্বের শিকড় ধরে টান মানবে। শিল্পবিপ্লবের হাত ধরে যে প্রযুক্তির বিকাশ ও লালন ধনতন্ত্রের ক্রোড়ে তার প্রণোদনে অভ্রান্তভাবে সক্রিয় থেকেছে বিনিয়োগে সর্বোচ্চ ফেরতের অভীপ্সা ইকোলজির তোয়াক্কা না করেই এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমাজতন্ত্রও সেইভাবেই প্রণোদিত। আমরা ছা-পোষা ঈশ্বর পাটনির সন্তানেরা বুঝতে পারি না বিপণনতার মূলসূত্র কোথায় সুপ্ত রয়েছে আসল মানবের ডিএনএ/বায়োকেমিস্ট্রীতে না নকল বুদ্ধির পূর্ণ বিকশিত স্বয়ংশাসনে?

বিজ্ঞানমনস্কতা রেনেসাঁ ও মানবতাবাদ —এক অসমাপ্ত বিপ্লব

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বেদশাস্ত্রের বিনির্মাণ

সভ্যতার উষাকালে মানুষ যা কিছু চিন্তা করেছিলো তার অন্যতম দৃষ্টান্ত বেদ। তার চেয়ে প্রাচীন কোন গ্রন্থের এখনও পর্যন্ত কোন উল্লেখ জানা যায়নি। সে কালে বেদের সূক্ত বা কাব্যরূপ মুখে মুখে প্রচলিত ছিলো, কারণ লেখার প্রচলনই ঘটেছে বহুকাল পরে। সেজন্য বেদের আরেক নাম শ্রুতি। তখন নানা বিদ্যার মধ্যে নানা বিভাজন বা বিভাগের কোন চিহ্নই ছিলো না — যেমন, দর্শন বিজ্ঞান, ধর্ম, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি। মানবসমাজের জ্ঞানের পরিধি তখন ছিলো সীমিত ও অখন্ড।

ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখনী অনুসারে—"ঋগ্‌বেদকে কি চক্ষে দেখিব? বহু পূর্বে বাঙ্গালা 1284 সনে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'বেদ ও বেদব্যাখ্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মত প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ এ বিষয়ে যে আশ্চর্য্য সংস্কারমুক্ত মনোভাবের পরিচয় 86 বৎসর পূর্বে দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।"

এবার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রাসঙ্গিক অংশটি লক্ষ্য করা যাক—"কিন্তু বাস্তবিক বেদ কী জিনিস? ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন মহাকবি প্রণীত, কতগুলি কবিতা গান আদি সংগ্রহ মাত্র। আমরা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু ভরসা করি যাঁহারা কেবল সংস্কৃত ব্যবসায়ী অথচ বেদ পড়েন নাই, কেবল জানেন বেদ ব্রহ্মা প্রণীত তাঁহারা এই অংশটি পাঠ করিতে বিরত হইবেন।

প্যাল্‌গ্রেভিস ট্রেজরি অফ সঙস্ এন্ড লিরিকস (Palgraves Golden Treasury of Songs and Lyrical Poems) হইতে এই জিনিসের প্রভেদ নাই। পূর্বোক্ত ইংরেজি গ্রন্থও ভিন্ন ভিন্ন মহাকবি প্রণীত কবিতা ও গান সংগ্রহ মাত্র। অনেক ঋষি প্রণীত সূক্ত বেদে গ্রন্থিত আছে। যদি গোল্ডেন ট্রেজারির সহিত তুলনা করিতে কষ্ট বোধ হয়, স্কান্দিনেভিয় সাগা সংগ্রহের সঙ্গে ঠিক তুলনা হইবে।.....

কিন্তু সাগা সংগ্রহ হইতে বেদের আদরগত এত তারতম্য কেন? গীতা সংগ্রহ গীতেরই সংগ্রহ, তাহার ধর্মের উপর এত আধিপত্য কেন? আর শতাধিক পুরুষ ধরিয়া এই বেদের জন্য লোকের এত মাথা ব্যথা কেন?

প্রধান কারণ বেদের প্রাচীনত্ব। পৃথিবীর মধ্যে যত গ্রন্থ আছে, বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহার সন্দেহ নাই। ইয়োরোপীর সময়-তালিকাকারদিগের বিশ্বাস যে ভারতবর্ষীয় সময়-তালিকাকারগণকৃত সময়-নির্দেশ ভ্রমাত্মক, আমরা যাহাকে বহু বৎসরের পুরানো বলি তাঁহারা উহাকে 1500 বৎসরের বলিতে চান। আমরা বেদসংগ্রহকে 4977 বৎসরের পুরানো বলিতে চাই, উহারা বলেন, যীশু খৃস্টের পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে বেদসংগ্রহ হয়।

আর এক কথা এই যে, যেকালে বেদরচনা হয়, সেকালের

কথা জানিতে হইলে, আমাদের বেদ ভিন্ন আর উপায় নাই।.....মনে করুন 3000 বৎসর পরে ইংরেজদিগের সকল পুস্তক নষ্ট হইয়া গেল কেবল গোল্ডেন ট্রেজরি রহিল। তখন গোল্ডেন ট্রেজরিরও এইরূপ মান হইবার সম্ভাবনা, কারণ উহা ভিন্ন ইংরেজজাতির চিন্তাশক্তি, কবিত্বশক্তি, সমাজপ্রণালী ইত্যাদি জানিবার আর উপায় থাকিল না।"

বস্তুনিষ্ঠ হরপ্রসাদ

এর পরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আরো তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন:—

"ইতিহাস লেখক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্যবসায়ীগণ বেদের প্রাচীনত্ব ও বেদের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্যমাত্র দেখিবেন। কিন্তু যিনি কবি তিনি দেখিবেন বেদের তুল্য কাব্য জগতে আর নাই। বেদ হোমারের একখানি মহাকাব্য মতো নহে, কিন্তু বেদের এক একটি সূক্ত এক একখানি মহাকাব্য। মানবজাতির তখন শৈশবকাল, বাহ্যজগতে এখন তাহাদিগের যেরূপ অসীম আধিপত্য জন্মিয়াছে তখন সেরূপ কিছুই ছিল না। তখন অগ্নি বায়ু মেঘ বজ্র বিদ্যুৎ বাত্যা সকলেই দেবতা। অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নহে, অগ্নিই দেবতা। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সংস্কার জন্মিতে অনেক চিন্তার প্রয়োজন, শৈশবে সে চিন্তার ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিলো না। তাঁহারা জগতের যাবতীয় বস্তুকেই শিশুর চক্ষে দেখিতেন—সকলই উজ্জ্বল বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত দেখিতেন। কবির চক্ষে দেখিতেন। অথচ হোমারের ন্যায় বৃহৎ কাব্যগ্রহ রচনায় যে জ্ঞান যে পরিশ্রম, অন্তর্জগতের উপর যে আধিপত্য প্রয়োজন তাহা তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং তাঁহারা কেবল হৃদয়ের গভীর-ভাব ভয় ভক্তি স্নেহ আশঙ্কা আশা ভরসা ইত্যাদি মাত্র প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। কিন্তু সেই ভাবগুলি ব্যক্ত তাঁহারা কী রূপে করিয়াছেন! সে ভাব প্রকাশে চাতুরি নাই শ্রম নাই চিন্তা নাই।.....সেকালে তাঁহারা যাহাই দেখিতেন, তাহাই তাঁহাদের কাছে প্রকান্ড তাহাই সুন্দর ও তাহাই নূতন। আমরা আজি হিমালয় পর্বত দেখিয়া যে রূপ প্রকান্ড বলিয়া আনন্দিত হই, তাঁহারা সামান্য পর্বতমালা দেখিয়া তাহা অপেক্ষা শতগুণে আনন্দিত হইতেন।.....আমাদের এখন দেখানো চাই যে কতকগুলি গান ও কবিতা কিরূপে ধর্মগ্রন্থ হইল।.....যাঁহারা ঐ গান লিখিয়াছেন তাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা কোনো স্বর্গীয় দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন। তাঁহাদের সমসাময়িক লোকেরও বিশ্বাস যে লেখকেরা ঈশ্বর-প্রেরিত বা ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ। তুমি কবি আমি অকবি দুইজনেই একত্র থাকি একত্র বাস করি। তুমি কল্পনা বলে জগৎ সংসার কত সুন্দর দেখ আমি অকবি মাটিকে মাটিই দেখি। আকাশকে আকাশই দেখি। তোমায় আমায় এই প্রভেদ আমরা জানি যে আমাদের দুইজনের মানসিক প্রকৃতির বিভিন্নতা মাত্র।" শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধের উদ্বৃতি দীর্ঘ হয়ে গেল।

বিশিষ্ট মার্কসবাদী তাত্ত্বিক জর্জ টমসন এ বিষয়ে বলেন—"প্রাক্ শ্রেণীসমাজে ও প্রাথমিক শ্রেণীসমাজে, কবিকে সার্বজনীনভাবে জ্যোতিষী বা পুরোহিতের প্রতি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত। কবির আশীর্বাদ এবং অভিশাপের মৃতের জগতের সাথে অন্তরঙ্গতা আছে মনে করে বিশেষ শক্তিশালী ধরা হত। সে যখন পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই দর্শকদের সামনেই কবিতা রচনা করত—তার সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়াই বাক্য তার মুখে জুগিয়ে যাওয়া দেখে মনে করা হত ওগুলি ওর নয়, দেবতা বা প্রেতের বাক্যগুলি ওর মুখ দিয়ে বের হচ্ছে। এক কথায় কবিকে বলা হত দশায় পাওয়া।" (*The Human Essence*—George Jhomson)

মন্ত্রস্রষ্টা থেকে মন্ত্রদ্রষ্টা

বেদের প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সমধর্মী বক্তব্য—"এই যে মনের চঞ্চলতা ইহাকেই সাহেবেরা inspiration বলেন। পরে কবির নাম লোপ হইতে লাগিল, কবি যে দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন সেই দেবতাই বেদরচক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। দেবতাই রচক, কবি দেখিলেন মাত্র। এই জন্য মাধবাচার্য লিখিলেন, যিনি মন্ত্র দেখিলেন তিনিই ঋষি। ঋষ ধাতুর অর্থ দর্শন। এই জন্যই কালিদাসের "মন্ত্রকৃতাং" লেখা দেখিয়া ভবভূতি যেন চটিয়াই লিখিলেন মন্ত্রকৃতাং নহে, মন্ত্রদৃশাং। ঋষিরা মন্ত্র করেন নাই, দেখিয়াছেন মাত্র। বেদের রচক দেবতা হইলেন, শেষ যখন দেবতা ঘুচিয়া একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রধান মত দাঁড়াইল, দেবতার বেদপ্রণেতৃত্ব ঈশ্বরে অর্পিত হইল। ঈশ্বর নিত্য, বেদও নিত্য হইয়া দাঁড়াইল। বেদ ঈশ্বরের বাক্য, উহাহে মিথ্যা নাই; সত্যময়, ধর্মময়, জ্ঞানময় এইরূপে কতকগুলি গান ধর্মপুস্তকরূপে পরিনত হইল।"

বিশিষ্ট বিপ্লবী ও সাম্যবাদী দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে—primitive natural religion এ মানুষের আধ্যাত্মিক আকাঙ্খা (spiritual needs) অপূর্ণ থেকে যায়, কারণ সেটি নানা 'প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতীক' দেবতাদের (personification of diverse phenomena of nature)

উপাসনা করে। সেখান থেকেই দর্শনের সূত্রপাত। তাঁর ভাষায়—"The grown-up human is no longer satisfied with the nursery tales, with which he was impressed in his spiritual childhood." এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কবি ও সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ব্যাখ্যা করেছেন—"কাব্য অতিমর্ত্যের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিল। কি পূর্বে কি পশ্চিমে, বাক্য ঐশিক ও সর্বশক্তিময়.....তার থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি; এবং তার প্রাক্তন রূপ ছন্দে।" পৃথিবীর সব সভ্যতাতেই আদিকবিকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিভূ বলে কল্পনা করা হয়েছে, একথা ইতিহাসসম্মত।

তিনি আরো বললেন—'এই অলৌকিকতা চিরদিন টিকলে না। পুরোহিতের প্রাধান্য খর্ব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র আর কাব্য একান্নবর্তী সংসারের মায়া কাটিয়ে আলাদা সংসার পাতলে।'

রেনেসাঁ: ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মানুষ

যে পর্যন্ত বিশ্বাস ছিলো—সূর্যটা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে এবং ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে মানুষ গড়েছেন নিজেরই প্রতিরূপ হিসাবে, ততোদিন মানুষ নিজের কল্পনায় ছিলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যমণি। কিন্তু কোপার্নিকাসের আবিষ্কারের পর থেকে বোঝা গেল—মহাবিশ্বের তুলনায় আমাদের পৃথিবী একটি ধূলিকণা মাত্র, লুপ্তগৌরব হতবৈভব মানুষগুলি এই ধূলিকণার উপর ভাসমান কয়েক কোটি অণুবীক্ষণিক জীবাণুমাত্র। এর সঙ্গে ডারউইনের বিবর্তনবাদ আবিষ্কারের ফলে মানুষের সঙ্গে পশুর আত্মীয়তা খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের বনেদকে একদম ধসিয়ে দিল। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস—এই বিশ্বব্যবস্থা শাশ্বত, চিরন্তন, পরিবর্তনহীন। তাই বিবর্তনের ধারণার সঙ্গে সর্ব ধর্মের সংঘাত অনিবার্য।

এই মনোভাব সম্বন্ধে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার উক্তিতে পূর্বোল্লেখিত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতেরই যেন প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়—"ইহারা জানেন না বিজ্ঞানীরা ধর্মের গোঁড়া অনুশাসনমুক্ত হইয়া প্রকৃতির অন্তরের উপাসনায় রত। প্রাণহীন সাঙ্কেতিক মূর্তি অপেক্ষা প্রাণের পূজায় ইহারা বিশ্বাসী।" এমন মানসিকতা রেনেসাঁর আগে ইয়োরোপেও ছিল। ফলে সব রকম অধিবিদ্যা, আপ্তবাক্য ও ধর্মের নামে অন্ধবিশ্বাসকে ভেঙে মানুষের মনকে যুক্তি ও বাস্তবমুখী করাই ইয়োরোপীয় রেনেসাঁর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সেই সংঘাত ও দ্বন্দ্ব প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান ফসল হলো "আধুনিক বিজ্ঞান।" কিন্তু এই "বৈজ্ঞানিক বিপ্লব"টা ইয়োরোপের মাটিতে বাস্তব রূপ নিয়েছিলো, যেটা আমাদের মতো ঔপনিবেশিক দেশে ঘটেনি।

দার্শনিক বেকন ও তাঁর অনুসারীদের ভাবধারা ছিলো—ইন্দ্রিয়গাহ্য বাস্তব তথ্যের প্রতি চরম গুরত্বদান। এর চরম বিপরীতে অবস্থান হলো বেদান্তদর্শনের—যার বৈশিষ্ট্য হলো ইন্দ্রিয়প্রতীত বাস্তকে বাস্তব বলে স্বীকার না-করা। ঠিক এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন থাকার জন্যই রাজা রামমোহন রায় লর্ড আমহার্স্টকে লেখা চিঠিতে এদেশে বেকনের দর্শনভিত্তিক বিজ্ঞানমুখী শিক্ষার জন্য আবেদন করেছেন—

"বৈদান্তিক মতবাদ এই শিক্ষা দেয় যে চোখে-দেখা জিনিসের বাস্তব অস্তিত্ব নেই; আমাদের পিতা, ভ্রাতা, প্রমুখের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই, সুতরাং তাদের প্রতি সত্যিকারের কোনো মমত্ব থাকা নিষ্প্রয়োজন, তাদের কাছ থেকে যত তাড়াতাড়ি পালিয়ে গিয়ে এই জগৎ থেকে বিদায় নেওয়া যায়, ততই মঙ্গল। এই বৈদান্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমাদের তরুণরা কিছুতেই সমাজের উন্নততর সদস্য হিসাবে নিজেদের গড়তে পারবে না।" দেখা যাচ্ছে তিনি বেদান্তের কিছু বৈশিষ্ট্যকে আপত্তিকর বলে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এক সময়ে রামমোহনও বেদান্ত দর্শনের পিছুটানকে কাটিয়ে উঠতে না পেরে জোড়াতালির চেষ্টা করেছেন।

দুঃসাহসী পথিকৃৎ

পরবর্তীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আরো এক ধাপ এগিয়ে লিখেছেন—"বেদান্ত আর সাংখ্য যে দার্শনিক মত হিসেবে ভ্রান্ত, তা নিয়ে এখন আর কোনো সংশয় নেই।.....এদের প্রভাব দূর করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের ইংরেজি ক্লাসে এমন দর্শন পড়ানো উচিত যার যুক্তিযুক্ততা সংশয়াতীত।" [Binoy Ghosh, "Iswar Chandra Vidyasagar and his Elusive Milestones", Riddhi India, Kolkata 1973] এই উক্তি সম্বন্ধে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—"প্রকাশ্যে বেদান্তকে ভ্রান্তদর্শন ঘোষণা করাই দুঃসাহসী বিদ্যাসাগরের দুঃসাহসিকতম কার্য।" সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞানী সি ভি রামন-

এর ভাইপো বিজ্ঞানী সুব্রহ্মনিয়াম চন্দ্রশেখর বলেছিলেন—ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেন নি, মানুষই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে।

বিজ্ঞানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে—তার ফল বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার এক সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতন্ত্র আছে। আবার সেই সিদ্ধান্তেরও সীমাবদ্ধতা ধরা পড়তে পারে নতুন কোনো তথ্যের আলোকে। এইভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে falsifiability বা ভুল বলে প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা একটা কাম্য ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য—এটির জন্যই বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত নিজের ভুল সংশোধন করতে করতে এগোয়। এজন্য বলা হয় "সুসংবদ্ধ সংশয়বাদ" বিজ্ঞানের অন্যতম নির্ণায়ক লক্ষণ।

সংশয়বাদ ও মানবতাবাদ ঃ বিপরীতের ঐক্য

বস্তুবিশ্ব এবং মানুষের দেহ, অপরদিকে মানুষের চেতনা—এ দুইয়ের বিচ্ছেদ বা দ্বৈতসত্তা এযাবৎকাল প্রায় সব দর্শনের মূল অলোচ্য বস্তু। এই কৃত্রিম বিভাজনের নিরসন আধুনিক বিজ্ঞান ঘটিয়েছে physical origin of mental process আবিষ্কারের মাধ্যমে। দার্শনিক রায়ের ভাষায়—"The discovery of physical origin of the mental phenomena solves the problem of dualism, which has baffled philosophy through the ages." তাঁর মতে নিজস্ব অস্তিত্বরক্ষার (survival) একান্ত জৈব তাগিদেই ব্যক্তিমানবকে মানবসমাজ গড়তে হয়েছে; তাই সামাজিক দায়িত্ব পালন স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদেই মানুষ করবে—এটা তার কাছে বাধ্যবাধকতা বা শুষ্ক কর্তব্যপালন নয়। কারণ ব্যক্তির সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের জন্যও সমাজের ভূমিকা রয়েছে। তাই ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা পরস্পর বেমানান নয়। স্বাধীনতার সন্ধানেই মানুষ একদা সহযোগিতামূলক সামাজিক সম্পর্ক গড়েছিল অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামকে মজবুত করার জন্য।

ব্রিটিশ কবি সুইনবার্নের Music: An ode ও অন্যান্য কবিতায় রেনেশাঁ চেতনা পরিস্ফুট হয়েছে বলে ধরা হয়।

বিপ্লব, বিজ্ঞান ও দর্শন—এই তিনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা ও চর্চা করেছেন বিপ্লবী ও দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায় (এম. এন. রায় নামে সুপরিচিত)। অন্যান্য বহু খ্যাত-অখ্যাত বিপ্লবীদের থেকে যেখানে তিনি স্বতন্ত্র তা হলো—তাঁর মতে সামাজিক বিপ্লবের অনিবার্য পূর্বশর্ত হলো বৈজ্ঞানিক বিপ্লব তথা রেনেসাঁ অর্থাৎ দর্শন বা ভাবজগতের বিপ্লব। ইতিহাসও তার সাক্ষ্য দেয়। বিপ্লবী দার্শনিক রায়ের মতে দর্শন হলো প্রকৃতিকে অনুসন্ধানের মাধ্যমে তার জ্ঞান অর্জন করা। দর্শনের কাজ হলো—"to know things as they are, and to find the common origin of the diverse phenomena of nature, in nature itself." তাঁর মতে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা ও তার সঙ্গে মানুষের নিজের আন্তঃসম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করার তাগিদ থেকেই দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি। তাঁর ভাষায় দর্শনের ভূমিকা হলো—"is to solve the riddle of the universe."

দুজনার পথ দুটি দিকে

মানবেন্দ্রনাথ রায় দর্শনের সঙ্গে অধিবিদ্যার (Metaphysics) একটি স্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে দর্শনের মতো অধিবিদ্যাও প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানে প্রয়াসী হয়েছিল। কিন্তু এই বিদ্যাটি, যার বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে এবং প্রাকৃতিক ঘটনার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটি দর্শনকে ছেড়ে দিয়ে নিজে অবাস্তব ও কাল্পনিক জগতে ঝাঁপ দেয়। যেন অবাঙমানসগোচর বিষয়ের অনুসন্ধানই অধিবিদ্যার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রাকৃতিক বস্তুবিশ্বের বাইরে অতিপ্রাকৃত ইত্যাদির সন্ধান ও চর্চা অধিবিদ্যার স্বক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়—যা কার্যক্ষেত্রে পন্ডশ্রমের সামিল।

দার্শনিক রায়ের মতে যা কিছুর বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে, সেগুলিকে অসার, মায়া ইত্যাদি বলে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা এক অবাস্তব, অলীক, স্বপ্নজগত বা অতীন্দ্রিয় বিভ্রমে আমাদের পৌঁছে দিতে বাধ্য। সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ ভারতবাসীরা দর্শনশাস্ত্র বলতে ধর্মশাস্ত্র, অধ্যাত্মবিদ্যা ও নানারকম অধিবিদ্যাকেই বোঝে। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস মানুষকে প্রাকৃতিক ঘটনার যথাযথ অনুসন্ধানে বাধা দেয়। তাঁর ভাষায়—"what is generally believed to be the distinctive feature of Indian philosophy is that it has not broken away from the mediavel tradition as modern Western philosophy did in the seventeenth century."

অথচ তার তিন শতাব্দী পেরিয়ে 1952 সালে শ্রী রায়ের

" Reason Romanticism and Revolution" বইটি প্রকাশকালেও এই আক্ষেপ থাকছে। যুগের দাবি ও প্রয়োজনকে যথাযথভাবে মেটাতে হলে একালে দর্শনকে একদিকে যেমন যাবতীয় অধিবিদ্যা, আপ্তবাক্য, অন্ধবিশ্বাসের শিকল থেকে ছিন্ন করতে হবে; পাশাপাশি তাকে সংযুক্ত করতে হবে আধুনিক বিজ্ঞানের সম্ভার ও তার যুক্তি কাঠামোর সঙ্গে।

বিপ্লব: বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক

এখানে শ্রী রায় ইয়োরোপ তথা আধুনিক যুগের মূল্যবোধের তথা মানবিকতার সংকটের কারণ হিসাবে সমস্ত মরমীয়াবদা, আপ্তবাক্যের ও প্রচলিত সংস্কারের অনুপস্থিতি এবং পাশাপাশি অত্যধিক যুক্তিবাদ (rationalism) নির্ভরতা থেকে এক ধরণের অতি-সংশয়বাদের পরিস্থিতির দিকে অঙ্গ লিনির্দেশ করেছেন। এর সমাধান হিসাবে মূল্যবোধ বা নৈতিকতার ভিত্তি হিসাবে জীববিদ্যা (biology)-কে নির্দেশ করেছেন। এখনকার বিজ্ঞান শরীর ও মন, পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান — এ দুইয়ের কোনো বিভাজনের অনুমোদন করে না; এই দুইয়ে মিলেই এক অচ্ছেদ্য অখণ্ড সত্তা।

এইভাবে এ যুগের দর্শনকে বিজ্ঞানের ভিত্তির উপরে যথাযথভাবে স্থাপন করতে পারলে ইয়োরোপে একদা যে যুক্তিবাদ-জনিত সংশয়ের সঙ্গে মানবতাবাদী মূল্যবোধের বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছিলো, তার থেকে মুক্তি ঘটবে শুধু নয়, মানবতাবাদী অভিমুখের তাত্ত্বিক ভিত্তি জীবনবিজ্ঞান থেকে মিলবে বলে শ্রীরায় মনে করেন — যে জীববিজ্ঞানের সম্প্রতি ব্যাপ্তি ঘটেছে পরিবেশবিজ্ঞান, বাস্তুতন্ত্র ও আবহাওয়া বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে, যা মানবসমাজের অস্তিত্ব ও অভিমুখ নিয়েই কিছু মৌলিক প্রশ্ন তুলেছে। মানবিক মূল্যবোধ তথা নীতিবোধ কোনো জোরালো ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, কোনো খামখেয়াল বা স্বপ্নাদেশের ওপরে নয়। এমন এক ভিত্তির সন্ধান দিতে পারে বিজ্ঞানসম্পৃক্ত এক দর্শন। এর বাস্তবায়নের জন্য যে সর্বাত্মক আন্দোলন সেটি এক বৈজ্ঞানিক বিপ্লব বা রেনেসাঁ—যাকে সামাজিক বিপ্লবের পূর্বসূরী বলে বিপ্লবী দার্শনিকরা নির্দেশ করেছেন। বর্তমান বিশ্ব যে মানবতাবাদী ঐতিহ্যের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছে—তার পুনরুজ্জীবন ঘটা প্রভাবেই সম্ভব।

প্রবন্ধসূত্র:

1. নির্বাচিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী / পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশ 2002

2. আশীষ লাহিড়ী / অন্য কোনো সাধনার ফল / মানবমন প্রকাশ 2002

3. মানবেন্দ্র নাথ রায়/ Reason Romanticism and Revobution রেনেসাঁ পাবলিশার্স

With best compliments

from

A WELL WISHER

একাকী দহনে

অমল আচার্য
(amalacharya2013@gmail. com)

উত্তর ডুয়ার্সের ঘন সবুজের বুক চিরে অর্দ্ধবৃত্তাকারে ন্যাশনাল হাইওয়ে বেরিয়ে গেছে। দূরে তিরতির করে বয়ে চলা রূপোলী স্রোতস্বিনী। তার একাধারে ভুট্টাক্ষেত, অন্য পাড়ে সবুজ গালিচার মতো চা বাগান। লোকালয় শুরু হবার আগে স্থানীয় বাগান শ্রমিকদের নিয়ে এক ছোট্ট জনপদ। কয়েকটি অস্থায়ী দোকানের পাশাপাশি চায়ের দোকান। জঙ্গলের সহজলভ্য কাঠের ধোঁয়ার কুন্ডলী ওঠে দোকান থেকে। সারাদিন এখানে ছোটো খাটো ভীড় লেগেই থাকে। নদী পার হয়ে অপরদিকে শহরের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী পাকা রাস্তা। মাঝে বাঁশ আর কাঠের সাঁকো। বছরের কিছুটা সময় এই সাঁকো যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। বাকী সময় বাঁশ কাঠ চুরি হয়ে অত্যন্ত বিপদজনকভাবে ঝুলতে থাকে অবশিষ্ট কাঠামো। পাকা সেতুর দাবী দীর্ঘদিনের। কিন্তু প্রশাসনে গুরুত্ব পায়নি বিষয়টি। ফি বছরই এখানে ফেয়ার ওয়েদার ব্রীজ বানানোর বরাত পায় প্রভাবশালী ঠিকাদার। দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। মাঝে মধ্যেই সাঁকোর বাঁশ সরে গিয়ে হাঁড়িকুড়িসহ ঠেলা নদীর কাদায়। ব্যাপারটা চরমে উঠল যখন এক আদিবাসী স্কুল ছাত্রী পা পিছলে নিচে পড়ে যায়। মেয়েটির মাথায় লেগেছিলো। তিনদিন চেষ্টার পরও তাকে আর বাঁচানো যায়নি। ক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠে আদিবাসী সমাজ। ন্যাশনাল হাইওয়ে অবরোধ থেকে শুরু করে পাকা সেতু নির্মানের দাবীতে সমস্ত প্রতিবাদ কর্মসূচী পালিত হল। কিন্তু প্রশাসন অনড়। জায়গাটা নাকি পঞ্চায়েতের নয়। তাই সরকারী অর্থে পাকা সেতু নির্মান বিবেচনাসাপেক্ষ। বাস্তবিক দিকটা হলো, কিছু নিম্নবিত্ত শ্রমিক পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্য তত বেশী নয় যে, বিপুল অর্থ ব্যয়ে ওখানে ব্রীজ নির্মান করতে হবে।

এখানকার দায়িত্ব নেবার পর অমিত প্রথম যে বহু স্বাক্ষরিত আবেদনপত্রটি পায়, তার ঠিকানা দেখে সে চমকে ওঠে। এ জায়গা যে তার শৈশবের। সেই নদী, সেই চা বাগানের নর্থ ডিভিশনের ছায়া ঘেরা অঞ্চল। ছোটোবেলায় কতদিন এ রাস্তা ধরে চালতা কুড়োতে গিয়েছে পিঠাপিঠি বয়সের দিদির সাথে। আবছা হয়ে আসা সেই সুখস্মৃতির টানে এক সকালে নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় সে হাজির। পাখির কলতান, বিস্তীর্ণ চা বাগান, সরু রাস্তার পাশে প্রাইমারী স্কুল - সব একই আছে। শুধু মাঝের কিছু সময় সে ছিল না।

অফিসের গাড়ী সবাই চেনে। চায়ের ছাপ লেগে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া টেবিলের সাথে প্লাষ্টিকের চেয়ার লাগিয়ে শুরু হলো আলোচনা। নেতা গোছের কয়েক জনের চোখে মুখে স্পষ্টতই উপেক্ষা। মন্ত্রী, জেলা শাসক, এম.পি. যে কাজ করতে পারেনি তা করতে এসেছে সামান্য এক বি.ডি.ও.। সত্যিই তো ওদের দোষও দেওয়া যায় না। এখানে সারা বছর দুর্ঘটনা লেগেই আছে। আর মন্ত্রী-আমলার আশ্বাসবাণীও এরা কম শোনেনি। সে যাদের সাথে কথা বলতে এসেছিলো, তারা দুরেই দাঁড়িয়ে থাকলো। গ্রামে গঞ্জে এ এক ঘোরতর সমস্যা। সব আলোচনার মাঝেই সবজান্তা হয়ে কিছু লোক দাঁড়িয়ে যায়। সাহেব সব সময় মুরুব্বিদের সাথেই কথা বলবে, সেটাই তো দস্তুর। যাই হোক, কোনোভাবে মূল বিষয়টি বোঝা গেল। মেয়েটির বাবা সাদ্‌রী ভাষায় হাঁউ মাঁউ করে কিছু বলছিলো। তার কথা কিছু বোঝা না গেলেও একজন জানালো - তাদের সমাজে এরকম মেয়ে তারা আগে কখনো দেখেনি। মা মারা যাবার পর দুগ্ধপোষ্য ছোটো ভাইটিকে খাইয়ে দাইয়ে প্রতিদিনই তার স্কুলে যাওয়া চাই। ফেরার পথে জঙ্গলের কাঠ কুড়িয়ে সংসারটাকে ওই বাঁচিয়ে রেখেছিলো। প্রচন্ড জেদী আর মেধাবী ছাত্রীটিকে স্কুল শিক্ষকরাও খুব ভালো বাসতেন।

পঞ্চায়েত সমিতির সকলকে এক মত করা এমনিতেই দুঃসাধ্য। সেতু নির্মান প্রস্তাব অতি কষ্টে পাশ করানো গেল। হয়তো নেতারা প্রথম কাজের মধ্যে দিয়ে বি.ডি.ও.-কে মাপতে চাইলেন। জেলা পরিষদের মিটিং-এর দিন সকল কর্মাধ্যক্ষদের এক জোট করে হাজির করানো হলো, মিটিং-এ সবার তরফ থেকে একটাই আবেদন - চা বাগানের দুই প্রান্তের সংযোগ

সেতু চাই। বাকী সমস্যার সমাধান পরে হলেও চলবে। প্রাথমিক ভাবে দশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হলো।

একটা খসড়া হলো। তাতে সেতু বানানোর খরচ দাঁড়াচ্ছে ষাট লক্ষ টাকা। এতো বড়ো প্রকল্পের কাজের অনুমোদন রাজ্য স্তর ছাড়া পাওয়া যাবে না। রাজ্যস্তরের অনুমোদনের অর্থ সকলেই বোঝেন। বোঝা গেল এক অসম্ভব কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। অমিত বুঝে উঠতে পারছে না লক্ষ্যে পৌঁছাবে কেমন করে? এ দিকে চোখ বন্ধ করলেই হার মানতে না চাওয়া আদিবাসী কন্যার কালো চোখের চাউনি, যা দেহাতীত হয়েও অনড়। বাধা সে অতিক্রম করবেই। মাটির দেওয়ালে অমিত দেখে এসেছে অদ্ভুত সব আঁকিবুকি। ফার্স্ট জেনারেশন শিক্ষার আলো পাওয়া কালোমেয়ে কি স্বপ্ন বুকে নিয়েই না বড়ো হচ্ছিলো। নাঃ, ব্যাপারটা সর্বশক্তি দিয়ে দেখবে সে। ইচ্ছা চরম পর্যায়ে পৌঁছালে দেখা গেল তার উপায়ও খুঁজে পাওয়া যায়। অবশেষে পরিকল্পনা হলো, তিনটি পর্যায়ে কাজ হবে। প্রথম পর্যায়ে হবে ন্যাড়া সেতু। কিন্তু এভাবে কাজের অনুমোদন দিতে রাজী নয় কেউ। কারণ এতো রাস্তা নয় যে পর্যায়ক্রমে করা যাবে। কিছুদিন হন্যে হয়ে চেষ্টা করতে করতে অবশেষে প্রচলিত প্রথার সাথে বোঝাপড়া করে নিল সে। বুঝলো, সরকারী বিধিনিষেধ পাশ কাটাতে না পারলে এ কাজ করা সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ কাজের দায়িত্ব যাকে দেওয়া হল, তিনি যথাযোগ্য প্রণামী দিয়ে এক অদ্ভুত উপায়ে কাজের অনুমোদন আদায় করে নিলেন। মানসিকভাবে এসব মেনে নেওয়া কষ্টকর হলেও, অমিতের সামনে দ্বিতীয় কোন রাস্তা খোলা ছিল না।

কাজ শুরু হল, আবার বন্ধও হয়ে গেল। বালি পাথর সিমেন্ট ইত্যাদি সরবরাহে স্থানীয় দাদাদের আবদার মানতে হবে। কিন্তু ততদিনে জনমত তৈরী হয়ে গেছে। এই প্রতিরোধ ভাঙ্গতে অমিতকে খুব একটা বেগ পেতে হয় নি। এত কিছুর মাঝে অফিসের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ আশ্চর্যজনকভাবে চুপচাপ।

বাইরের সমর্থন যত বাড়ছে, তার অফিসের পরিবেশ তত গুমোট হচ্ছে। কর্মচারীরা মনে মনে ক্ষুব্ধ। এই বি.ডি.ও. এখানে আসার পর থেকে তাদের একাধিপত্যে ক্রমান্বয়ে বাধার সৃষ্টি করে চলেছেন। অফিসের কর্মচারী সংগঠন তাদের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা কয়েকবার করেছে। প্রথম কয়েক মাস ঘন ঘন ডেপুটেশন, চোখরাঙ্গানি, পেন ডাউন, গো স্লো - সব হয়েছে। অফিস চলাকালীন অফিস ফাঁকা করে কর্মচারীদের বিক্ষোভ সমাবেশও হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। একটা সময় সব আন্দোলন আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসে। ব্লক সংগঠন বোঝে, আরও বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে হবে তাদের।

৪০2০৪

দেওয়ালে মহাত্মা গান্ধীর ছবি। পাশের কিউবিকলে কম্পিউটার কর্মী একমনে ডেটা এন্ট্রী করে যাচ্ছে। অমিত গতকালের ডাকে আসা চিঠিপত্রগুলি দেখছিলো। হঠাৎ দু'তিন জন সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে বি.ডি.ও. সাহেবের চেম্বারে নেতার প্রবেশ।

- নমস্কার বি.ডি.ও. সাহেব।

- নমস্কার।

- এখানে আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? আমরা আছি, যখন যা দরকার বলবেন।

অমিত বিনীতভাবেই জানালো, তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

নেতা গলা খাঁকারি দিয়ে হাত বাড়িয়ে সঙ্গীদের দেখালেন - এরা রইল। দরকার হলে বলবেন। এরা পারে না হেন কোন কাজ নেই। আপনি ভালো থাকলেই আমরাও ভালো থাকবো।

চা খেয়ে উঠবার সময়ে নেতার ইঙ্গিতে চেলারা এগিয়ে যেতেই সোজাসুজি বি.ডি.ও.র দিকে তাকিয়ে নেতা বলেই ফেললেন - দেখুন, এর আগে যারা এই চেয়ারে বসেছেন, সকলেই আমার সাথে আলোচনা না করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতেন না। আপনিও আশা করি তাই করবেন।

অমিত দেখলো, সাদা পাঞ্জাবীর গলা দিয়ে একটি কালো কেউটে মাথা বের করে হিস হিস করছে। ওরা চলে যাবার পর বড়বাবু জানালেন, এর হুকুম ছাড়া এখানকার গাছের একটি পাতাও নড়ে না।

ব্লকটি শহরঘেঁষা, স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক দলের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে বেশী। এককভাবে কারুর আধিপত্য নেই। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি ফাঁকা জমিও ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নন। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ লেগেই রয়েছে। সকলেই ব্লক অফিসের দখল নিতে চায়। শরিকদলের এক

নেতা কিছুটা প্রশাসন বন্ধু। জঙ্গীপনার চাইতে তার বেশী পছন্দ ক্ষুরধার যুক্তি জাল বিস্তার। অমিতও অনেকটাই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে তার উপস্থিতিতে। ব্যাপারটি শাসক দলের নজর এড়ায়নি। শরিকদলের এই নেতার সাথে বি.ডি.ও.-র বন্ধুত্ব মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে অস্বস্তিকর। বি.ডি.ও.কে বেকায়দায় ফেলবার জন্য এই শরিকদলের গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্নীতির অভিযোগ আনল তারা। আদিবাসীদের বার্ধক্যভাতার টাকা তছরূপ করেছেন এক গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। অমিত দেখল, শাসক দল একটি তাস ফেলে তার সাথে খেলতে চাইছে। ঝুঁকি নিল না সে। নিজেই এর মোকাবিলা করবার জন্য একা একা চলে গেল অকুস্থলে।

গরমের দুপুরে গাছের ছায়ার বেঞ্চি পেতে মাননীয় সদস্য আদুড় গায়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। পাশে বারো তেরো বছরের একটি ছেলে ঘামাচি ভেঙ্গে দিচ্ছে। বি.ডি.ও. সাহেবের এনকোয়্যারী শুরু হলো। কথার মারপ্যাঁচে সদস্য স্বীকার করে নিলেন, ভাতার টাকা তিনি নিয়েছেন। কিন্তু শোধও করে দেবেন। সাদা কাগজে তার বয়ান লিখে তাকে দিয়ে সই করিয়ে এবং সাক্ষী রেখে অমিত ফিরে এলো অফিসে। পরদিন শরিকনেতা গম্ভীর। একবার শুধু জিজ্ঞাসা করলেন - বি.ডি.ও. সাহেব সব অভিযোগই আপনি এভাবে তদন্ত করবেন তো?

অমিত হাসিমুখেই উত্তর দিল - আপনার লোকই তো সব স্বীকার করেছে। এই দেখুন কাগজ, আগামী বৃহস্পতিবার টাকা ফেরৎ না দিলে এফ.আই.আর. করা হবে। ততোধিক গম্ভীর হয়ে নেতার উত্তর - বেশ।

অমিত দেখলো, অফিসের পরিবেশ খুব দ্রুত পাল্টাচ্ছে। সবাই কেমন স্বল্পভাষী। যেন এক অজানা ভয় সবাইকে তাড়া করে ফিরছে। তার সাথে দূরত্ব বাড়িয়ে নিয়েছে হঠাৎ। এমনিতে এখানকার লোকজন খুব খারাপ নয়। স্বভাবে একটু শ্লথ। কিন্তু সে পরিমান ধূর্ত্ত নয়।

ভোজবাজির মতো নির্দ্দিষ্ট দিনেই তার চেম্বারে পাঁচজন আদিবাসী নারী পুরুষের হাতে তাদের পাওনা টাকা তুলে দিল সেই সদস্য। অমিতও স্বাক্ষরিত কাগজটি ফিরিয়ে দিল তাকে। তারপর থেকেই অফিসে অভিযোগের ঝড়। ল্যান্ডফোনে তাকে অভিযুক্ত করে এক মারাত্মক অভিযোগ। মিড ডে মিলের রান্না এক মুসলিম মহিলা করায় স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদীর দল। দুদিন হয়ে গেল, প্রশাসন নিষ্ক্রিয়। অমিত একবার পুলিশের সাহায্য নেবার কথা ভাবলো। আবার মনে হলো, পরিস্থিতি এতে আরও জটিল হতে পারে। দৈনিকে খবরটি ফলাও করে ছেপেছে। দেরি না করে, অফিসের দুজন সহকর্মীকে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই রওনা হলো সে। কিছুটা আগে কাদায় আটকে গেল গাড়ী। পলাশতলি হাটের কাছে স্কুল। কিছুটা হেঁটে যখন স্কুলে পৌঁছল ওরা, তখন মধ্যাহ্ন বিরতি চলছে। প্রাইমারী সেকশনের ঘরগুলো সার দিয়ে তালাবন্ধ। রান্নাঘরটি দা দিয়ে কুপিয়ে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। উনুনগুলো মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে কেউ। এক জান্তব আক্রোশে গ্রামের [illegible]ীব শিশুগুলোর খাওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অমার্জনীয় অপরাধ। লাগোয়া হাইস্কুলের শিক্ষকদের জমায়েতে সে যখন জিজ্ঞাসা করল, এসব যখন চলছে তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? সবাই মাথা নিচু করে নিশ্চুপ। অমিত বুঝলো, দুর্গম এই জায়গায় শিক্ষকতা করতে আসা শিক্ষককুল প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। হঠাৎ কেউ একজন ভয়ে ভয়ে বলল - স্যার, ঐ যে কলা গাছের ঝোপের আড়ালে ওরা। অমিতের আর সহ্য হোলো না। মাঠে মাঝে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে জানান দিল - আমি এখন এই তালাবন্ধ ঘরগুলোর তালা ভাঙ্গব। কারুর যদি কিছু করবার থাকে আসুন। আমাকে বাধা দিন। স্কুলের হেডমাষ্টারকে বলল - আমাকে এক্ষুনি দা আর হাতুড়ি দিন। বি.ডি.ও.র এই রুদ্রমূর্ত্তি দেখে কয়েক জন কাঁপতে কাঁপতে দা হাতুড়ি নিয়ে দৌড়ে এল। স্কুলের মাষ্টারদের মধ্যে ততক্ষণে সাহস ফিরে এসেছে। একজন বি.ডি.ও. সাহেবের কাছ থেকে হাতুড়ি নিয়ে তালাভাঙ্গা শুরু করে দিল। হেডমাষ্টার শুধু বললেন - স্যার, আপনি শুধু সাথে থাকুন। আপনাকে কিছু করতে হবে না।

পরদিনের দৈনিকে হেডলাইন - তালা ভাঙ্গলেন বি.ডি.ও.। মিড ডে মিল চালু। অফিসের কর্মচারী সংগঠন নিশ্চুপ। রাজনৈতিক নেতাদের আনা গোনা কমে গেছে অনেকটাই। অমিত বুঝলো, সাপের লেজে পা দিয়ে ফেলেছে। এখন থেকে অনেক সতর্কভাবে পা ফেলতে হবে তাকে। সবাই মেপে যাচ্ছে তাকে। সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে প্রতিপক্ষ। মাঝে মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠে সে। খুব একাকিত্ব বোধ হয়। তার কেউ নেই। তার কথা ভাববার, সঙ্গ দেবার লোক নেই। সবাই আসে শুধু নিজের প্রয়োজন মেটাতে, অথচ সে যে সাধ্যমতো সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছে, সেটা বোধ হয় কারুরই পছন্দ নয়।

২০১৩

গোটা কয়েক চা বাগান, একটি রেলওয়ে শহর, মিউনিসিপ্যালিটি এবং এক ডজন গ্রাম পঞ্চায়েত - এই নিয়ে ব্লক এলাকা। বৈচিত্র্য রয়েছে। আদিবাসী সাঁওতাল, রাভা, মদেশিয়া যেমন আছে, তেমনি রেলের বাবু, চা বাগানের হাফ প্যান্ট পরা সাহেবও রয়েছেন। এই সাহেবরা শীতেও হাফপ্যান্টই পরেন। অমিতের ভালো লাগে বনবস্তি, চা বাগান এলাকাগুলো। লোকগুলো বলে, এর আগে কোনো বি.ডি.ও.ই নাকি ওদের গাঁয়ে যায়নি। এভাবে কথা বলা তো দূর অস্ত! এতে তার অহমিকা বৃদ্ধি পায় না, বরং দুঃখ হয় লোকগুলোর জন্য। বনবস্তি গিয়ে সে শিখেছে, মানুষের চাহিদা কতো ভিন্নধর্মী হতে পারে। দিন কয়েক আগের একটি গোপন রিপোর্টে সে দেখছে, এসব অঞ্চলে মাওবাদীদের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই সূত্রেই তার আদিবাসীদের সাথে বৈঠক । বনবস্তির লোকেরা জানাল - তাদের কিছু চাই না। শুধু বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। অদ্ভুত দাবী! প্রশ্ন করে জানা গেল, এখানকার প্রায় 110টি পরিবারের এক মাত্র ফসল ভুট্টা প্রতি বছর মহাকাল (হাতি) খেয়ে চলে যায়। তাদের রাস্তা পাকা বাড়ী চাই না। ফসল বাঁচানোর জন্য তাদের বিদ্যুত চাই-ই চাই। প্রায় মধ্যযুগীয় পরিকাঠামো গ্রাম জুড়ে। কাঠের বাড়ী। পাশেই শুকরের খাটাল। নিকাশি ব্যবস্থা নেই। হাতির ভয়ে বাড়ীগুলো খুব কাছাকাছি। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে গোটা গ্রাম ঘুরে অমিত বুঝলো - তাদের দাবীটা কতটা সঠিক। কিন্তু উন্নয়ন খাতে যে টাকা আসে, তা দিয়ে এই কাজ করবার অনুমতি নেই। তাহলে উপায়? রাভা সর্দার সঙ্গোপনে জানান - বহুদিন ধরে তাঁরা অনেক আবেদন করেছেন। কিন্তু কেউই তাদের কথায় কান দেয়নি। তরুণ প্রজন্ম এখন সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের উপর আস্থা হারিয়ে উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকছে। তাদের কথা আর মানছে না। অমিত কিছুটা অসহায় বোধ করলো। কোনো উপায় নেই? মনে পড়লো, প্রতিশ্রুত সেই সেতুর কথাও। ফেরার সময় প্রতি নমস্কার দিয়ে জানালো, সে আবার আসবে। রাতে ঘুম ভাঙ্গলে ভাবে, কোত্থেকে জোগাড় হবে এতো টাকা? এরমধ্যে বিদ্যুৎ দপ্তর জানিয়েছে, পুরো গ্রাম বিদ্যুতায়িত করতে খরচ হবে প্রায় দশ লক্ষ টাকা। হতাশায় সে মুখ নামিয়ে উপায় খোঁজে। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো অমিতের মনে হলো - উপায় আছে। সে ব্লকের সমস্ত হাট, নদীঘাট, ফেরীঘাট নিলামের নোটিশ টাঙ্গিয়ে দিল। দীর্ঘদিন ধরে নিলাম করা হচ্ছিল না। কিন্তু, এবার মধ্যস্বত্বভোগীরা সোজাসুজি জেহাদ ঘোষণা করে দিল। এসব হাট ঘাট নামে মাত্র মূল্যে দীর্ঘদিন তারাই চালিয়েছে। এতো তাদের রুজি রোজগার বন্ধের ব্যবস্থা হচ্ছে। নিলামের দিন প্রবেশপথ থেকে বি.ডি.ও.-র চেম্বার অবধি মহিলারা শুয়ে। কয়েকজন ষন্ডামতো লোক পুরো ব্যাপারটা পরিচালনা করছে। অমিতের হাসি পেল এই ভেবে যে, এই জমায়েতের পেছনে আন্দোলনকারীদের অনেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। আন্দোলনকারীরা অনড়, অমিতও অনড়। বেলাশেষে আন্দোলনকারীরা যখন অনেকটাই হতোদ্যম, একটা সমাধানসূত্র বের হলো অবশেষে। নিলাম বাবদ যে অর্থ উঠে এল, তা দেখে সকলেরই চোখ কপালে। অবিশ্বাস্য। শীত পড়ার ঠিক আগে শুরু হল, বনবস্তির বিদ্যুতায়নের কাজ। এরকম প্রথা ভঙ্গকারী কাজের কথা শুনে বিদ্যুৎ দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকার প্রথমে খুব আমোদ পেয়েছিলেন। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা শোনার পর সিরিয়াস হয়ে গেলেন। নিজেই উদ্যোগী হয়ে তার টিমকে পাঠিয়ে দিলেন রাভাবস্তির ঠিকানায়। যে কাজ সরকারীভাবে করলে অন্তত ছয় মাসের আগে হওয়া সম্ভবপর ছিল না। সে কাজ সমাপ্ত করতে সময় নিল মাত্র আঠাশ দিন। কাজের স্বার্থে সংস্থার কর্মীরা ক্যাম্প করেছিল বনবস্তিতে। ঐ দিনগুলি এলাকার বনবাসীরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে বিদুৎকর্মীদের খাইয়েছে, পরমাত্মীয়ের মতো আগলে রেখেছে। রাতদিন কাজের সাথে সাথে চলেছে তাদের নিজস্ব নাচ গান। মাসব্যাপী উৎসবের পরিসমাপ্তিতে রাভাবস্তির 110টি পরিবারেরই জ্বলল বহু প্রতীক্ষিত আলো। মন্ত্রী এলেন, জেলা হোক বড়কর্তা এলেন। সামনের বিশাল মাঠ রঙ-বেরঙের বেলুন, রাংতা কাগজের ঝালর দিয়ে সাজিয়েছে বনবস্তির লোকেরা। মাঝে মাঝে হরেক পশার নিয়ে ছোটো ছোটো দোকান। অকিঞ্চিৎকর উপকরণ, কিন্তু উৎসাহ অপরিসীম, উৎসবের পোষাক সবাই ঘুরে বেড়াছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সকলেই একটি সংজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যায় অনেক সময় নিলেন - উন্নয়ন কাকে বলে?

এই প্রকল্পটির রূপায়ন কোনোভাবেই বাঁধাধরা সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় পড়েনা। অথচ অনুষ্ঠানে আদিবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বুঝিয়ে দিচ্ছিল,

তারা ঠিক এই কাজটিই চেয়েছে সরকারের কাছ থেকে। সে জন্য রাস্তাঘাট, গৃহ, খাদ্য ছেড়ে হঠাৎ করে কেন বিদ্যুতায়ন তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। বরং প্রশংসিত হলো চিরায়ত উন্নয়ন প্রকল্প ছেড়ে নূতন এই প্রচেষ্টার।

বড়ো গোলমেলে শব্দ এই উন্নয়ন। ক্ষমতাশীল যিনি, তিনি তার লক্ষ্য পুরণে সর্বদাই উন্নয়নকে ঢাল করেছেন। নির্বিচারে পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে, কারণ উন্নয়ন হচ্ছে। নিরীহ আদিবাসী, বনবাসীরা উৎখাত হচ্ছে শতাব্দী প্রাচীন তাদের অধিকার থেকে। কিন্তু কেউ চিন্তিত নয়। কারণ উন্নয়নের প্রয়োজনে এটুকু তো স্বীকার করতেই হবে। নদী ঝোড়া, অসংখ্য প্রজাতির গাছ-গাছালি, জীব বৈচিত্র্য, নির্মল আকাশ - মায়ের ভূমিকার প্রকৃতি যা সহস্রাধিক বছর ধরে তিল তিল করে জীবজগতের জন্য প্রস্তুত করেছে, তা ধ্বংস করতে মানুষ দেড়শ বছরের বেশী সময় নেয়নি। এই হারে উন্নয়নের নামে ধ্বংস ডেকে না আনলে হয়তো পৃথিবীটা আরও বহুবছর সবার জন্যে ব্যবহারযোগ্য থাকতো। হয়তো অবিমৃষ্যকারী মানবজাতি না জন্মালে একতরফা এই ধ্বংস দেখতে হোতো না। বাকী তাবৎ জীবকুল থেকে পরিবেশ জগতের প্রতিটি অস্তিত্ব সকলেই এক অদৃশ্য নিয়মের সুতোয় বাঁধা। সকলের কাছে নিরন্তর বার্তা পৌঁছাচ্ছে বিশ্ব নিয়ন্তার। মানুষ বাদে কেউ আর তা লংঘন করার ঔদ্ধত্য দেখায় না। যেখানে মানুষ প্রকৃতির খুব কাছাকাছি, সভ্যতার সুফল থেকে প্রকৃতির উপরেই বেশী নির্ভর করতে হয়, সেখানকার মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই বিনয়ী, অকারণ উদ্ধত নয়। নগর সভ্যতা তাদের দেখে ভাবে, কিছুই তো নেই এদের। তাও এতো অনাবিল আনন্দ, বেঁচে থাকার সুখ কোথায় পায় এরা?

সভ্যসমাজের চোখে তুচ্ছ এই জনজাতিদের সম্মান দিয়ে, তাদের মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রেখে কি এই উন্নয়ন হতে পারতো না? উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া তথাকিথিত উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা তাদের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে? কেন ধরে নেওয়া হচ্ছে এই প্রান্তিক আদিবাসীরা নিজেদের উন্নতির কথা ভাবতে জানে না। নিজেদের প্রয়োজন বুঝতে পারে না। তাদের নিজস্ব পরিবেশ থেকে নেওয়া বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতার কোনো মূল্য নেই সভ্য সমাজের কাছে? অথচ তাদের এই শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারলে আধুনিক সভ্যসমাজ অনেকটাই সহনশীল হতে পারতো। কিন্তু তা বোঝানোর মাধ্যম কোথায়? এখানে নিরক্ষরদের মুখে সভ্যসমাজের ভাষা নেই, তাই তাদের কথাগুলো পৌঁছায় না সভ্য সমাজের কাছে।

৯০4০৪

বাবা মারা যাবার পর সমস্ত সংসার গুটিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে মা উঠে এসেছিলেন নিজেদের কেনা সামান্য এক ফালি জমিতে। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পরিবেশে সীমাহীন দারিদ্র্যের সাথে নিরন্তর জুঝতে দেখেছে অমিত। ছোটো হলেও এটুকু বুঝতে তার কোনো অসুবিধা হয়নি, কি পরিমাণ আত্মপ্রত্যয় থাকলে মানুষ শুধু আত্মসম্মানবোধের তাগিদে এতটা ঝুঁকি নিতে পারে। মাকে স্যালুট জানানো শুরু তখন থেকেই।

মা তার কলেজ জীবনের খরচ জোটাতে পারেনি। সেজন্য দিনের পর দিন না খেয়ে থেকেছে সে। টিউশনি খোঁজার জন্য প্রাণপাত করেছে। কিন্তু তার ওই হতদরিদ্র চেহারা দেখে লোকের করুণার বদলে হয়তো বিবমিষার উদ্রেগ হোতো। কেউই বিশ্বাস করে তাকে টিউশনি দিতে চায়নি। এক বন্ধুর সুপারিশে টিউশনি খুঁজতে এক বাড়িতে গিয়েছিলো। সে তাকে সামনে বসিয়ে রেখে বন্ধুর সাথে চা বিস্কুট খেয়েছেন গৃহকর্ত্তা। অমিত ভেবেছিলো, হয়তো তাকেও দুটো বিস্কুট দিয়ে চা দেওয়া হবে। কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখার পর খালিমুখে তাকে বিদায় দেওয়া হল। রাস্তায় বেরিয়ে সেদিন খুব কান্না পেয়েছিলো তার। গৃহকর্ত্তা বার বার তার শার্টের সেলাই করা জায়গাটা দেখছিলেন। অমিত সেদিন শুধু উর্দ্ধাকাশের দিকে তাকিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলো নীরবে।

সে যত আঘাত পেয়েছে, তত তীব্র হয়েছে তার প্রতিশোধ স্পৃহা। তার কষ্টের কথা কেউ জানতে পারেনি। তার আত্মসম্মানবোধ তাকে কোনোও দিন কারুর সাহায্য নিতে দেয়নি। এ তার জীবনের এক অমূল্য অভিজ্ঞতা। সে কৃতজ্ঞ জীবনের প্রথম পর্যায়েই ক্রমান্বয়ে অনাহারে থেকে এই রূঢ় বাস্তবের চেহারার সাথে পরিচিত হবার জন্য। কেউ যেন পরমযত্নে তার হাত ধরে শিখিয়েছে, জীবনের প্রতি পরতের মূল্য। দেখো শেখো, কিন্তু ভেঙ্গে পড়বে না। একদিন নিজের শক্তিতেই সব বাধা টপকে পৌঁছে যাবে তোমার লক্ষ্যে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ কেউই পায় না, দুঃখকে একবার চিনে নিলে তার মধ্যেও তুমি বাঁচার রসদ পাবে। শুধু প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস। তাও অমিত মাঝে মাঝে দিশাহারা

হয়েপড়ে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো খোঁজে, কোথায় তার ভুল হল? প্রতিদিন অফিস যাওয়ার পথে চিন্তা হয়, আজ নূতন কি ঝামেলা বাঁধাবে লোকজন? কর্মচারী সংগঠন এক জোট হয়ে জেলায় নালিশ জানিয়ে এসেছে, এই বি.ডি.ও.-র সাথে কাজ করা যাচ্ছে না। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা অফিসের কর্মচারীদের সাথে বোঝাপড়া করে বাইরের লোকজনকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। সামনে আসছে না। মাঝে বার দুয়েক শাসক দলের জেলা সম্পাদক তার বিষয়ে তদন্ত করে গেছেন। অভিযোগের মূল লক্ষ্য বি.ডি.ও. সাহেবের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ। হতাশ শাসকদল অভিযোগ করেছে, এই বি.ডি.ও.-কে রাখলে সামনের পঞ্চায়েত ইলেকশনে ভরাডুবি হবে দলের। ধীরে ধীরে এক ঘরে হয়ে পড়েছে সে।

কনভেন্ট পড়া এস.ডি.ও. সাহেব ধমক দেন— হোয়াই আর য়ু নট বিহেভিং লাইক আদার বি.ডি.ও.স। অমিত ভাবে, সে কি সত্যিই অস্বাভাবিক। আনন্দস্ফূর্ত্তির স্থানে সে অনুপস্থিত। ভাবে ঐ সময়ে যদি সমস্যাগুলো আরও একটু মেটানো যায়। ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে রবি ঠাকুরের লাইন— তোমার উপরে নাই বিশ্ব-ভূবনের ভার। ঠিক, কিন্তু সে তো অনধিকার চর্চা করছে না। এগুলো তো তার কাজ। সে না দেখলে এই লোকগুলি কার কাছে যাবে? সাতসকালে ফোনে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েরা প্রতিকার চায়। অভিযোগ জানায়। অভিযোগ জানায়। অফিসে এসে চা বাগান বনবস্তির আদিবাসীরা সোজাসুজি তার কাছে চলে আসে।

আগে নাকি সামনের চা দোকানেই অফিসের লোকজন বসে থাকতো পরিষেবা দেবার জন্য। অফিস অবধি আসার দরকার হতো না। অমিত গ্রামে গ্রামে ঘোরার পর এরা বুঝেছে, বি.ডি.ও. কোনো অগম্য বস্তু নয়। সে একজন অতি সাধারণ সাদামাটা লোক। যে তাদের কথা শোনে, প্রয়োজনে পরামর্শও দেয়। তারা তাই দল বেঁধে এসে বি.ডি.ও.রই খোঁজ করে। সমস্যায় পড়ে গেছে অফিসের পরিষেবা প্রদানকারীর দল। বি.ডি.ও. কাকু, বি.ডি.ও. বাবু তাদের সীমানা ছাড়িয়ে এখন জনগণের সম্পত্তি।

যে কোনো সরকারী অফিসে বিক্ষোভ জানানোর পদ্ধতি হলো, আগাম নোটিশ দেওয়া। তাতে আধিকারিক কিছুটা প্রস্তুতি নেবার সুযোগ পান। অমিত এক দুপুরে দোতলার জানালা দিয়ে দেখতে পেলো, এক মারমুখী জনতা লম্বা লাঠিতে ফ্ল্যাগ লাগিয়ে রাস্তা অতিক্রম করছে। পাশেই বি.এল.আর.ও. অফিস। সে ভাবলো, খবর নেওয়া দরকার, এরা কারা? হঠাৎ মিছিলটি ঘুরে গিয়ে তার অফিসের দিকে এগোতে লাগল। যাকে খবর নেবার জন্য পাঠানো হয়েছিল, সে ছুটে এসে জানালো - স্যার এরা নকশাল, এদের ভয়ে গোটা অফিস ফাঁকা হয়ে গেছে। কি হবে স্যার? সে চটজলদি ভেবে নিল কোনও নোটিশ না দিয়েই এরা আসছে। ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়। এই মুহূর্তে সে এক মিটিং-এর মাঝখানে। এখানে বাইরের অফিসের অনেক আধিকারিক রয়েছেন। তাদের সুরক্ষা দেওয়া তার কর্ত্তব্য। সর্বোপরি সে নিজে হাতে প্লাষ্টার বাঁধা অবস্থায়। খেলতে গিয়ে বাঁ হাতের কব্জির হাড় ভেঙে গিয়েছে। ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন। কিন্তু সে নেয়নি। কর্ত্তব্য স্থির করে নিল সে। মিটিং হলের বাইরে এসে দাঁড়াল। মহিলারা সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। মুখে অশ্রাব্য গালিগালাজ। পিছনে পুরুষ পুঙ্গবেরা। এসেই চিৎকার - কই বিডিও, খুঁজে বার কর ব্যাটাকে। এদিকে অফিসের চেয়ার টেবিল ভাঙা শুরু হয়ে গেছে। অমিত জানে, এ সময় মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়। সে সামনে এসে মিছিল আটকে দাঁড়াল - আমিই বিডিও। কি বলবার আমাকে বলুন। আবার সমবেত চিৎকার - শালা চোর বিডিও! মার ব্যাটাকে।

সে প্লাষ্টার করা হাতটাকে যথাসম্ভব আড়াল করে ততোধিক চিৎকার করে বলল - আপনারা কেউ যদি প্রমাণ করতে পারেন, আমি এক টাকাও ঘুষ খেয়েছি, তাহলে আপনারা যে শাস্তি দেবেন, আমি মাথা পেতে নেব। কি আশ্চর্য, সামনের যে মেয়েগুলো শাড়ি তুলে তেড়ে তেড়ে আসছিল, তারা চুপ হয়ে গেল। অমিত এবার তার দ্বিতীয় অস্ত্র প্রয়োগ করলো - আপনাদের মধ্যে কি কোনো নেতা নেই, যার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি? সামনের দাঁতভাঙা কালো পানা একটি লোক এগিয়ে এলো— অ্যাই, থাম তো তোরা! আমাকে সাহেবে সাথে কথা বলতে দে। উত্তাল জনতাকে আলোচনার টেবিলে বসিয়ে তাদের বোঝাতে আধঘন্টা সময় নিয়েছে অমিত। এর মধ্যে মহকুমা জেলা থেকে ফোন আসা শুরু হয়ে গিয়েছে। সবাই জিজ্ঞাসা করছে সে সুস্থ আছে কি না। ধীরে ধীরে অফিসের স্টাফরা ফিরে আসা শুরু করেছে।

ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। যতই মিটিং মিছিল চলুক, তা একটি নূন্যতম নিয়ম মেনে চলে। তা হলে আজ কেন এরকম একটা ঘটনা ঘটল? কিছুদিন পর অমিত খবর পেল,

তার অফিসেরই কিছু স্টাফ এর সাথে জড়িত। না হলে অফিসের ভেতরের এতো খবর বাইরের লোকের পাবার কথা নয়। দীর্ঘ দিন ধরে সক্রিয় অফিসের এই চক্রের সাথে সবাই সুর বেঁধে চলেছেন, এই প্রথম একজন বেসুরো গাইছেন। নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানো তাকে তো উপড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করবেই। তারই ছোট্ট নমুনা এই বিনা নোটিশে আক্রমণ।

ঌ5ঌ

কানাঘুষোয় যে কথাটি শোনা যাচ্ছিলো, তা অবশেষে সত্যি হলো। অমিতের ট্রান্সফার অর্ডার বের হয়েছে এবং তিনদিনের মধ্যে সমস্ত দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে পরবর্তী কর্মস্থলে চলে যেতে বলা হয়েছে। অফিসে হুল্লোড় বয়ে গেল। কেউ কেউ তো আবার মানত করে বসে আছে। স্বাধিকার, কর্মচারীর স্বাধীনতা, সংগঠনের অধিকার - এ সব কথা ঘুরে ফিরে আসতে লাগলো। দীর্ঘ সংগ্রামের শেষে আন্দোলন জয়যুক্ত হলে তার আস্বাদ আলাদারকম হয়। কর্মচারী সংগঠন পরবর্তী বিডিও সাহেবকে আবাহনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ফেললো। ব্যাপারাটা আগেই কিছুটা আঁচ করেছিল অমিত। খুব তাড়াতাড়িই তাকে সরতে হবে। কিন্তু সে চাইছিলো, আর কয়েকটা দিন। যাতে তার আরব্ধ কাজগুলোর একটা ব্যবস্থা করে যেতে পারে। এতো লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে চলে গেলে নিশ্চিতভাবেই কাজগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু জেলাশাসক কোনো কথাই শুনতে চাইলেন না। বোঝা গেল তিনিও অপারগ। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অমিত প্রস্তুতি শুরু করে দিলো। কিছুটা অভিমানীও হয়ে পড়লো সে । এতো দিন সে যা করেছে, তার কিছুই মূল্য নেই প্রশাসনের কাছে? আজ সে অবাঞ্ছিত।

বাড়ীতেও সে নির্বান্ধব। তার স্ত্রী তাকে দূর গ্রহের জীব মনে করে। একমাত্র কন্যাও মা-ঘেঁষা। বাবাকে সে দেখে মায়ের আঁচলের আড়াল থেকে। বাবা সদাই ব্যস্ত। মেয়ের জন্মদিনেও সে উপস্থিত থাকতে পারে না। বাবার অপেক্ষায় থেকে মেয়ে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে। হিসাব মিলাতে চায় অমিত। কিন্তু হিসাব মেলে না। উপলব্ধি করছে সে ধীরে ধীরে কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ছে। বাইরের জগৎ প্রভাব ফেলেছে তার পারিবারিক জীবনেও।

পরের দিন থেকেই দলে দলে লোক আসা শুরু হয়ে গেল। কেউই মেনে নিতে পারছে না অমিতের এই আকস্মিক বদলি। বনবস্তির লোকজন রাস্তা অবরোধের হুমকি দিল। চা শ্রমিকরা সভা করে এই বদলির আদেশ প্রত্যাহারের আবেদন জানাল। এমন কি রাজনৈতিক নেতারাও ব্যক্তিগতস্তরে দেখা করে দুঃখপ্রকাশ করল। অমিত সকলকেই শান্তভাবে নিরস্ত করল। বিভিন্ন মতভেদ সত্ত্বেও সকলে একবাক্যে স্বীকার করে নিল - এই বিডিও-র আমলে যা কাজ হয়েছে, তা আগে কখনও হয়নি। শাসকদলের নেতারা কিছুটা দ্বিধার সাথে জানালেন - তাঁরা নিরুপায়। নির্বাচনের দায় বড়ো দায়। শরিকদলের নেতা তো সোজাসুজি বলেই ফেললেন - বিডিও সাহেব, আপনি কিছুই হিসাব করেননি। নিরপেক্ষভাবে উন্নয়ন করতে গেছেন! এই জমানায় এভাবে কেউ কাজ করে? আপনার সদিচ্ছা ছিল, ক্ষমতা ছিল। কিন্তু আপনি চলেছেন অন্ধের মতো। অথচ একটু ব্যালান্স করে চললে, আপনাকে আমরা আরও কিছুদিন পেতাম। খুব ক্ষতি করে গেলেন আমাদের!

নতুন বিডিওকে বোধহয় একটা ধারণা দিয়েই পাঠানো হয়েছিলো, একদম কালক্ষেপ না করে পৌঁছেই দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে। অমিতকে পাশে বসিয়ে বিডিও ম্যাডাম অত্যন্ত অপমানজনক ভাষায় অফিসের বড়বাবু এবং ক্যাশিয়ারকে হিসাব নিয়ে ধমকাধমকি শুরু করে দিলেন। ভাবখানা এই, অনেক নয় ছয় করেছো তোমরা। আর কোনো সুযোগ দিচ্ছি না। প্রতিটি ধমক অমিতের বুকে এসে লাগছে। এরা এখনও অমিতেরই স্টাফ। এ তো সোজাসুজি তাকেই দায়বদ্ধ করছে। অফিসের আসবাবপত্র, বসার ব্যবস্থা, বি.ডি.ও.-র চেম্বার - তার উপস্থিতিতেই সব ওলোট পালোট হয়ে গেল। অমিত এতটা বোধ হয় কোনোদিন কল্পনাতেও আনতে পারে নি। সে তার সম্মান বাঁচাতে কোনোরকম ভেরিফিকেশন না করেই সব কাগজে সই করে দিল। তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো আর অপেক্ষা না করে বড়বাবুকে অনুরোধ করল, তার কাগজপত্রগুলো যেন তার বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

বছরের মাঝামাঝি সময়ে বদলীর ঝক্কি ঝামেলা অনেক। মেয়ের স্কুল পাল্টানো সম্ভব নয়। তাই পরিবারকে একা রেখে নূতন কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে হবে তাকে। আশ্চর্যের ব্যাপার, শাসকদলের প্রতিহিংসা সরকারী আদেশনামায় সেভাবে প্রতিফলিত হয়নি। তবে তাকে ব্লকে

নিয়োগের ঝুঁকি আর নিতে চায়নি। তাঁর পোস্টিং হয়েছে ছোট্ট এক মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে। শাসক দলের এক নেতা একবার জানিয়েছিলো - তাদের সরকার প্রতিহিংসা পরায়ণ নয়। তার কাজের ধরণ সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা হলেও তার কাজ করার দক্ষতা, সততা সব কিছু বিবেচনা করে তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

আবেগ প্রবণ হয়ে কোনো কিছুর সাথে ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত হয়ে পড়লে মানসিকভাবে খুব কষ্ট পেতে হয়। তা নরনারীর প্রেমই হোক বা কাজকে ভালোবাসাই হোক। সে জন্যে হৃদয়কে একটু সরিয়ে রেখে পেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি দেখা প্রয়োজন। এতে সমস্যা সৃষ্টি হলে নিজেকে বাঁচানো যায়। বিশেষত সরকারী চাকুরীতে যখন দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা রয়েছে, তখন কোনও কাজ নিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে যুক্ত করা নির্বুদ্ধিতার সামিল। অমিতের ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। তার স্বপ্নের প্রকল্প নর্থ ডিভিশনের পাকা ব্রীজ এক বড়োরকম প্রশ্ন চিহ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। প্রশ্ন উঠল, যেখানে জেলা সর্বাধিক 25 লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুমোদন করতে পারে, সেখানে ব্লক কেমন করে 60 লক্ষ টাকা খরচ করে সেতু নির্মানের সাহস দেখায়? বলাবলি শুরু হয়ে গেল, বহু অর্থ তছরূপ হয়েছে এই কাজে। পুরানো বিডিও-র বিরুদ্ধে এফ.আই.আর. হচ্ছে। আগাম অর্থের অনুমোদন ছাড়া এই ব্রীজ নির্মান নিয়ে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হল। তদন্তে এলো এক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল।

নির্মিয়মান ব্রীজের নমুনা সংগ্রহের পর তাঁরা যখন এলাকাবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, আদিবাসী চা শ্রমিকরা তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করে দিল। তাদের একটাই বক্তব্য - ওই বিডিওকে ফিরিয়ে এনে দাও। না হলে এই ব্রীজের কাজ আর শেষ হবে না। কেউ কেউ কেঁদে ফেলল - আমাদের কষ্ট একমাত্র বুঝতো ওই লোকটা। তাকেও তোরা সরিয়ে দিলি। অত্যন্ত বিব্রত দেখালো প্রতিনিধি দলকে। বুঝলো সরকারী নিয়ম-কানুনের বাইরেও অনেক কিছু আছে যা তাদের পক্ষে পরিমাপ করা দুঃসাধ্য।

৯০৬৩

আধঘন্টা লেটে শিলিগুড়ি জংশন থেকে ট্রেনটি ছাড়লো। ডুয়ার্সের ঘন জঙ্গল ভেদ করে কাঞ্চন কন্যা এক্সপ্রেস যখন এগোচ্ছে, অমিতের মনটা প্রিয় শহর দেখবার জন্য উদ্বেল। বেশ কিছুদিন বাদে আবার যেতে হচ্ছে তার পুরানো জায়গায়। নিয়ম মাফিক মহকুমা আদালতে হাজিরা দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। পুরো দিনটাই আজ তার নিজের। সে তার নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে। এখানকার জঙ্গলে প্রজাপতিরা ওড়ে, পাখিরা গান গায়। মোষের পিঠে চড়ে রাখাল অলস মুহূর্ত কাটায়। অপরিচিত লোকেরাও যেতে যেতে হেসে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। অমিতের মনে হয় যুগযুগান্ত ধরে এই মাটিতেই জন্মেছে। সে এই ডুয়ার্সেরই সন্তান। এখানকার কিছুই তার অপরিচিত নয়। বহুদিনের চেনা প্রকৃতি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। অমিত অভিভূতের মতো হাঁটছে। এক সময় দেখলো, সে দাঁড়িয়ে আছে সেই ব্রীজের মুখে, ছোট একটি বাঁক নিয়ে ব্রীজটি ঘুরে গেছে অপর পারে। অমিত ধরে আছে ব্রীজের এক প্রান্ত যেমনভাবে বাবা ধরে থাকে তার পঞ্চদশবর্ষীয়া কন্যার হাত। ফ্ল্যাশব্যাকে সমস্ত কিছু তার চোখের সামনে ফুটে উঠতে থাকলো, দেখলো নয় দশ বছরের একটি আদিবাসী কন্যা জ্বলজ্বলে চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। পিঠে তার স্কুলব্যাগ। তার মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। দেখলো তার স্বর্গীয়া মাও হাসছেন। অমিত তা হলে সবার মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছে! তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে।

ফেরার সময় মহকুমা শাসকের অফিসে দেখা হয়ে গেলো, বার কাউন্সিলের ডাকসাইটে এক নেতার সাথে। তিনি অমিতের অপেক্ষাতেই ছিলেন। বললেন - শুনলাম, আপনি অনেকদিন পর এখানে এসেছেন। আপনি ওভাবে চলে যাবার পর আমরা সকলেই খুব মর্মাহত। তাই দেখা করতে এসেছি। আমিত হ্যান্ডসেক করার পর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তিনি জানালেন - আমার মামার বাড়ী নর্থ ডিভিশনে। ওখানকার লোকের কাছে তো আপনি দেবতা। মামার কাছে আমি সব শুনেছি। সুদর্শন এই অ্যাডভোকেট ভদ্রলোক অমিতের হাত চেপে ধরলেন। বিব্রত হয়ে সে কথা হারিয়ে ফেলল। বুঝতে পারছে না, ভদ্রলোকের এই আন্তরিকতার উত্তর সে কি দেবে। অনেক সময় নীরবতা অনেক কথার চাইতেও বেশী বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। অত্যন্ত পেশাদারি চেহারার পিছনে অকৃত্রিম এক মানুষের সন্ধান পাওয়া গেল। বহু দিনের পুরানো অভিমান মুছে গিয়ে নির্মল এক প্রশান্তিতে ভরে উঠল অমিতের মন। এ আনন্দ মানুষের উপর বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার আনন্দ।

With best Compliment

from

Director

West Dinajpur Co-operative

LABOUR CONTRACT & CONSTRUCTION

&

CARRYING CONTRACT SOCIETY LTD

NARAYANPUR, BALURGHAT

GOVT. CONTRACTOR

&

GENERAL ORDER SUPPLIERS

আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া 'আবিষ্কার' ('Discovery')

সুভাষ চন্দ্র গাঙ্গুলী
(Subhasganguly@rediffmail.com)

500 বছর ধরে পশ্চিমী শ্বেতাঙ্গ হামলাকারীদের হাতে দুই মহাদেশে আবহমান কাল ধরে বসবাসকারী আদি অধিবাসীদের জাতির পর জাতির হিংস্র বিলোপসাধনের (genocide) অপর নাম

[**অবতরণিকা:** ছোটবেলা থেকে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই - যার মধ্যে পেশাগত বা 'উচ্চতর' শিক্ষালাভগত কারণে বিদেশে বসবাসকারী অনাবাসী ভারতীয়রাও (NRI-Non Resident Indian) পড়েন - উপরোক্ত 'আবিষ্কার' সংক্রান্ত যে সব ক্ষতিকরভাবে গৌরবমন্ডিত মিথ্যা ধারণার শিকার, সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সন্দেহাতীত তথ্যভিত্তিক আলোকপাতের মাধ্যমে সেই সম্পর্কিত ব্যপকতর/গভীরতর স্তরে সত্যান্বেষণে উৎসাহ সৃষ্টি করে নিজেদের মধ্যে সম্ভাব্য আদান-প্রদানের পরিণতিতে, এইসব মিথ্যা ধারণা নিজেদের মনে গোড়া থেকেই উন্মূলিত হতেও পারে, সেই আশা নিয়ে নিচের লেখাটা উপস্থিত করা হচ্ছে।

নিচের মাত্র অল্প কয়েকটা পৃষ্ঠার মধ্যে গত 500 বছর ধরে চলা জাতি-গোষ্ঠী-বিলোপকারী এই তথাকথিত দুই ভয়াবহ 'আবিষ্কারের' কোন সুগ্রথিত সামগ্রিক বৃত্তান্ত উপস্থিত করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। এই রচনা এই দুই 'আবিষ্কারের' ভয়াবহ, নিষ্ঠুর ও চরম বেদনাদায়ক পরিণতি সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত অতি সামান্য কিছু কাটা কাটা দৃশ্য-তথা-তথ্যের সমাহার মাত্র, যা থেকে পূর্ণ প্রকৃত বৃত্তান্তের দ্ব্যর্থহীন কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। তুলনীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ দেশ থেকে দেশান্তরে যাতায়াতকারী জনস্রোতের কিছু সৌন্দর্যমন্ডিত বিপরীতমুখী ইতিহাসেরও সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত সব শেষে দেবার চেষ্টা আছে।]

আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ প্রসঙ্গে প্রশ্নাতীত সত্য বিবরণ হিসেবে স্কুল-পাঠ্য বই পর্যন্ত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ও যেন এক নির্দোষ রোমাঞ্চকর অভিযানের ইঙ্গিতবাহী 'আবিষ্কার' ('Discovery') শব্দটা চূড়ান্তভাবে বিভ্রান্তিকর। আসলে অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনাগত স্তরে এই শব্দের এই ব্যবহার হ'ল পশ্চিমী মূলুকের প্রভুত্বমূলক শ্বেতাঙ্গ জাতিচেতনাজাত শব্দার্থ-বিকৃতিকরণ যা দুর্ভাগ্যক্রমে আজও চলছে। এই শব্দটা এভাবে ব্যবহারের পিছনের লুকানো উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের জানা ইতিহাসে ব্যপকতম (মহাদেশীয়) স্তরে ও সব চেয়ে দীর্ঘকাল ধরে (পাঁচশ বছর) আক্রমণ-তথা-জাতিগত বিলোপসাধনের (genocide) নির্মম সত্যকে আড়াল করে রাখা। অথচ রক্ত হিম করা এই ভয়াবহ সত্যটা এমন কোন এক কুয়াশাচ্ছন্ন বহু অতীত যুগের সত্য নয়, যা জানার জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সে সময়ের নানা দলিল-দস্তাবেজে লুকোনো অর্থ ঘেঁটে-ঘুঁটে পুনরুদ্ধার করার দরকার পড়তে পারে। এ হ'ল দাবীকৃত 'মানবিকতাবাদ' ও 'বৈজ্ঞানিক' পথে সত্য সন্ধানের নব-উদ্বোধনের কাল হিসেবে বহু-বন্দিত ইউরোপীয় 'রেঁনেসা' - যুগের অর্থাৎ গত 500 বছরের ইতিহাসের অংশ, যার তথ্যাদি বহুল পরিমাণে নথিবদ্ধ, সহজলভ্য ও সে কারণে আগ্রহী যে কারুর নাগালের মধ্যে রয়েছে।

নিজের কাছে অজানা/অশোনা ছোট /বড় কোন স্থল-ভূমি বা অঞ্চলে হঠাৎ কেউ হাজির হলে সাধারণভাবে 'আবিষ্কার' কথাটা ব্যক্তিগত স্তরে কোন সাময়িক বিস্ময়বোধ প্রকাশের একটা শব্দ হিসেবে ব্যবহার হতেই পারে। সেটার মধ্যে কোন 'দাবী'র গন্ধ নেই। কিন্তু তার বাইরে যদি এই শব্দ 'দাবী' হিসেবে ঘোষিত হতে থাকে তো তা আদৌ কোন অর্থ বহন করতে পারে এক মাত্র যদি তথাকথিত 'আবিষ্কার'-কালে সে অঞ্চলে জন বসতি না থেকে থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যেই মনুষ্য জাতি অধ্যুষিত কোন অঞ্চলে আর কোন অঞ্চলের

মানুষ প্রথম পৌঁছে সেই পৌঁছানটাকে যদি 'আবিষ্কার' বলে দাবী করতে থাকে ও সে দাবী তাদের নিজেদের দেশে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয় তো কার্যত তার অর্থ দাঁড়ায় যে মানুষরা ইতিমধ্যেই বাস করছিলেন তারা হয় মনুষ্যেতর কোন প্রাণী বা প্রাণের বিবর্তনে ধারায় মনুষ্য জাতির সেই রকম কোন পূর্বপুরুষ (যেমন 'নিয়ান্ডার্থাল'- Neanderthal) যারা এখনও আজকের অর্থে 'মনুষ্য জাতির' (homo sapiens) অংশ হয়ে উঠতে পারেনি।

আমেরিকা 'আবিষ্কার'

উপরে বর্ণিত শ্বেত জাতিদম্ভোদ্ভুত ভাবনার ছাঁদের আরও একটা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে 'আবিষ্কারের' বহু দিন পর পর্যন্ত (অন্ততঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কার্ল মার্কস-এর লেখাতেও) এই প্রাক জনঅধ্যুসিত 'আবিষ্কৃত' মহাদেশকে প্রায় একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে বলা হ'ত 'নতুন দুনিয়া/পথিবী' (New World)? এটা কার্যত এই প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া যে কার কাছে 'নতুন দুনিয়া/পৃথিবী'? নিশ্চয় সেখানে বসবাসকারী আদি অধিবাসীদের কাছে নয়! তাদের কাছে আক্রমনকারী-তথা-হত্যাকারী বহিরাগত শেতাঙ্গ দের দেশই ছিল নতুন দুনিয়া/পৃথিবী', বা আরও ঠিক করে বললে 'আক্রমনকারী-তথা-হত্যারীদের নতুন দুনিয়া/পৃথিবী'!

এ ছাড়াও আমেরিকার ক্ষেত্রে সেখানকার আদি অধিবাসীদের 'রেড ইন্ডিয়ান' নামে (অর্থাৎ যে নামে তারা নিজেদের পরিচয় দেয় না) অবিহিত করার - অসচেতনতাজাত ও সে কারণে নির্দোষ - দুনিয়াজোড়া যে চল তা'ও একাধারে বিভ্রান্তিকর ও নিহিতার্থের (অনুচ্চারিত) দিক থেকে শ্বেতাঙ্গ -জাতিদর্পী-চেতনাজাত এই নামাকরণ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর পক্ষে অবমাননাকর। এই নামাকরণের মধ্যে যেন একটা শিং/পালক গোঁজা অজানা উদ্ভটত্বের গন্ধ মাখা, যা 'প্রায়' মানুষ কিন্তু 'ঠিক' মানুষ নয় এবং/অথবা একাধারে শত্রুমনোভাবাপন্ন ও নির্বোধ জাতিগোষ্ঠীর ইঙ্গিত দিচ্ছে। এ যেন তথাকথিত 'আবিষ্কারক' ক্রিষ্ঠোফার কলম্বাসের (জন্মসূত্রে ইতালির মানুষ) ভ্রান্তিমূলক ধারণাকে অমরত্ব দানের জন্য সেখানকার আদি অধিবাসী 'আদিম বর্বর/হিংস্র' ('primitive savage') বর্ণিত জনগোষ্ঠীর গায়ে সেই ভ্রান্তিজাত নামের ('ইন্ডিয়ান') এক 'অমরত্বের' ছাপ মেরে দেওয়া। স্পেনের রাণী ইসাবেল্লার আর্থিক সহায়তায় ভারতে পৌঁছান'র সমুদ্র-পথের সন্ধানে স্পেন-এর পশ্চিম উপকূল থেকে আগষ্ট 3, 1492 তারিখে তিন জাহাজে (নিনা, পিন্টা, সান্টা মারিয়া - বাষ্পীয় শক্তি আবিষ্কারের আগের দাঁড় চলিত জাহাজ) যাত্রা শুরু করে আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে পশ্চিমাভিমুখে দাঁড় বেয়ে চলার পর, অক্টোবর 12, 1492 সালে প্রথম যে অজানা স্থলভূমিতে সেনাপতি কলম্বাস তাঁর দল বল সহ অবতরণ করেন তা হ'ল আজকের পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত এল সালভাডর (Elsalvador) বা ব্রাহম (Bahams) দ্বীপ। এবং একেই তিনি তাঁর ইপ্সিত লক্ষ্য ভারত বলে ধরে নেন, যে বিশ্বাস স্পেনে তাঁর মৃত্যুর দিন (মে 20, 1506, বয়েস 54 বছর) পর্যন্ত অটুট ছিল। কাজে কাজেই সেখানকার আদি অধিবাসীরা 'ইন্ডিয়ান' আর তার দ্বীপগুলি 'ইন্ডিস'! ভারতে পৌঁছান'র জন্য সমুদ্র পথের সন্ধানে কলম্বাসের এই যাত্রার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমির একটু ইঙ্গিত নিচের বিবরণ থেকে পাওয়া যাবে:

পঞ্চদশ শতাব্দীতে অনেকগুলো ঘটনা মিলে আবিষ্কারের অভিযানে বেড়িয়ে পড়ার এক মহা যুগের ঘন্টা বেজে উঠল। এর মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল গোটা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চল তুর্কীদের জয় করে নেওয়া। এর ফলে ব্যবসার জন্য ও দলবদ্ধ ভাবে ইউরোপীয়দের ভারত ও চীনে যাবার স্থলপথ বন্ধ হয়ে গেল।....

.....ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে স্থল পথে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যাবসা-বাণিজ্যই তখনকার কালে এক মাত্র গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যাবসা-বাণিজ্য ছিল। রীতিমত যে মুনাফা তা ঐ বাণিজ্য থেকেই আসত। কাজেই পঞ্চদশ শতকের গোড়া থেকেই উদ্যোগী রাজা-রাজড়া ও ব্যবসায়ীরা প্রাচ্যে যাবার এমন সমুদ্রপথ খোঁজার চেষ্টা করতে থাকে যাতে মুসলমানদের পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়।

.....1492 সালে স্পেন....এক স্বৈরতান্ত্রিক, "আধুনিক" জাতীয়-রাষ্ট্র হয়ে ওঠে।...যে বস্তুর চূড়ান্ত অভাব এই নতুন রাষ্ট্রের ছিল তা হ'ল সোনা।

.....কলম্বাস ও তার পরে যেসব পররাজ্যগ্রাসীরা আসতে শুরু করল তাদের জন্য মঞ্চ তৈরী হ'ল।

[*Columbus: His Enterprise* by Hans Koning, 1976, Monthly Review Press]

1492-এর পরে কলম্বাস আরও তিনবার 'আবিষ্কৃত' স্থলভাগ ও স্পেনের মধ্যে সমুদ্রপথে যাতায়াত করেন। 13 অক্টোবর , 1493, 30 মে 1498 ও শেষ যাত্রা 11 May 1502 সালে, যার শেষে তিনি মূল দুই মহাদেশের (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা) সংযোগস্থলে (আজকের 'পানামা' অঞ্চল) পৌঁছেছিলেন। 1492 সালের এই উদ্বোধনী যাত্রাই প্রথমে স্পেন ও পরে অন্য ইউরোপীয় শক্তিগুলির তরফ থেকে দফায় দফায় অসংখ্যবার ঝাঁপিয়ে পড়ার পথ খুলে দেয় — প্রথমে দ্বীপগুলির উপরে ও পরে মহাদেশীয় মূল ভূমিতে। উদ্বোধন হয় 500 বছর ব্যাপী গণ-হত্যা-তথা-জনগোষ্ঠীবিলোপের (genocide) পর্বের, যার শিকার ওই 'আবিষ্কৃত' বিশাল ভূখন্ডের আদি অধিবাসীরা।

'আবিষ্কৃত' স্থলভূমিতে প্রথম পদার্পনের দিন (শুক্রবার 12 অক্টোবর, 1492) অজানা-অচেনা আগন্তুক কলম্বাস ও তার দলবলকে কিভাবে দ্বীপবাসীরা গ্রহণ করেছিলেন তার ছবি কলম্বাসের নিজস্ব দিনলিপিতে (যেখানে কলম্বাস নিজেকে 'অ্যাডমিরাল' নামে পরিচিত করে তৃতীয় পুরুষে নিজের কথা বলছেন) যেভাবে পাওয়া গেছে তার অংশবিশেষ:

অনতিবিলম্বে দ্বীপে বসবাসকারী অনেক এসে জড় হ'ল। ...আমি জানতাম যে তাদেরকে ভালবাসার মধ্য দিয়ে—জবরদস্তি করে নয়—সহজেই মুক্ত করে আমাদের পবিত্র বিশ্বাসে ধর্মান্তকরণ করা যাবে। যাতে আমরা গভীর বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারি তাই তাদের অনেককে আমরা লাল টুপি, গলায় পরার জন্য কাঁচের পুঁতির মালা ও এরকম নাম মাত্র দামের আরও নানা জিনিষ দিলাম। এতে তারা খুব খুশী হ'ল এবং আমাদের এমন বন্ধু হয়ে উঠল যে তা দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবার মত। পরে তারা কাকাতুয়া, পশমের সূতোর বান্ডিল, ও আরও নানা সব জিনিষ নিয়ে সাঁতরে জাহাজের নৌকোগুলোর কাছে চলে এল। আমরা কাঁচের পুঁতির মালা, ছোট ঘন্টা এসবের সাথে তাদের আনা জিনিষগুলো বিনিময় করে নিলাম। অতি স্বচ্ছন্দে তারা সেগুলো নিল ও অত্যন্ত সৌহার্দের সাথে তাদের যা ছিল তা দিয়ে দিল। আমার মনে হ'ল এরা এমন এক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ, যারা সব দিক থেকে দরিদ্র। মায়েরা যখন তাদের জন্ম দিয়েছিল তখনকার মতই তারা নগ্ন। মেয়েরাও তাই, যদিও আমি এক জন তরুণীর বেশী দেখিনি।

—কলম্বাসের প্রথম যাত্রার দিনলিপি (Journal of the First Voyage of Columbus, WISCONSIN HISTORICAL SOCIETY DIGITAL LIBRARY AND ARCHIVES, http://www.americanjourneys.org/pdf/AJ-062.pdf)

ওই একই দিনলিপিতে উপরেরই ধারাবাহিকতায় আরও একটু অংশ:

অস্ত্র বলতে তাদের কিছু নেই ও সেসবের সাথে তারা পরিচিতও নয়। যেমন, আমি তাদের যখন তরোয়াল দেখালাম তখন তার ফলা তারা অজ্ঞতাবশতঃ মুঠির মধ্যে জড়িয়ে ধরে নিজেদের হাত কেটে ফেলল। লোহা তাদের নেই; তাদের বর্শা লোহা-মুক্ত ও লাঠির বেশী কিছু নয়, যদিও কোন কোনটার শেষে মাছের হাড় আছে।

আবার মজার কথা হ'ল ওই একই দিনলিপির শুরুতে রয়েছে:

অ্যাডমিরাল দুই ক্যাপ্টেন.....ও অন্যদের ডাক দিলেন ও তারা পারে লাফিয়ে পড়ল। ডাক দিলেন গোটা সামুদ্রিক বাহিনীর কার্যাধ্যক্ষ এসকোভেদো (Escovedo) ও সেজোভিয়া'র (Segovia) সানচেজকে (Sanchez) এবং বললেন তারা বিশ্বস্ততার সাথে সাক্ষ্য বহন করবে যে তিনি তাঁর প্রভুদের অর্থাৎ রাজা ও রাণীর নামে এই দ্বীপের দখল নিলেন ও প্রয়োজনীয় ঘোষণা করলেন এবং সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হ'ল।

কলম্বাস-এর নিজের দিনলিপির উপরের প্রথম দুই টুকরোর সাথে শেষ টুকরোটি এক সাথে মিলিয়ে পড়লে অনেকটা এরকম এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে: এক দল অচেনা বহিরাগত ভিনদেশী লোক, পরম অতিথিপরায়ন এক পরিবারের বাড়ীর খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে বাড়ীর লোকেদের কাছ থেকে নতুন অতিথি হিসেবে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেল। উভয় পক্ষের মধ্যে উপহার বিনিময়ও হ'ল। তারপর বহিরাগতদের দল-প্রধান হঠাৎ ঘোষণা করল—"আমার দেশের রাজা/রাণীর নামে আমরা এখন থেকে এই বাড়ী জমি সব কিছুর দখল নিলাম।"

সালভাডর বা ব্রাহম দ্বীপে পৌঁছানর অল্প দিনের মধ্যেই দূরে কাছে আরও অনেক দ্বীপে (কিউবা, হিস্পানলা

ইত্যাদি—এ সব নামই বহিরাগত 'আবিষ্কারক'দের দেওয়া) গিয়ে অবশেষে 16 জানুয়ারী, 1493 কলম্বাস বাহিনীর স্পেনের দিকে ফেরৎ যাত্রা শুরু হ'ল। 'আবিষ্কৃত' ভূমির স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পর্কে নিজের দিনলিপিতে উপরের বর্ণনার সাথে সঙ্গতি রেখেই ফেরার পথে জাহাজেই কলম্বাসেরই লেখা এক চিঠিতে নিচে ছবি পাওয়া যায়:

.....যখন তারা অনুভব করে যে তারা নিরাপদ, তখন সমস্ত ভয় দূরে ঠেলে দিয়ে তাদের হাব-ভাব সরল ও বিশ্বস্ত, এবং তাদের যা কিছু আছে সে ব্যাপারে উদার হস্ত। তাদের কাছে আছে এমন কিছু কেউ চাইলে তারা কখনও দিতে অস্বীকার করে না; এমনকি নিজেরাই আমাদেরকে চাইতে বলে। তুচ্ছ জিনিষের বিনিময়ে তারা মূল্যবান জিনিষ দেয়। এমনকি, বিনিময়ে ওই অতি সামান্য পেলেই বা কিছু না পেলেও সন্তুষ্ট বোধ করে। আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম দিতে হলে কেবল ছোটো-খাটো ও মূল্যহীন জিনিষই তাদের দিতে হবে; যেমন কুট্টি থালা বাটী বা কাঁচের টুকরো বা একই ভাবে চাবি বা জুতোর ফিতের ডগা। যদিও পাওয়ার পর তাদের কাছে এসব দুনিয়ার সব চেয়ে সুন্দর হীরে-জহরত পাওয়ার মত লাগছিল।

— কলম্বাসের চিঠি, সমুদ্রের উপর ফেব্রুয়ারী 1493 সালে লেখা হয়েছিল ও যা পরে স্পেনের রাজ দরবারে পাঠান হয়েছিল (http://www.amstudy.hku.hk/columbusletter.html)

কিন্তু কলম্বাসবাহিনীর দ্বিতীয় যাত্রা ও তার পর থেকেই দ্বীপবাসীদের সম্পর্কে উপরে উদ্ধৃত চূড়ান্ত অনুকূল মনোভাবের চূড়ান্ত উল্টোমুখী পরিবর্তন শুরু হয়। আমেরিকা মহাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে এখনকার মার্কিন দেশের প্রাতিষ্ঠানিক (সরকার, শিক্ষাবিভাগীয় সরকারী/বেসরকারী কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি) নানা ধারণাকে প্রশ্নকারী চূড়ান্ত সংখ্যালঘু মার্কিন নাগরিকদের এক জনের লেখা থেকে জানা যায়:

.....আমেরিকার আদি জনসমষ্টির দিক থেকে কলম্বাসের দ্বিতীয় অভিযানই ছিল সম্ভবতঃ সব চেয়ে গুরুত্বের। এই পর্ব থেকেই পরের শতাব্দীগুলির জন্য ঘটনার ছাঁদ তৈরী হয়ে গেল। ঔদার্য ও ছলাকলাহীন/নিষ্পাপ স্বভাবের জন্য যাদের এ পর্যন্ত প্রশংসা করে আসা হচ্ছিল এখন থেকে তাদের হিংস্র/বর্বর (savages) বলা শুরু হ'ল। ভ্রাতৃত্ব ও ধর্মান্তরণের বদলে কথা শুরু হ'ল ক্রীতদাসত্ব ও সোনা নিয়ে। জাতিগত নতুন ছাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

—কলম্বাস: হিজ এন্টারপ্রাইজ (*Columbus: His Enterprise* by Hans Koning, 1976 Monthly Review Press)

বার্টোলোমে দে লা কাসা (Bartolome de Las Casas) নামে কলম্বাসের চেয়ে বয়েসে ছোট কিন্তু একই সাথে সমসাময়িক স্পেন দেশেরই এক জন খৃশ্চীয়ান ধর্মযাজকের (যিনি 'আবিষ্কারের' পরে 50 বছর ধরে 'আবিষ্কৃত' ভূমিতে ভ্রাম্যমান ছিলেন) নিচে উপস্থিত করা বর্ণনা থেকে, 'পবিত্র বিশ্বাসে ধর্মান্তকরণ'-এর যে 'মহান' আদর্শের ঘোষণা কলম্বাসের দিনলিপির উপরে উপস্থিত করা প্রথম উদ্ধৃতিতে রয়েছে তাকে কাজে পরিণত করার কিছু নমুনা পাওয়া যাবে। এই বর্ণনার সময়কাল 'আবিষ্কারের' (1492) 60 বছর পরে:

এক হাজার চারশ বিরানব্বই সালে ইন্ডিজ আবিষ্কৃত হয়। পরের বছরেই বিশাল সংখ্যায় স্পেনীয়রা সেখানে হাজির হয়। সুতরাং প্রথম বসতিকারীদের পর ঊনপঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। প্রথম দ্বীপের নাম হিস্পানিওলা....তার সব দিক ঘিরে আরও অনেক দ্বীপ আছে, কোনটা খুবই বড়, আবার কোনটা খুবই ছোট। এবং আমরা নিজের চোখে দেখেছি এ সবগুলিই আদি অধিবাসীদের দ্বারা ঘন বসতিপূর্ণ। ...প্রতি দিনই নতুন নতুন অঞ্চলে অভিযান চলছে। ...

.....সীমাহীন বিশ্ব জোড়া সমস্ত মানব জাতির মধ্যে এই মানুষরা হ'ল সব চেয়ে বেশী দুষ্টবুদ্ধি ও দ্বিচারিতা মুক্ত। ....স্বভাবগতভাবেই তারা চূড়ান্ত নম্র, ধৈর্যশীল এবং শান্তিকামী.....এবং যেহেতু তারা এত দুর্বল ও বাধ্য সেহেতু তারা কঠোর পরিশ্রম সহ্য করতে কম সমর্থ ও তাড়াতাড়ি মারা যায়। ....

.....আর এই নিরীহ মানুষদের জগতে হাজির হ'ল স্প্যানিয়ার্ডরা এবং এসেই তারা অনেক দিন ধরে অনাহারী, ক্ষুধার্ত, লোভী বাঘ, নেকড়ের মত বন্য জন্তুসুলভ আচরণ করতে শুরু করল। এবং আজ পর্যন্ত অর্থাৎ গত চল্লিশ বছর ধরে স্প্যানিয়ার্ডরা অন্য আর কোনও ভাবেই আচরণ করেনি কারণ এখনও তারা ক্ষুধার্ত জন্তুর মত কাজ করে যাচ্ছে - হত্যা, সন্ত্রাস, অত্যাচার ও ভূমিসন্তানদের ধ্বংস করে দেওয়া। এবং এ সবই এরা করছে নিষ্ঠুরতার আশ্চর্যজনক, বিচিত্র ও

নানা কিসিমের এমন সব চূড়ান্তরকম নতুন নতুন পদ্ধতিতে, যা আগে কখনও দেখা বা শোনা যায়নি। এসব এমন এক মাত্রায় পৌঁছেছে এক সময়ে এত বিশাল সংখ্যায় (আমার হিসেব মত তিরিশ লক্ষেরও বেশী) জন অধ্যুষিত এই হিস্পাআনওয়ালা দ্বীপে বড় জোর দু'শ জন টিকে আছে।

—ইন্ডিজে ধ্বংসলীলা, বার্টোলোমে দে লা কাসা, 1552 (*THE DEVASTATION OF THE INDIES: A BRIEF ACCOUNT* by Bartolome de Las Casas 1552)

পাওয়া সব চেয়ে বেশী অপূরণীয় লোভ ও উচ্চাশাই তাদের শয়তানীর কারণ।

অঞ্চলের উপর নির্ভর করে এই সোনা সংগ্রহ নানা ভাবেই করান হত। একটা অঞ্চলে সংগ্রহের এই ছবি পাওয়া যায়:

কাল্পনিক সোনার খনির প্রদেশ সিবাও-এর (Cibao) প্রতিটি পুরুষ ও মহিলা এবং 14 বছর বা তার চেয়ে বেশী বয়েসের ছেলে বা মেয়েকে স্পেনীয়দের জন্য সোনা সংগ্রহ করতে হ'ত। মাপ হিসেবে স্পেনীয়রা কুট্টি

যেসব দ্বীপবাসীরা সোনার গুঁড়োর নির্দিষ্ট করে দেওয়া পরিমাণ জমা দিতে পারে নি, স্প্যানিয়ার্ডরা তাদের হাত কেটে দিচ্ছে।
(বার্টোলোমে দে লা কাসা'র আঁকা ছবি, 1619)

'পবিত্র বিশ্বাসে' 'ধর্মান্তকরণের' এই নমুনার পিছনে আসলে কি মতলব কাজ করছিল তা উপরোদ্ধৃত অংশগুলি ধারণকারী লা কাসা-র ওই একই বিবরণীতে (*THE DEVASTATION OF THE INDIES: ABRIEF ACCOUNT*) পাওয়া যাচ্ছে:

এত অগুন্তি মানুষকে হত্যা করার পিছনে খৃস্টানদের যে একটা চূড়ান্ত লক্ষ্য, তা হ'ল সোনা হস্তগত করা ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে ধন-সম্পত্তিতে ফুলে-ফেঁপে ওঠা.....এটা মনে রাখা দরকার যে দুনিয়াতে এ পর্যন্ত দেখতে কুট্টি যেসব কৌটো জাতীয় তুচ্ছ জিনিষ প্রথম আগমনের সময় (দ্বীপবাসীদের চোখে "যেন স্বর্গ থেকে") বিলিয়েছিল সেগুলোই ব্যবহার করত। প্রতি তিন মাস অন্তর প্রতিটি আদি বাসিন্দাকে ঐ রকম এক কৌটো ভর্তি সোনার গুঁড়ো আনতে হ'ত।....কোন আদি বাসিন্দা যখন তার এই উপঢৌকন কোন সশস্ত্র সান্ত্রী ঘাটিতে নিয়ে আসত তখন তাকে সে মাসের ছাপ দেওয়া একটা তামার চাকতি দেওয়া হ'ত, যা তাকে গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হ'ত। সেটা থাকলে পরের তিন মাসের জন্য তারা নিরাপদ। এই চাকতি ছাড়া কাউকে পাওয়া গেলে

তার দুই হাত কেটে দিয়ে হত্যা করা হ'ত। পুরোন স্পেনীয় ছবি রয়েছে যাতে...এটা দেখান হচ্ছে। সেখানে কোন সোনার খনি ছিল না...। কাজেই তাদের এক মাত্র আশা ছিল সারা দিন ধরে নদীর স্রোতের বসে নুড়ী ধুয়ে ধুয়ে সোনার গুঁড়ো ছেঁকে বার করা। এ কাজটা প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি। কিন্তু যারা পাহাড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করত তাদেরকে নিয়ম করে কুকুর লেলিয়ে দিয়ে পাকড়াও করে হত্যা করা হত।....

— কলম্বাস: হিজ এন্টারপ্রাইজ (*Columbus: His Enterprise* by Hans Koning, 1976, Monthly Review Press)

এবার আমরা আবার লা কাসার দেওয়া উপরোল্লিখিত বিবরণের অন্য কিছু অংশে ফিরে যাব:

.....আদি জনগোষ্ঠীর মানুষজন এত নিরীহ ও ধৈর্যশীল, এত সহজে বশে চলে আসে যে আমাদের স্পেনীয়রা তাদের পশুর মতর চেয়ে বেশী কিছু ভাবে না। তবে আমার 'পশুর মতর চেয়ে' বলা উচিত হয়নি, পশুদের সাথেও তারা খানিকটা ইজ্জত দিয়ে আচরণ করে। বদলে আমার বলা উচিত খোলা ময়দানে ছড়ান বিষ্ঠার মত। .....খ্রীষ্টানরা তাদের উপর অগুন্তি নিষ্ঠুর আক্রমনের আগে পর্যন্ত স্থানীয় অধিবাসীরা স্পেনীয় খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে কিচ্ছু করেনি। কারণ স্থানীয়রা শুরুতে স্পেনীয়দের স্বর্গ থেকে পাঠান দেবদূত বলে ভাবত। স্পেনীয়রা যখন থেকে তাদের বিরুদ্ধে হিংস্র হয়ে উঠে খুন, লুটপাট ও অত্যাচার শুরু করল, একমাত্র তখনই আদি অধিবাসীরা স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শুরু করল।

কিন্তু এই "রুখে দাঁড়ান" ছিল একেবারেই অকার্যকর। কারণটা কলম্বাসের দিনলিপি থেকে ইতিমধ্যেই উদ্ধৃত নিচের টুকরোটুকুর দিকে আর এক বার তাকালেই বোঝা যাবে:

অস্ত্র বলতে তাদের কিছু নেই ও সে সবের সাথে তারা পরিচিতও নয়। যেমন, আমি তাদের যখন তরোয়াল দেখালাম তখন তার ফলা তারা অজ্ঞতাবশতঃ মুঠির মধ্যে জড়িয়ে ধরে নিজেদের হাত কেটে ফেলল। লোহা তাদের নেই; তাদের বর্শা লোহা-মুক্ত ও লাঠির বেশী কিছু নয়, যদিও কোন কোনটার শেষে মাছের হাড় আছে।

এই "রুখে দাঁড়ান"-র চেষ্টার ফল কি হয়েছিল তার কিছু ছবি লা কাসা'রই ইতিমধ্যে উল্লিখিত বিবরণী (*THE DEVASTATION OF THE INDIES: A BRIEF ACCOUNT*) থেকে উদ্ধৃত নিচের টুকরোটাতে পাওয়া যাবে:

ঘোড়া, তরোয়াল ও বর্শা নিয়ে খৃষ্টানরা এদের বিরুদ্ধে গণহত্যা ও বিকট সব নিষ্ঠুরতা শুরু করল। .....শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভবতী নারী, শিশুশয্যায় শায়িত নারী, এদের কাউকেই ছাড়ল না। শুধু তরোয়াল দিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আলাদা করে দেওয়া নয়, যেন পশু-হত্যা কেন্দ্রে ভেড়াদের মত টুকরো, টুকরো করে ফেলতে লাগল। ....মায়ের বুক থেকে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের পা পাকড়ে ধরে ছিনিয়ে নিয়ে পাহাড়ের গায়ে তাদের মাথা আছড়ে দিত বা হাত ধরে ছিনিয়ে নিয়ে নদীতে ফেলে দিয়ে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে চীৎকার করে বলত, "ওখানে সব সিদ্ধ হ - শয়তানের বাচ্চা!" .....তারা নিচু চওড়া ফাঁসীকাঠ বানাতো, যেখানে ঝোলান লোকেদের পা প্রায় মাটি ছুঁয়ে যেত এবং এক সাথে তের জন করে ঝুলিয়ে (আমাদের উদ্ধারকর্তা ও তাঁর তের জন শিষ্যদের স্মৃতিতে!) জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে পায়ে আগুন দিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারত।

লা কাসার এই সংক্রান্ত বিবরণীর সামান্য কিছু অংশই উপরে উপস্থিত করা হ'ল। কলম্বাসের দ্বিতীয় অভিযান শেষে দ্বীপবাসীদের স্পেনে চালান করে ক্রীতদাস ব্যবসা শুরু করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, কারণ অর্ধেক সমুদ্রপথেই মারা যায় ও বাকীরা স্পেনে পৌঁছবার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই। কিন্তু দখল করা দ্বীপগুলির (আজকের হাইতি, হিস্পানিওলা, সালভাদর ইত্যাদি) সর্বত্র স্পেনীয়দের নিজ নিজ তালুক প্রতিষ্টার মধ্য দিয়ে আদি অধিবাসীদের নিজ ভূমিতেই দাসত্ব শুরু হ'ল। এই সব তালুকে জমির সাথে সাথে সেই জমিতে বসবাসকারী আদি অধিবাসীরাও দখলকারী স্পেনীয়দের সম্পত্তি হয়ে গেল। লা কাসার উপরোক্ত একই বৃত্তান্ত থেকে এই বাস্তবতার একটা ছবি পাওয়া যায়।

যুদ্ধ ও হত্যালীলার শেষে.... যে আদি অধিবাসীরা বেঁচে গেল তাদেরকে খ্রীষ্টানদের মধ্যে দাস হিসেবে বিতরণ করে দেওয়া হ'ল। খ্রীষ্টানদের গুরুত্ব অনুযায়ী কেউ পেল তিরিশ জন, কেউ চল্লিশ আবার কেউ বা একশো-দুশো। ...ছুতোটা হল এই দাস হিসেবে বিতরিত অধিবাসীদের খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে দীক্ষিত করা হবে। ....এবং এই খ্রীষ্টানরা আদি অধিবাসীদের আত্মার যত্ন এই ভাবে নিতে শুরু করল: পুরুষদের অসহনীয় শ্রমসাধ্য কাজ সোনা খোঁড়ার জন্য খনিতে পাঠাল আর নারীদের পাঠাল বিশাল বিশাল কৃষিক্ষেত্রে

জমি চাষ ও ফসল কাটার জন্য, যে কাজ এক মাত্র বলবান পুরুষদের উপযুক্ত। মেয়ে ও পুরুষ কাউকেই লতাপাতা বা শুঁটি জাতীয় খাবার—যার পুষ্টিগুণ অতি সামান্য—ছাড়া আর কিছুই দিত না। দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মায়েদের স্তনের দুধ অচিরেই শুকিয়ে গেল ও অল্প দিনের মধ্যেই শিশুরা শেষ হয়ে গেল। ক্ষুধা ও অসীম ক্লান্তি থেকে পুরুষরা খনিতে ও নারীরা ক্ষেতে মরতে শুরু করল। এবং এভাবেই ঘন জনবসতি পূর্ণ দ্বীপগুলি জনশূণ্য হতে শুরু করল।

—ইন্ডিজে ধ্বংসলীলা, বার্টোলোমে দে লা কাসা, 1552 (*THE DEVASTATION OF THE INDIES: A BRIEF ACCOUNT* by Bartolome de Las Casas 1552)

আবারও আদি অধিবাসীরা এই চাপিয়ে দেওয়া গবাদী-পশুসুলভ পরিশ্রম সহ্য করতে পারল না। 1540 নাগাদ তারা শেষ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আফ্রিকা থেকে ধরে নিয়ে আসা বন্দীরা ধীরে ধীরে স্থানীয় দাসদের জায়গা নিতে শুরু করেছে।

উপরের তথ্যাদি/বর্ণনা থেকে এটা পরিষ্কার যে তাঁর স্থান ও কালের পটভূমিতে কলম্বাস এমন কিছু করেননি যা চরিত্রের দিক থেকে চূড়ান্ত অর্থে ব্যক্তিগত খেয়াল খুশির প্রতিফলন ও ব্যতিক্রমমূলক। যেন এক মুনি ঋষিদের রাজত্বে এক একক দুর্বৃত্ত। বরং তিনি ছিলেন সে সময়কালের ইউরোপীয় ক্রমশক্তিশালী হয়ে ওঠা বাণজ্যিক মহল বা শিবিরের মানসিকতার অন্যতম এক প্রতিনিধি, যে মানসিকতা তাকে ঠেলে উদ্দিষ্ট দিকে নিয়ে যাচ্ছিল এবং যার সাথে অনতিবিলম্বেই বহুসংখ্যায় তার সমমনোধর্মী স্পেনীয়রা যোগ দিতে শুরু করে ওই দ্বীপমালার অধিবাসীদের অস্তিত্ব বিপন্ন বা বিলুপ্ত করার দিকে নিয়ে যায়। আর ইউরোপ থেকে এই 'আবিষ্কার' অভিযানের পঞ্চদশ শতকীয় ইউরোপীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমির একটা ইঙ্গিত উপরেই শুরুতেই অতি সংক্ষেপে উপস্থিত করা হয়েছে। কাজেই এটা নেহাতই একটা ঘটনাচক্র বলা যায় যে কলম্বাসই সেই ব্যক্তি হয়ে দাঁড়াল যে দলে দলে ইউরোপীয় হানাদারদের হাতে এই মহাদেশীয় স্তরে জাতিবিলোপকারী পাইকিরি গণহত্যার উদ্বোধন করল। এই হত্যা ও বিলোপলীলার বৃহত্তম অংশের অপরাধী, 'আবিষ্কারক' কলম্বাস নয়, তার সাথে ও তার পরে আসা স্পেনদেশীয় অন্য কর্মাধ্যক্ষরা। কাজেই উদ্দেশ্যটা এখানে কলম্বাসের ব্যক্তি-চরিত্রের কোন অন্ধকার দিকের উপর নজর দেওয়া নয়। উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে সামাজিক শক্তিগুলি এই মহাদেশীয় হত্যালীলার জন্ম দিয়েছিল তার দিকে তাকান। এই শক্তিগুলির ঠেলায় এই কলম্বাস না হলেও আর কোন 'কলম্বাস' জুটে যেত। কিন্তু একই সাথে এটাও খেয়াল করা দরকার যে এক মহাদেশীয় গণহত্যার উদ্বোধকের বদলে তার ভূমিকা বা ভাবমূর্তিকে এক 'আবিষ্কারক' হিসেবে গৌরবান্বিত আলোতে উপস্থিত করার চলে আসা শিক্ষা ও সরকারী ঐতিহ্যের (সংশ্লিষ্ট মহাদেশ ও তার বাইরে) মিথ্যাচারকে সংশোধন করে সহজলভ্য সমসাময়িক তথ্যের আলোতে — যে তথ্যাদি আড়ালে ঠেলে দেওয়া হয়—এই 'আবিষ্কার' ও তার পরের অবস্থার গ্রহণযোগ্য মূল্যায়ন দুনিয়ার সবার কাছে পৌঁছানটা অত্যাবশ্যক; কারণ এটা দুনিয়ার কোন এক অপরিচিত কোণে ঘটে যাওয়া বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, যাকে তেমন গুরুত্ব না দিলেও চলে।

স্পষ্টতার খাতিরে, আংশিক পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়েও মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে উপরে উপস্থিত করা কলম্বাস-তথা-স্পেনীয়দের কাণ্ডকারখানা হচ্ছে মূল আমেরিকা (উত্তর ও দক্ষিণ) মহাদেশের উত্তরাংশের পশ্চিমে কারিবিয়ান সাগরে আজকের 'পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপমালা'কে ('ওয়েষ্ট ইন্ডিজ'—West Indies) ঘিরে। কলম্বাস যেটা আবিষ্কার করেছিলেন তা হ'ল প্রথমে বাহাম দ্বীপপুঞ্জ (Bahamas archipelago) ও তার পরে সেই দ্বীপটি যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'হিস্পানিওলা' (Hispaniola), যা এখন হাইতি (Haiti) ও 'ডোমিনিকান রিপাব্লিক' (Dominican Republic) এই দুই নামের দেশে বিভক্ত। তাঁর পরবর্তীকালের অভিযানে তিনি আরও দক্ষিণে অর্থাৎ মধ্য আমেরিকায় যান। আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি তিনি কখনও পৌঁছাননি।

আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা নিয়ে তৈরী মূল আমেরিকা মহাদেশের উত্তরাংশ সংক্রান্ত গণহত্যাকান্ডের শুরু মোটামুটি সপ্তদশ শতকের শুরুর দিক থেকে। এটা শুরু হয় ইংরেজীভাষী শ্বেতাঙ্গ হানাদারদের (আজকের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের অধিকাংশের পূর্বপুরুষ, যাদের কর্মকান্ডের দায় অবশ্যই এত দূরের আজকের প্রজন্মের নয়) সেখানে অবতরণের মধ্য দিয়ে, যা কলম্বাসের আগের 'আবিষ্কার'-এর দৌলতেই সম্ভব হয়েছিল। মূল মহাদেশের বিশাল আয়তনের কারণে প্রথম আক্রান্ত দ্বীপগুলির তুলনায়

এই কাহিনী অনেক অনেক লম্বা, (শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছে) ও অনেক জটিল—সেখানে প্রত্যাশিত রকম বিপুল হিংসা/নিষ্ঠুরতা তো আছেই কিন্তু সেটা শুধু হিংসা কন্টকিত নয়, তার সাথে আছে সেখানকার বিশ্বাসপ্রবণ আদি অধিবাসীদের সাথে বারে বারে প্রতারণা এবং বিশ্বাস ও চুক্তি ভঙ্গ।

কলম্বাস ও তাকে অনুসরণকারী স্পেনীয়দের মতই অন্য ইউরোপীয় হানাদার গোষ্ঠীকেও ক্ষেপে ক্ষেপে আতলান্তিক মহাসাগর পেরিয়ে আসতে হয়েছে এবং অনুপ্রবেশ শুরু করতে হয় আবশ্যিকভাবেই আবিষ্কৃত মহাদেশ উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল থেকে। এবং সুপরিচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রহাম লিঙ্কনের (ও মার্কস ও এঙ্গেলসের) পরেও বহু দিন পর্যন্ত আজকের মার্কিন ও কানাডা রাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গদের দখল উত্তর মহাদেশের পশ্চিম উপকূল অব্দি পৌঁছায়নি। কারণ মূল মহাদেশের আদি অধিবাসীরা ইতিমধ্যেই পশ্চিমী দ্বীপপুঞ্জে তাদের পূর্বসূরীদের চেয়ে বেশী দেখতে পেয়েছিল ও ফলে তারা আর পূর্বসূরীদের মত লোহা, ঘোড়া ইত্যাদি সম্পর্কে অজ্ঞ, নিরীহ, স্বাগত জানাতে আগ্রহী জনগোষ্ঠী ছিল না। সুতরাং মহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীদের সাথে আদি জনগোষ্ঠীর মানুষদের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সংঘর্ষ/যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এবং এক্ষেত্রে আফ্রিকা থেকে লুট করে আনা কৃষ্ণাঙ্গদের ক্রীতদাসত্ব (শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের অধীনে) থেকে মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গত কারণেই স্মরণীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রহাম লিঙ্কনের ভূমিকাও অন্য কম উদার মার্কিন প্রেসিডেন্টদের থেকে মূলগতভাবে আলাদা কিছু ছিল না। একেবোরে গোড়াতে এক-আধটু যে দ্বিধার কিছু সাক্ষ্য পাওয়া গেছে তা অচিরেই 'আদিম-অসভ্য'দের ('savage') শিকারী-স্বরূপ মার্কিন সামরিক সেনাপতিদের সিদ্ধান্তের কাছে পথ ছেড়ে দিল। এই পশ্চিমমুখী দখলদারী অভিযানের অসংখ্য রক্তাক্ত কান্ডের যে দুয়েকটা উদাহরণ মাত্র খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে সংক্ষেপে নিচে উপস্থিত করা হ'ল তা থেকেই এর সামগ্রিক ভয়াবহতার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে:

1864 সালের স্যান্ড ক্রীক গণহত্যা (Sand Creek Massacre) নভেম্বর 29, 1864 তারিখে ভোরে কর্ণেল....চিভিংটন (Chivington) এর পরিচালনায় 'কলোরাডো থার্ড ক্যাভালরী' স্যান্ড ক্রীক-এ এক ঘুমন্ত শিবিরের উপর আক্রমণ করে। ফলে এর শেষ দৃশ্য হচ্ছে এক বিশাল সংখ্যায় আদি আমেরিকান পুরুষ, নারী ও শিশুদের ছিন্ন-ভিন্ন দেহ.....চিভিংটনের থার্ড ক্যাভালরীকে তাদের 100 দিনের ঘুরে ঘুরে কর্তব্য পালন করার ক্ষমতা প্রদান করতে গিয়ে কলোরাডো গভর্নর জন ইভানস এই নির্দেশ দেয়—"যেখানেই এই সব মারমুখী ইন্ডিয়ানদের দেখবে, সেখানেই তাদের মেরে ধংস করে দাও (U.S. Congress, House of Representatives, 1865, p.47) .....উত্তর আমেরিকার গোষ্ঠী/জাতি বিধ্বংসকারী ইতিহাসে স্যান্ড ক্রীক গণহত্যা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পেয়েছে; কিন্তু অবশ্যই এই ঘটনা একা দাঁড়িয়ে নেই। ....1851 সালে ক্যালিফোর্নিয়া গভর্নর পিটার ব্রুনেট "যতক্ষণ না ইন্ডিয়ান জাতি মুছে যায় ততক্ষণ নির্মূল করে দেওয়ার যুদ্ধ" চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানায়।.....

—*Genocide of Native Americans: Historical Facts and Historiographic Debates*– Brenden Rensink (University of Nebraska-Lincoln)

উপরের মত এরকম আরও অসংখ্য ঘটনার মধ্যে নিচে উপস্থাপিত দু'একটা ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ সেগুলির ইতিহাস ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে হিটলারকে ইহুদী নির্মূল করার জন্য কুবিদিত কনসেন্ট্রেসন ক্যাম্প তৈরীর কথা ধারণায় পৌঁছাতে সাহায্য করে বলে হিটলারের নিজের জবানীতেই জানা গেছে:

"নভগাযোদের দীর্ঘ পদযাত্রা" ("Long Walk of the Navgajo,") ছিল 1864 সালে নভাযো ইন্ডিয়ানদের চালান করে দেওয়া ও গোষ্ঠীগতভাবে সাফ করে দেওয়ার অপর নাম। উত্তর-পূর্ব আরিযোনা (Arizona) ও উত্তর-পশ্চিম নিউ মেক্সিকোতে এদের পুরুষানুক্রমিক বাসভূমি থেকে পূর্ব নিউ মেক্সিকোতে 'বস্ক রেডোনডো' (Bosque Redondo) নামের এক কনসেন্ট্রেসন ক্যাম্পে চালান করে দেবার জন্য মার্কিনী ফৌজ এদেরেকে বন্দুকের ডগায় চেপে ধরে 300 মাইল ধরে হাঁটতে বাধ্য করে। এটা ঘটে তীব্র শীতের সময়। শ'য়ে শ'য়ে নারী, শিশু ও বৃদ্ধ জোর করে চাপান পদযাত্রায় চলতে চলতে মারা যায়। পরের চার বছরে মার্কিনী ফৌজ প্রায় 10,000 নভগাযোকে কনসেন্ট্রেসন ক্যাম্পে বন্দী করে রাখে, যেখানে তারা সশস্ত্র প্রহরীদের পাহারায়

৫-F

অতি সামান্য খাদ্য খেয়ে মাটিতে গর্ত করে থাকে। তাদের মধ্যে কম পক্ষে 3,500 জন মারা যায়। .....লিংকনের সেনাপতিরা জাতি হিসাবে এদের বিলোপ করে দেবার ঘোষণা করতে কোন লজ্জা বোধ করেনি। জন পোপ ঘোষণা করে, "সিওক্সদের (Sioux—একটি আদি আমেরিকান জনগোষ্ঠী) একেবারে ঝাড়ে-বংশে নিঃশেষ করে দেওয়াই হ'ল আমার উদ্দেশ্য।....এদের সাথে উন্মাদ বা জংলী জানোয়ার হিসেবে আচরণ করতে হবে, চুক্তি বা সমঝোতা করা যায় এমন মানুষ হিসেবে নয়। (David Nichols, *Lincoln and the Indians*, p. 87) .....

জন টলান্ড (John Toland) তাঁর বই 'অ্যাডলফ হিটলার'(*Adolf Hitler*)-এ লিখছেন যে "হিটলার দাবী করে যে (ইহুদি নিধনের উদ্দেশ্যে) কনসেন্ট্রেসন ক্যাম্পের ধারণার অনেকটার জন্য সে ইংরেজ ও আমেরিকান ইতিহাস পাঠের কাছে ঋণী"। হিটলার .....বন্য পশ্চিমে ইন্ডিয়ানদের জন্য শিবিরগুলিকে প্রশংসা করত এবং অনাহার ও যুদ্ধ চালিয়ে আমেরিকার এই উচ্ছেদ অভিযানের প্রশংসা প্রায়ই অন্তরঙ্গ মহলে করত।

—*Was Hitler Inspired by Lincoln's Army?* by Thomas Dilorenzo [http://www.lewrockwell.com/2014/01/thomas-dilorenazo/was-hitler-inspired-by-lincolns-army/]

কলম্বাসের অনুসরণে ভুলভাবে 'ইন্ডিয়ান' নামাঙ্কিত আদি আমেরিকান জনগোষ্ঠীর, উপরে বর্ণিত সুপরিকল্পিত বিলোপ সাধন প্রেসিডেন্ট লিংকনের অনুমোদনসহ ও জ্ঞাতসারে হলেও তার সরাসরি দায়িত্বে ছিল কেন্দ্রীয় সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নর ও সেনাপতিরা, ব্যক্তি লিংকন নন। সরাসরি লিংকনের আদেশে আদি অধিবাসীদের হত্যার একটি নিদর্শন নিচে উপস্থিত করা হ'ল:

অন্ততঃ একটি জানা ও নথিবদ্ধ ক্ষেত্রে (ডিসেম্বর 26, 1862) আদি অধিবাসীরা শ্বেতাঙ্গ দখলকারীদের পশ্চিমাভিমুখী দখলাভিযানে বাধা দিতে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে যাতে উভয় পক্ষেই হতাহত হয়। শ্বেতাঙ্গ বিচারালয়ে কেবল আদিবাসীদের বহু জনের ফাঁসির আদেশ হয়; অপর পক্ষের অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গদের কারুর নয়। লিংকনের কাছে আবেদনে লিংকন দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তদের সবাইকে মুক্তি দেওয়ার বদলে 38 জনের ফাঁসির আদেশ বহাল রাখেন ও অতি দ্রুত সে আদেশ কার্যকরী হয়। [সূত্র: *Bury My Heart at Wounded Knee* by Dee Brown, Henry Holt & Compay, New York, 2001].

জাতিবিলোপকারী ধারাবাহিক হিংস্র কার্যকলাপের এই সংক্ষিপ্ত/বিক্ষিপ্ত বিবরণীর অন্তে, নিচের আপাতভাবে শতাব্দী-পর-শতাব্দী ধরে চলা শঠতার এই অ-হিংস কুৎসিত তথ্যটি বিশেষ ভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে:

এটা জানা আছে যে "আদি জনবাসী ও মার্কিন সরকারের মধ্যে পৌঁছন চুক্তির [মার্কিন সংবিধানের নানা ধারা অনুযায়ী] প্রতিটি, ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রতিটি, ভঙ্গ করা হয়েছে। [ওয়াশিংটন ডি.সী.-র মর্নিং স্টার ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট সুযান সোওন হারজার সাথে সাক্ষাৎকার—*Interview with Suzan Shown Harjo* (President and Director of the Morning Star Foundation in Washington, D.C)]

কলম্বাসকে নিয়ে পুনর্ভাবনা, 1991 [*RETHINKING COLUMBUS*, 1991, Rethinking Schools Ltd.] [http://freedomarchives.org/Documents/Finder/DOC44_scans/44.monograph.rethinking.columbus.1991.pdf]

এটা খেয়াল করার মত যে 1852 থেকে February 1862 অর্থাৎ উপরে উল্লেখ করা 38 জনের ফাঁসীর 10 মাস আগে পর্যন্ত কার্ল মার্ক্স মার্কিনী দৈনিক সংবাদপত্র 'নিউ ইয়র্ক ট্রিবুন' (New York Tribune)-এর ইউরোপীয় সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেছিলেন। কাজেই ইউরোপীয় হানাদারদের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের এই সংগ্রাম তাঁর সংবাদদাতা থাকা কালেই ঘটছিল। যদিও তিনি তাঁর সংবাদপত্রের নিবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে সমসাময়িক এত রকম বিষয়ের উপর (যার মধ্যে ভারতে ইংরেজ উপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে 1857 সালের সিপাই বিদ্রোহ-ও পড়ে) মন্তব্য করেছেন, ওই সংবাদপত্রের দেশেই চলমান উপরোক্ত সংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁর কোন মন্তব্য পাওয়া যায় না।

1992 সালে মহাদেশের মার্কিন ও আরও কিছু কিছু সরকারের তরফ থেকে October 12 তারিখকে (আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সেদিন কলম্বাস তার দল-বল সহ প্রথম অবতরণ করে) আমেরিকা 'আবিষ্কার'-এর 500-তম বছর হিসেবে উৎসব উদযাপিত করার আহ্বান রাখা হয়। মার্কিন মুলুকের মধ্যেই অতি সংখ্যালঘু কিছু অংশ থেকে — আদি

অধিবাসীদের টিকে যাওয়া মানুষজন ও অন্য আরও কিছু সত্যানুরাগী বিবেকবান নাগরিক, যারা ইতিহাসের মিথ্যাকরণের বিরুদ্ধে—তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করেছিলেন। ঐতিহাসিক সত্যের স্বার্থে সেই দিনটি উৎসবের দিন হিসেবে নয় শোক দিবস হিসেবে - 'আক্রমনের' প্রথম বা উদ্বোধন দিবস—পালন করার যোগ্য।

জনকতুল্য বৃটিশ রাষ্ট্র থেকে জুলাই 4, 1776 তারিখে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার স্মৃতিতে নিউ ইয়র্ক শহরের মানহাট্টানে রয়েছে দুনিয়ে জুড়ে বিখ্যাত সেই সগর্বে মাথা উঁচু করা আকাশমুখী মূর্তি 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি' (1886 সালে ফ্রান্স থেকে দেওয়া উপহার)। অন্তর্বস্তুর দিক থেকে এই 'স্বাধীনতা' হচ্ছে একটা উপনিবেশকে দখলে রাখার জন্য একই ইউরোপীয় শক্তির (এখানে ইংরেজ) নিজেদের মধ্যকার ঝগড়ার ব্যাপার, যেখানে ক্ষমতাধিকারী পিতার এক বিগড়ে যাওয়া সন্তান আর তার আদি পিতার রক্ষণাধীনে থাকতে চাইছে না। কাজেই এটা কোন দিক থেকেই বিভিন্ন ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনস্থ এশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে তুলনীয় নয়। এই মূর্তি অবশ্যই মার্কিন ইতিহাসের স্মরণযোগ্য এক অধ্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করছে। কিন্তু কেবলই এককভাবে এটা এই অর্থে বিভ্রান্তিকর যে এতে মার্কিনী ইতিহাসের অর্ধ-সত্যের প্রতিফলন ঘটেছে, যাকে যথাযথ কারণেই অনেকে মিথ্যার চেয়েও ক্ষতিকর মনে করতে পারেন। যে কেউ এটা ভেবে আশ্চর্য হতেই পারেন যে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কোন একটি ইতিহাস বিভাগও একের পর কে চলে আসা মার্কিন সরকারগুলির কোনটির কাছে ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি আনুগত্যের স্বার্থে ওই আকাশমুখী মূর্তির ঠিক পাশেই আর একটি মূর্তি বসানর প্রস্তাব করেনি, যাতে মার্কিন ইতিহাসের আর একটি সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘকালীন সত্যের/পর্বের প্রতিফলন ঘটবে। সেটা হবে মাথা নিচু করে ও হাঁটু গেড়ে চিরকালীন ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বসা এক শ্বেতাঙ্গ মূর্তি, যেখানে লেখা থাকবে বর্তমান শ্বেতাঙ্গ নাগরিকরা তাদের পূর্বপুরুষদের হয়ে 500 বছর ধরে আদি অধিবাসীদের উপর চলা জাতিবিলোপমুখী হত্যাকান্ডের (Genocidal Massacres) —যার কোন দায়িত্ব বর্তমান শ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের অবশ্যই নেই—জন্য সেই হত্যাকান্ডের শিকারদের কাছে ক্ষমা চাইছেন।*

উপরে প্রস্তাবিত এই হলে-ঠিক-হত হাঁটুগাড়া মূর্তির প্রসঙ্গে প্রথমে উল্লিখিত প্রায় আড়াইশ বছরের পুরোন আন্তর্জাতিক স্তরে সুপরিচিত মানবাধিকারের স্বপক্ষীয় খ্যাতিসম্পন্ন দলিল 'আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষনা, 4,1776' (American Declaration of Independence, July 4, 1776) সম্পর্কে দুয়েকটা কথা উল্লেখযোগ্য। এই দলিলেই রয়েছে সেই বহু উদ্ধৃত উক্তি "আমরা মনে করি এগুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে সমস্ত মানুষ সমান হয়েই সৃষ্টি হয়েছে....."("We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal...")। 'মজার' কথা হচ্ছে ওই একই দলিলে আর একটু পরে যেসব আদি অধিবাসীদের তখনও শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি তাদের আখ্যা দেওয়া হয়েছে "হিংস্র/বর্বর ভারতীয়"("Indian savages") হিসেবে!

'আবিষ্কৃত' আমেরিকা সংক্রান্ত এই ছেদহীন ভয়াবহ বৃত্তান্ত এবার শেষ করা হচ্ছে হৃদয় স্পর্শ করা কিন্তু পুরোপুরী ব্যর্থ চেষ্টার উল্লেখ করে, যে চেষ্টার খবর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সরকারী উৎস থেকে আসা ঐ সময়কালের বৃত্তান্তে সাধারণতঃ এড়িয়ে যাওয়া হয়। কলম্বাসের বয়সানুজ, সমসাময়িক ও সেই একই স্পেন দেশের ভূমি থেকে আগত এমন দুজনের কথা - দুজনেই খৃষ্টান ধর্মযাজক — জানা যায় যাঁরা তাঁদের স্বদেশের সমকালীন চলমান ধারার বিরুদ্ধে দাঁড়ানর বিরল সাহস দেখিয়েছিলেন। দখল করা দ্বীপমালার আদি অধিবাসীদের সাথে তাঁদেরই স্বদেশবাসীরা যে ভয়াবহ, হিংস্র আচরণ করছিল তার স্বরূপ প্রকাশ্যে উন্মোচন করে সাথে তাঁদের অনৈক্যমত উচ্চ কণ্ঠে ও জোরের সাথে প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন ও তা বন্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন, যদিও সে চেষ্টা কোন কাজেই আসেনি। এঁদের এক জন, অ্যান্টনিও দে মোটেসিনোস (Antonio de Motesinos) 1511 সালে ঘোষণা করেন, "আমি একটা কণ্ঠ, যেটা এক জনবসতিহীন প্রান্তরে চেঁচিয়ে যাচ্ছে" ("I am a voice crying in the wilderness.")। আর এক জন হচ্ছেন ইতিমধ্যেই উল্লিখিত ও উদ্ধৃত বার্টোলোমে দে লা কাসা (*Bartolome de Las Casas*), যাঁর দুটি বইয়ে (*The Devastation of The Indies: A Brief Account* আর *An Account of the First Voyages and Discoveries-unparalleled Cruelties on the Indians in the destruction of above Forty Millions of People*)

দখলকারী স্পেনীয়দের হিংস্র/অমানবিক কীর্তিকলাপ লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এই বইয়েরই প্রথমটি থেকে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা হিসেবে এই কীর্তিকলাপের কিছু রক্ত-হিম করা বমোনদ্রেককারী সামান্য কিছু উদাহরণ উপরে উপস্থিত করা হয়েছে। এবং তিনি 50 বছর ধরে সেখানে থেকে আদি অধিবাসীদের রক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

হাস্যকর হলেও এটা বোধ হয় আশ্চর্যের নয় যে পরবর্তীকালের ইংরেজ দখলদাররা স্পেনীয়দের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার তুলনায় তাদের তথাকথিত অধিকতর মানবিকতাবোধের দাবী প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে লা কাসা-র উপরোক্ত দুটি বইয়ের বিবরণকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে উপরোক্ত দুজনের স্বদেশ থেকে প্রয়াত এই দুজনের উপর - বিশেষভাবে বার্টোলোমে দে লা কাসা-র উপর আক্রমন ও নিন্দার একেবারে দুরন্ত ঝড় নেমে এসেছে। যেমন বিংশ শতাব্দীর ''স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের'' একাধিক জন তাঁকে ''উন্মাদ'' আখ্যা দিয়ে ''অতিশয়োক্তিপ্রবণ ও নিজের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক'' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (http:/en.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_de_las_casas). এটা বলা বাহুল্য যে দখলীকৃত মহাদেশের আদি অধিবাসীদের সাথে মানবিক আচরণের এই ধরনের ভন্ডামীমার্কা, মিথ্যাচারী পরস্পরের সাথে পাল্লা দেওয়া দাবী, প্রতিযোগী ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের নিজেদের মধ্যে স্রেফ ঝগড়ার প্রতিফলন ছাড়া অন্য কিছু নয়।

একথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে ভারতবর্ষে প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস শিক্ষণের জগতে আমেরিকা 'আবিষ্কার' সংক্রান্ত বৃত্তান্তে কলম্বাসের নামের সাথে সাথে স্বদেশের চালু ধারণাস্রোতের বিরুদ্ধে বিরল সাহসের সাথে দাঁড়ান এই দুজন কলম্বাসেরই স্বদ্বেশবাসীর (জন্মসূত্রে ইতালির মানুষ হলেও কর্মসূত্রে স্পেনই কার্যত কলম্বাসের স্বদেশ হয়ে উঠেছিল) নামও উল্লিখিত হয় না কেন। তাহলে প্রায় শিশু-শিক্ষার স্তর থেকে (যার মধ্য দিয়ে আমদের সবাইকেই আসতে হয়েছে) অবিমিশ্র গৌরবোজ্জ্বল আলোতে কলম্বাসের নামের উল্লেখের চলও স্বাভাবিকভাবে বন্ধ হয়ে যেত। এটা ইতিহাসের বৃত্তান্তর পশ্চিমের অর্থাৎ সাহেবদের সরকারী/প্রাতিষ্ঠানিক ধারাকে ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার বানরসদৃশ ভাবনাচিন্তাহীন অনুকরণের সাথে তুলনীয়। আমেরিকা 'আবিষ্কার' সম্পর্কে জানার কোন বিশেষ অভ্যন্তরীণ তাগিদ অনেক আগে না থাকার কারণে অন্ততঃ বর্তমান লেখকের 50 বছর বয়েস পেরুনর আগে আমেরিকা 'আবিষ্কার' প্রসঙ্গে কলম্বাস ছাড়া কারও নামের সাথে পরিচিতি ছিল না।

অষ্ট্রেলিয়া 'আবিষ্কার'

অষ্ট্রেলিয়ার বেলায় 'আবিষ্কার' বৃত্তান্তের ঐতিহাসিক পটভূমি ও দখল নেওয়ার ইতিহাস চরিত্রের দিক থেকে একটু আলাদা। এই মহাদেশে বাইরে থেকে আসা মানুষদের মধ্যে প্রথম পা পড়েছিল ওলন্দাজদের অর্থাৎ ডেনমার্ক থেকে আসা মানুষের —1606 সালে। কিন্তু তাদের দিক থেকে দখলের কোন চেষ্টা হয়নি। দখল শুরু হয় ইংরেজদের দিক থেকে; 1791 সালে; ইংল্যান্ডের রাজা জর্জ 3-এর নামে দখল নেওয়া হয়। এবং শুরুতে এটার ব্যবহার ছিল ইংল্যান্ডে সাজাপ্রাপ্তদের নির্বাসন শিবিরাঞ্চল হিসেবে, যেমনটা এক সময় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে ভারতের ইংরেজ শাসকরা ব্যবহার করেছিল সাজাপ্রাপ্ত ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য।

অষ্ট্রেলিয়ায় জাতি-গোষ্ঠী বিলোপমূলক () হত্যাকান্ড আমেরিকার মত নিয়মিত ছিল না বা সেখানকার মত প্রায়-সমাপ্তিতে কোন কালেই পৌঁছায়নি। কিন্তু ক্ষেপে ক্ষেপে তা অবশ্যই ঘটেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আদি অধিবাসীদের উপর 1700 ও 1930 সালের মধ্যে 100 -টি'র মত গণহত্যাকান্ডের তথ্য নিচের লিংকটিতে গেলে এই শিরোনামায় পাওয়া যাবে: List of massacres of Indigenous Australians, Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_massacres_of_Indigenous_Australians]

অষ্ট্রেলিয়াকে ইংরেজ দখলে নিয়ে আসা সংক্রান্ত অতি সামান্য দু'একটা ছড়ান-ছেটান তথ্য নিচে দেওয়া হ'ল:

ক্যাপ্টেন আর্থার-এর নেতৃত্বে 1788 সাল থেকে ইউরোপীয়রা এখানে প্রথম বসতি শুরু করে।....যে আদি অধিবাসীরা গত 60,000 বছর ধরে এসেছে, বাইরে থেকে আসা বসতিকারীরা তাদেরকে অবজ্ঞা করে চলার চেষ্টা করে। ....আদি অধিবাসীরা যেখানে ছিল জনসংখ্যার 100% ভাগই, এখন তারা মাত্র 1% ভাগ। যেখানে ইউরোপীয় বসতিকারীদের অধিকার সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে সেখানে আদি

অধিবাসীদের অধিকার সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

1806 সাল পৌঁছাতে পৌঁছাতে বাইরের বসতিকারী ও ফৌজীদের নিজ উচ্চ জাতি-মনস্কতা (racism) এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। ... কিছুতে জিতে গিয়ে পুরস্কার লাভের মত করে আদি অধিবাসীদের ক্যাঙ্গারুদের মত করে শিকার করে বেড়ান শুরু হয়। ফৌজীরা কিছু উপহার নিয়ে আদি অধিবাসী গ্রামগুলিতে হাজির হ'ত, যেখানে আসল উদ্দেশ্য ছিল, গ্রামের জল সরবরাহের উৎসগুলিকে আর্সেনিক দিয়ে বিষাক্ত করে দেওয়া। শিশু, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ নির্বিচারে এই আর্সেনিক বিষে শেষ হয়ে যেত। (http://www.creativespirits. info/abor...reek-1838.html)

জাতিবিলোপমূলক হত্যাকান্ড আমেরিকার মত নিয়মিত হোক বা না হোক অথবা প্রায়-সমাপ্তিতে পৌঁছাক বা না পৌঁছাক এই দেশ/মহাদেশ এখন আমেরিকার মতই বাইরে থেকে থেকে আসা আক্রমণকারী-তথা-দখলকারীদের দ্বারাই শাসিত হচ্ছে ও এখানকার আদি অধিবাসীরা স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী হিসেবে কার্যত গুরুত্ব দেওয়ার অনুপযুক্ত একটা অবহেলিত স্বত্বায় পর্যবেশিত হয়েছে।

এই অষ্ট্রেলিয় বৃত্তান্ত শেষ করা হচ্ছে সেখানকার শ্বেতাঙ্গ দখলকারী-তথা-শাসকদের হাতে আদি অধিবাসীদের 'সভ্য' করে তোলার চেষ্টার একটা উদাহরণ দিয়ে:

1910-1970 এর মধ্যে নানা সরকারী নীতির ফলে আদি অধিবাসীদের বহু শিশুকে জোর করে তাদের পরিবারের থেকে সরিয়ে আনা হয়। এই সব নীতি অনুযায়ী পরম্পরার পর পরম্পরা ধরে সরিয়ে আনা এই সব শিশুরা 'চুরি করে আনা প্রজন্মরা'(Stolen Generations) হিসেবে পরিচিত হয়। এইভাবে জোর করে শিশুদের সরিয়ে দেওয়ার ফলে অবশ করে দেওয়া মানসিক আঘাত ও হারিয়ে যাওয়ার এমন এক উত্তরাধিকার রেখে যায় যা আদি অধিবাসীদের গোষ্ঠীগত, পরিবারগত ও ব্যক্তিগত মনোজগতকে আজও নাড়া দিয়ে চলেছে।

আদি অধিবাসীদের শিশুদের এভাবে তাদের পরিবার থেকে জোর করে সরিয়ে নেওয়াটা ছিল 'একাত্মীকরণ' (Assimilation) নীতির একটা অংশ। এই 'একাত্মীকরণ' দাঁড়িয়ে ছিল মানুষ হিসেবে কৃষ্ণাঙ্গদের নিচু স্তরের ও শ্বেতাঙ্গদের উচ্চ স্তরের ধরে নেওয়ার ভিত্তিতে। এই 'ধরে নেওয়া'র পিছনে এই ধারণা কাজ করেছে যে এক স্বাভাবিক পথে সরিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে আদি অধিবাসীদের "শেষ হয়ে" যেতে দেওয়া বা যেখানে সম্ভব তাদেরকে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের সাথে 'একাত্মীকরণ'।

বাবা-মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া শিশুদেরকে তাদের নিজস্ব পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করার শিক্ষা দেওয়া হত এবং জোর করে শ্বেতাংগ সংস্কৃতিকে গ্রহণ করান হ'ত। প্রায়ই তাদের নাম বদলে দেওয়া হ'ত ও তাদের নিজেদের ভাষায় কথা বলা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হ'ত। কিছু শিশুকে শ্বেতাংগ পরিবাররা পোষ্য নিত এবং অনেককেই এমন সব প্রতিষ্ঠানে রাখা হ'ত যেখানে তাদের প্রতি কু-আচরণ ও অবহেলাই ছিল সাধারণ চল।

—*The Stolen Generations of Australia* by Debra Hocking (http://www.hamptonsinstitution.org/stolen-generation.html#.WTENg5KGPc)

অষ্ট্রেলিয়াতে উপরের এই 'চুরি করে আনা প্রজন্মরা' (Stolen Generations) প্রসঙ্গে এটা উল্লেখযোগ্য যে 2008 সালের 13 ফেব্রুয়ারী তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কেভিন রুড (Kevin Rudd) তার সংসদীয় ভাষণে (parliamentary speech) এই 'চুরি করে আনা প্রজন্মদের' উপর আগেকার সময়কাল ধরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া এইসব অপকর্মের জন্য তাঁদের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন, যা নিশ্চয় আগে উল্লিখিত (পাদটিকাতে) আমেরিকাতে নিপীড়িত আদি অধিবাসীদের গোপন করে তাঁদের উদ্দেশে ক্ষমা চাওয়ার চেয়ে অনুসরণযোগ্য উদাহরণ।

দেশ 'আক্রমণ' বা 'দখল' মানেই 'জাতিবিলোপ' নয়

সব শেষে এটা খেয়ালে রাখাটা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য অন্য দেশ আক্রমণ, যার সাথে মৃত্যু, ধ্বংস ও কখনও কখনও সফলভাবে পর দেশ দখল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, ইতিহাসের সুপরিচিত ঘটনা। যেমন ভারতীয় ইতিহাস বহিরাগতদের আক্রমন/দখল-এর ঘটনায় ভরা। কিছু উদাহরণ: খ্রীষ্টপূর্ব 326 সালে গ্রীস থেকে এসে আলেকজান্ডারের সুবিদিত ভারত (উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে) আক্রমণ, মধ্য যুগে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া থেকে আক্রমণ, যা শেষ পর্যন্ত মোগল/পাঠান সাম্রাজ্যের জন্ম

দেয়। কিন্তু এ সবই উপরে আলোচনা করা 'আবিষ্কৃত' মহাদেশের গোষ্ঠীবিলোপ-ভিত্তিক (genocidal) দখল নেওয়া থেকে চরিত্র ও গুণগত/মূলগতভাবেই একেবারে স্বতন্ত্র। এমন কি পশ্চিমী দেশগুলির হাতে (মুখ্যতঃ ইংল্যান্ড ও গৌনতঃ ফ্রান্স ও পর্তুগাল) ভারতের উপর উপনিবেশিক দখলও সেই চরিত্রের হওয়া সম্ভব ছিল না, এবং কালেই সে রকম ছিল না। হওয়া সম্ভব ছিল না কারণ আক্রান্ত ভারতীয় রাজ্যগুলি আক্রমনকারী রাষ্ট্রগুলির সাথে কারিগরী স্তরে (technologically) কমবেশি সমপর্যায়ের ছিল। সুতরাং এইসব আক্রমণজনিত যুদ্ধাদির—বহু সময়েই খুবই রক্তাক্ত ও বিশ্বাসঘাতকতাদূষিত—চরিত্র ছিল সাম্রাজ্যবিস্তারের; গোষ্ঠীবিলোপমূলক (genocidal) হওয়া সম্ভব ছিল না; কাজেই তা সে রকম ছিলও না। কখনও কখনও এই দখলদারী দীর্ঘদিন চলতে চলতে একদা বহিরাগতরা (অ-ইউরোপীয়) এ দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে অনেকার্থে মিশে বা লীন হয়ে মিশ্র চরিত্রের সমাজ ও সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে, যা স্থানীয়দের বিলোপ করে দেওয়া থেকে মূলগতভাবে একেবারেই স্বতন্ত্র।

এখানে মনে পড়ছে বিভিন্ন জাতির মধ্যে 'আক্রমণের-পরে-লীন যাওয়া' (merger-after-onslaught) দিকটি—যা আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় 'আক্রমনের-পরে-জাতিবিলোপ'-এর (genocide-after-onslaught) উজ্জ্বল বৈপরীত্যের পরিচায়ক - রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতায় ছবির মত এক রূপকে এবং স্বাগত জানানোর সুরে ধরে রাখা আছে: "শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হ'ল লীন"। 'লীন' হওয়ার আগের বহিরাক্রমণাত্বক দিকেরও বাস্তবোচিত ও ইতিহাসানুসারী উল্লেখ কবিতায় আছে:

"রণধারা বাহী, জয়গান গাহি, উন্মাদ কলরবে,
ভেদী মরুপথ, গিরি পর্বত যারা এসেছিল সবে।"

এ ছাড়াও আধুনিক অর্থে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠার আগে স্বাভাবিক অ-নির্দিষ্ট সীমারেখার দুপার থেকেই পাশাপাশি বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর শ শ বছর ধরে স্বচ্ছন্দে ও স্বতস্ফূর্তভাবে পারস্পারিক যাতায়াত এবং নিবিড় সংস্পর্শজাত ভাষা-তথা-আচার/আচরণ-তথা সংস্কৃতিগত পারস্পরিক সংমিশ্রণের স্বাগত জানানর মত মিশ্র চরিত্র সে সব অঞ্চলে যাওয়া একটু কৌতূহলী ভ্রমণকারীদের অনেকেরই চোখে পড়বে। উদাহরণ হিসেবে, যেমন হিমাচল প্রদেশের দূর উত্তরাংশে তিব্বতাঞ্চলের সাথে সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে বা ভারতবর্ষের পরস্পর সংলগ্ন প্রদেশ বা জেলাগুলির—বিহার-পশ্চিম বাঙলা, উড়িষ্যা-অন্ধ্র ইত্যাদি—সীমান্তবর্তী রেখার সংলগ্ন দুই পাশেই। এ সবই দেশ/মহাদেশ 'আবিষ্কার' অর্থাৎ দখল করে আদি অধিবাসী ও তাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার বীভৎস মানবিকতাবিরোধী কান্ডর বিপরীতে মানবজাতির মূলগত একত্বের ইঙ্গিতবাহী সৌন্দর্যমন্ডিত জীবনস্রোতের পরিচায়ক।

---

*মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইতিহাস বিভাগের তরফ থেকে ওই প্রস্তাবিত 'হলে-ঠিক-হত' হাঁটুগাড়া মূর্তি সংক্রান্ত অংশটি, বর্তমান রচনার অনেক আগের খসড়াতে লেখার পরে অতি সম্প্রতি ইন্টারনেট-এর দৌলতে বর্তমান লেখকের নজরে আসে যে 2009 সালের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক হুসেন ওবামা (Barack Hussein Obama) প্রতিরক্ষা বাবদ খরচ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবের (defense spending bill) অংশ হিসেবে একটি 'আদি আমেরিকাবাসী সংক্রান্ত প্রস্তাবে' ('Native American Apology Resolution') স্বাক্ষর দেন, যাতে অন্য কথার সাথে বলা হয়েছে "আদি জনজাতির মানুষদের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের দ্বারা যে হিংসা, দুরাচরণ ও অবহেলা আরোপিত হয়েছিল তার জন্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের মাধ্যমে...মার্কিন যুক্তরাষ্টের জনসাধারণের হয়ে ক্ষমা চাইছে"। ("The United States, acting through Congress...apologizes on behalf of the people of the United States for the many instances of violence, maltreatment and neglect inflicted on Native Peoples by citizens of the United States [and] expresses its regret...") কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে ওবামা এই স্বাক্ষরটি করেছিলেন ব্যক্তিগত স্তরে। প্রকাশ্য বিবৃতির মাধ্যমে তা জনসমক্ষে আসেনি, অর্থাৎ যাঁদের কাছে ক্ষমা চাওয়া হ'ল সর্ব বা ব্যাপক স্তরে (অর্থাৎ একটা অতি সীমিত/ক্ষুদ্র অংশের বাইরে) তাঁদের কাছেই পৌঁছায়নি। [সুত্র: *THE QUIET APOLOGY TO INDIANS* by Mary Annette Pember, http://www.dailvvonder,com/quiet-america-apology-indians/2011/12/13/3634/#]

নির্বাচিত তথ্যসূত্র:

আমেরিকা 'আবিষ্কার' প্রসঙ্গে:

1. *Columbus His enterprise-Exploding the Myth* By Hans koning [Monthly Review Press New York, 1991]

2. *Bury My Heart at Wounded knee* By dee Brown, [Henry Holt & Company, New York, 2001, 1st published, 1971]

3. *ACCOUNT of the First voyages and Discoveries Made* by the Spaniards in America. –Containing The most Exact Relation hitherto published, of their unparalleled cruelties on the Indians in the destruction of above Forty Millions of people BY Bartolome de Las Casas)
(https://ia600400.us.archive.org/35/items/accountoffirstvo00casa/accountoffirstvo00casa.pdf)

4. *A Brief Account of the Destruction of the Indies (1552)* by Bartolome de las casas [The Projecft Gutenberg EBook] (http://www-personal.umich.edu/~twod/latam-s2010/read/las-casasb2032120321-8.pdf)

5. *Genocide of Native Americans: Historical facts and Historiographic Debates* By Brenden Rensink University of Nebraska-Lincoln
(http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1034&context=historydiss)`

অষ্ট্রেলিয়া 'আবিষ্কার' প্রসঙ্গে:

1. *European discovery and the colonisation of Australia*
(http://australia.gov.au/about-australia/australian-story/european-descovery-and-colonisation)

2.*Australian Aboriginal Genocide/holocaust*
(http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=212372)

3. *List of massacres of Indigenous Australians*–From Wikipedia, the free encyclopedia
(http://en.wikipedia.org/wiki/List-of-massacres-of-Indigenous-Australians)

4. *Stolen Generations*-From Wikipedia, the free encyclopedia
(http://en.wikipedia.org/wiki/Stolen-Generations#The-White-Stolen-Generations)

আমাদের জানা অজানা যে মানুষেরা
মানবকল্যাণে, সমাজ কল্যাণে, পরিবেশকল্যাণে
নীরবে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের জানাই আমাদের শ্রদ্ধা

বিজ্ঞান, গণবিজ্ঞান, জনগণ এবং আমাদের ব্যর্থতা

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

পয়লা বৈশাখ দুই বাংলা এবং সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা বাংলাভাষীদের সম্ভবত একমাত্র ধর্ম-রহিত সামাজিক উৎসব। এ বছরের বাংলা নববর্ষ আমাদের অনেকের জন্যই ছিল যথেষ্ট শোকাবহ। আমাদের অনেক দিনের সাথী, বিজ্ঞান-চেতনা সংস্থার প্রাণ-পুরুষ, দরাজ হৃদয়, সঙ্গে সুকণ্ঠের অধিকারী প্রভাস বিশ্বাস প্রয়াত হয়েছে - মাত্র 51 বছর বয়েসে। শনিবার, 29শে এপ্রিল, 2017 প্রভাসের স্মরণসভায় গিয়ে পাকাচুল, শীর্ণ, স্থিতধী একগুচ্ছ মানুষ অধ্যুসিত হল ঘরে বসে গণবিজ্ঞানের পেছনের দিনগুলো মনে এলো। পাশাপাশি মনের মধ্যে ভীড় জমানো সেই সব সযত্নে লুকিয়ে রাখা কথাগুলো, যেগুলি 'দাদা'-দের সংযত শাসন-শৃঙ্খলার খাঁচায় বাঁধা পড়া মন আর মনন আরো খানিকটা অগ্রসর হওয়ার সাহস খুইয়ে বসেছিলো।

বর্তমান লেখাটা স্বগতোক্তি বলাই হয়ত সঙ্গত - কিন্তু ব্যর্থতার কিছু অবশ্যম্ভাবী সালতামামি এসে থাবেই। সঙ্গে থাকছে কিছু ব্যক্তিগত উপলব্ধি আর স্মৃতিচারণাও।

বছর 12 আগের কথা। তখন একটি কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান গবেষণাগারে চাকরি করি। চাকরির সূত্রে দিল্লীতে ভারত সরকারের জৈব প্রযুক্তি বিভাগে একটি সর্বভারতীয় সভাতে গেছি। 1995-এর 21শে সেপ্টেম্বর। বিভাগটির ভৌগোলিক অবস্থান তথাকথিত সাঁই বাবার মন্দিরের কাছে। সাড়ে এগারটায় পৌঁছেছি—কিন্তু সমগ্র বিভাগে কেমন একটি চাপা উত্তেজনা। আমরা যারা দিল্লীর বাইরে থেকে এসেছি, আমাদের মনে সন্দেহ - কোনও ঝামেলা হয়েছে কি? ইন্দো-টিবেটান বর্ডার ফোর্স-এর হেড কোয়ার্টার এবং আমাদের বিজ্ঞান সম্মেলন একই বাড়িতে—কিন্তু আশ্চর্য সুরক্ষা সংক্রান্ত কোনও বাড়তি কড়াকড়ি চোখে পড়লো না! যাই হোক—সম্মেলন স্থলে পৌঁছে শোনা গেলো, নির্ধারিত সময়ের পরিবর্তে মিটিং শুরু হতে দেরি হবে। ততদিনে, এনআইসি-র কল্যাণে দ্রুতগতির ইন্টারনেট এবং দূরদর্শন দেখার সুযোগ বেড়েছে।

গণেশের দুগ্ধপান নিয়ে রাজধানী শাহর সরগরম। পাঁচ মিনিটের হাঁটা দূরত্বে মন্দিরের অবস্থানের ফলে জৈবপ্রযুক্তি বিভাগের বরিষ্ঠ থেকে কনিষ্ঠ বিজ্ঞানী, তস্য আপ্ত-সহায়ক, টাইপিস্ট, গ্রুপ-ডি সবাই গণেশকে দুধ খাওয়াতে ব্যাগ্র। স্বয়ং বিজ্ঞান সচিব এমন উন্মাদনায় "হস্তক্ষেপ" করবে না বলে আমাদের জানালেন। অতএব অপেক্ষা! সিজিও কমপ্লেক্স-এর তৎকালীন যে 'লে-আউট' ছিলো, তাতে রাস্তা পার হওয়া বেশ দুরূহ কাজ। অচিরেই সিকিউরিটি 'নো-এন্ট্রি' বসিয়ে যান-বাহন বিকল্প পথে ঘুরিয়ে জনস্রোতকে মসৃণভাবে গণেশ অভিমুখে পাচারের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা নিশ্চিত করলো। সে কি জনস্রোত! কলার দোকানদার থেকে টাই-পরিহিত করপোরেট, ইউনিফর্ম পরিহিত সামরিক অফিসার থেকে ঝক্‌ঝকে আধুনিকা - কে নেই এই মহানব্রতযাত্রায়!

বিস্ময়ের আরও বাকি ছিলো। একটি দুটি করে মহিলা-বিজ্ঞানী প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন যে তাঁরাও যেতে চান (দুজন ছিলেন দুটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের নির্দেশক!)। দশ-বারো জনের একটি মহিলা-বিজ্ঞানীর দল একটি লিফট্-এ ধাক্কাধাক্কি করে উঠে উর্দ্ধতলে ক্যান্টিনে হানা দিলেন—দুধ এবং সেটি খাওয়ানোর যন্ত্রের সন্ধানে। ততক্ষণে আসল দুধের প্যাকেট শেষ - গুঁড়ো দুধ গুলে 'ভেজাল' দুধ চালানো হচ্ছে। সেই যে তাঁরা অদৃশ্য হলেন—একেবারে শেষ বেলার আগে তাঁদের দেখা মিললো না।

পুরুষ বিজ্ঞানীরা আরও সরেশ—তাঁরা, যাঁরা মাতৃভাষায় কথা বলতে স্বচ্ছন্দ নন বলতে পারদর্শী—কি এক অজ্ঞাত কারণে হঠাৎই যাকে বলে 'জাত খুইয়ে' মাতৃভাষায় বচন-বিনিময় শুরু করলেন! বড় ঘর হওয়া সত্বেও তামিল-তেলেগু-কানাড়ী-মালায়লি- ভোজপুরি-ছত্তিশগড়ী-র সঙ্গে মণিপুরি সহ আরও অনেক ভাষায় গুঞ্জন উঠলো। কিন্তু হিন্দি নৈব নৈব চ! আমার পাশে বসা বিহারী ভদ্রলোক বললেন তিনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স, বাঙ্গালোর-এ পিএইচডি করেছেন— যতটা কানাড়ি ভাষা শিখেছেন তাতে মনে হচ্ছে পুরুষরাও 'চুপি চুপি' গণেশের দুগ্ধ-সেবন 'সেরিমনি'তে যোগ দিতে উদ্যত - এবং হঠাৎই

সবাইয়ের "এক্সকিউজ মি" বলে বেরিয়ে যাওয়ার তাড়া পড়লো।

সাড়ে এগারোটার জাতীয় স্তরের মিটিং শুরু হলো আড়াইটেয়। দলে দলে প্রতিষ্ঠিত, বিলেত এবং বিদেশ ফেরৎ আইআইটি প্রভৃতি কুলীন গোষ্ঠীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (অবশ্যই ভরতুকিতে পড়ে) শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ফিরলেন। মুখে তৃপ্ত হাসি, কপালে দই-এর ফোঁটা, হাতে প্রসাদের বাক্স, যাতে 'সিকিউরিটি ক্লিয়ারড' বলে রাবার স্ট্যাম্প মারা!

যদিও উচ্চ মার্গের বিজ্ঞান এবং আগামী পাঁচশালা পরিকল্পনায় জৈব প্রযুক্তির যথাযথ গুরুত্ব নিয়ে গুরু-গম্ভীর আলোচনা হলো, কিন্তু গণেশের 'দুধ খাওয়া' সংক্রান্ত কোনও আলোচনা উঠল না।

হায় আমাদের বিজ্ঞান-মনস্কতা! প্রায় শূণ্য সম্মেলন কক্ষে বসে থাকতে থাকতে মনে পড়ছিল সত্তর দশকের শেষ বছরগুলোতে গণ-বিজ্ঞান আন্দোলনসহ আরও অনেক কথা। এই সব মূল স্রোতের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরা কখনই আমাদের গণ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রচার আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিলেন না। আমাদের 'টার্গেট অডিয়েন্স' ছিলেন অগণিত সাধারণ মানুষ - যাঁদের অলৌকিক, অযৌক্তিক বিশ্বাসের ভিত নড়িয়ে দেওয়ার কাজে প্রভাস সহ আরও অনেক তরুণ তাঁদের জীবনের অমূল্য তারুণ্য ও সদ্য-যৌবনের সময়ের শ্রেষ্ঠ অংশটি ব্যয় করেছিলেন।

আমাদের সমগ্র আন্দোলনের ব্যর্থতা যে তথাকথিত জনগণকে আমরা সম্ভব-অসম্ভব, যুক্তি এবং যুক্তিহীনতা-কুযুক্তির প্রভেদ বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি। এই আন্দোলনটির সঙ্গে আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের কথাও এড়িয়ে গিয়েছি সযত্নে—'রাজনৈতিক' হয়ে পড়ার মনগড়া আশঙ্কায়। বিজ্ঞানের পেছনে যে প্রবল দর্শন রয়েছে, তার বস্তুবাদী অন্তর্বস্তুটি সামান্য যৌক্তিক প্রসারণেই সামাজিক অসাম্যের একটি ধারাবাহিক ব্যাখ্যা হাজির করে। তাই যুগে যুগে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞনীরা সমাজের শিরোমণিদের নরম লক্ষ্যবস্তু। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো আর ডারউইনের বিবর্তনবাদ সমসাময়িক। এই দুই তাত্ত্বিক কাঠামোর বিরুদ্ধে অযৌক্তিক জেহাদ আজও অব্যাহত। এই 2017 সালেও মার্কিন দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিবর্তনবাদ পড়ানো হয় নিষিদ্ধ, অথবা বিবর্তনবাদের পাশাপাশি বাইবেল-বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব পড়ানো বাধ্যতামূলক।

প্রযুক্তি-নির্ভর মার্কিন সমাজের নাগরিকবৃন্দ তাঁদের জীবনচর্চার প্রতিটি ক্ষণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আধুনিক প্রযুক্তিতে - অথচ সেই দেশেই রয়েছে 'ফ্ল্যাট আর্থ সোসাইটি'-র কেন্দ্রীয় দপ্তর - বছরে একবার ধুমধাম করে পৃথিবী যে গোলকার নয়, বরং চ্যাপ্টা থালার মতো, তাই নিয়ে রীতিমতো 'তাত্ত্বিক' আলোচনা হয়! ঝাড়-ফুঁক, ডাকিনীতন্ত্র ইত্যাদি যে মার্কিন সমাজের মূলস্রোতের বিষয়, তা মার্কিন গল্প-উপন্যাস-চলচ্চিত্রের দিকে নজর করলেই বোঝা যায়। একদিকে চূড়ান্ত আর্থিক অসাম্য, অন্যদিকে হিংসা-দ্বেষ-রিরংসা তাড়িত সমাজটি বিজ্ঞানকেও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অগম্য রহস্যময় জগতের বাসিন্দা বানিয়ে রেখেছে।

বস্তুত এই সমস্ত অবৈজ্ঞানিক, যুক্তিহীন বা কুযুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত কাজকর্মগুলির ব্যবসায়িক দিকটি মোটেই অবহেলার বিষয় নয়। আর গণ/জন/লোক বিজ্ঞানের বিতর্কের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে খেতে আমরা 'অরাজনৈতিক' হয়ে 'গ্রহণযোগত্যা' বাড়ানোর উদগ্র তাড়নায় বিষয়টির দিকে নজর দিইনি একদম। গণেশের দুধের সঙ্গে সেদিন সারা দেশে বেটিং, জুয়া, শেয়ার ইত্যাদির যোগ ছিল প্রত্যক্ষ - ইংল্যান্ডে এই গুজবের ফলে বাজারে দুধের বাড়তি জোগান এসেছিলো। একটি ওয়্যারলেস কম্পানির 'সৌজন্যে' সমুদ্রের জাহাজগুলিতে 'গণেশের দুধের বিশেষ বুলেটিন' প্রচারিত হয়েছিলো - পয়সার বিনিময়ে।

প্রায় একই ভাবে 2006তে 'গণেশের দুধ উগরানো'-র কাহিনী ব্যাপক প্রচারিত হয়। কিন্তু ততদিনে এরকম বহু বিষয় এসে যাওয়ায় বিষয়টি মাত্র কয়েক ঘন্টা স্থায়ী হয়। গণবিজ্ঞানের কর্মীরা বিষয়টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় যতটা মন দিয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক কম উদ্যম নিয়ে তারা বিষয়টির অসম্ভব্যতা নিয়ে প্রচার চালিয়েছেন। গণেশ যে দুধ 'খেতে' অপারগ, এই বিশ্বাসের পেছনে তত্ত্ব-যুক্তি-বাস্তবতার কোনো বনিয়াদই নেই— এমন প্রচারে হয়ত আমরা ভয় পেয়েছি পাছে 'পরম্পরা-বিরোধী' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়ি। সে দিনের অসমাপ্ত বহু-ভ্রান্তির দেওয়ালে সিঁদ কেটে আজ আসছে পুষ্পক রথ, গণেশের মাথার প্লাস্টিক সার্জারির তত্ত্ব।

একদিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য আর্থিক বিনিয়োগ কমছে, জ্যোতিষ, পুরোহিত বিদ্যার পঠন বাড়ছে— অন্যদিকে ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের অধীনে নতুন

গবেষণাগারের শিলান্যাসের সময় নারকোল ভেঙে ভিৎ পূজো পাঁজি মেনে শুভলগ্নে মন্ত্রী মশাই সিমেন্ট ঢালছেন। এইভাবেই বিজ্ঞানের বিপরীতে অবস্থানকারী ধ্যান-ধারণার আত্তীকরণ ঘটছে 'সরকারি বিজ্ঞান বিলাসিতা'-র মোড়কে! আরও কত পানসারে, দাভোলকররা শহীদ হলে তবে আমাদের ইঞ্চিখানেক অগ্রগতি ঘটবে কে জানে। বিজ্ঞানের রাজনীতিই অ-বিজ্ঞানের অ-রাজনীতি ও কু-রাজনীতিকে পরাজিত করতে পারে - ইতিহাসের শিক্ষা অন্তত তাই।

দুই

নয় নয় করে এ রাজ্যের গণ-জন-লোক-বিজ্ঞান আন্দোলনের বয়স চল্লিশ পার হলো। চালসের দৃষ্টি সরিয়ে এই চার দশকে কী পেলাম তার একটি হিসাব নেওয়া যেতে পারে। জরুরী অবস্থার অবসানে নানা রংয়ের সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মীবৃন্দ অনেক প্রয়োজনীয় প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন। দেখা যায় যে সমাজ-পরিবর্তনের দুরূহ প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকায় আরও অনেক প্রশ্নের সমাধানের দিকে নজর পড়েনি, যদিও নজর পড়া উচিত ছিলো। সেই আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে সামনে আসে বিজ্ঞান মনস্কতা প্রচার ও প্রসার, যা সমাজে যুক্তিবাদের প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করবে। পাশাপাশি উঠে আসে কুলীন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যন্তরে জমিদারি প্রথায় চলা সম্পর্ক - যেখানে একদিকে চলছে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণা আর অন্যদিকে বিরাজ করছে বিজ্ঞান কর্মী ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রভু-ভৃত্য-সুলভ সামন্ত সম্পর্ক।

জরুরি অবস্থার অবসানে সমাজে গণতন্ত্রের চাহিদা প্রায় সর্বস্তরে অনুভূত হয়। গড়ে ওঠে বিজ্ঞান কর্মীদের একান্ত নিজস্ব সংগঠন - বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা বা Scientic Workers' Forum। আমাদের ছাত্রাবস্থায় তা তিন অক্ষরের পরিচিত নাম গ্রহণ করে এস.ডব্লু.এফ। পাশাপাশি চলতে থাকে এই সংস্থার দ্বি-ভাষিক পত্রিকা - 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'। এটিরও চালু রূপ আজও অব্যাহত— 'বি-ও-বি'। এই বাজারে দীর্ঘায়ু পত্রিকাগুলির অন্যতম। খাদ্য আন্দোলনের পটভূমিতেও অনেক বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে ওঠে - কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলন যে প্রবাহের সৃষ্টি করেছিলো বাঙালী সমাজে, বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন কিন্তু তার ধারে কাছেও পৌঁছোতে পারেনি। অথচ বিজ্ঞান ক্লাবের সূচনাপর্ব কম প্রাসঙ্গিক ছিল না—তার সঙ্গে নাড়ির যোগ ছিল স্বদেশী আন্দোলনের। স্বদেশী মেলায়, 1905-এ যে দেশীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর উপকরণের পসরা হাজির করা হয়েছিলো, সেই উদ্যোগকে সামাজিকভাবে আরও প্রাসঙ্গিক করার তাগিদেই 1931-এ গঠিত হয়েছিল বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির 220 বছর পূর্তি উপলক্ষে লেনিনগ্রাদে সারা পৃথিবীর সমাজ-সচেতন বিজ্ঞানীরা সমবেত হন এবং সেখান থেকেই গড়ে ওঠে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশান অফ সাইন্টিফিক ওয়ার্কার্স। এই ফেডারেশান গড়ার সভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। এই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে লেখেন জে. ডি. বার্নাল, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সায়েন্স এ্যান্ড কালচার' পত্রিকায় (বর্ষ-12, সংখ্যা-3 সেপ্টেম্বর 1946, পৃ.115)।

সত্তর দশকের সেই প্রবল দিনগুলিতেও গণ-বিজ্ঞানের শিখা ইতিউতি প্রজ্জ্বলিত ছিল। 1971-এর যাদবপুর বললেই মনে ভাসে পুলিশ-জনতা বা পুলিশ-ছাত্র সংঘর্ষ, শহীদ আশু মজুমদার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তিমির বরণ সিংহ, স্মরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এক ঝাঁক তরুণ শহীদ ছাত্রদের কথা আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরি বিভাগের ছাত্রদের বার্ষিক মুখপত্র, 'ছায়াপথ'-এর কথা। এই সময়েই গড়ে ওঠে যাদবপুর সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন। শহীদ দ্রোণাচার্য ঘোষের হুগলিতে জন্ম হয় চন্দননগর সায়েন্স ক্লাবের (1971)। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রভাবিত র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট গোষ্ঠী এক সময় সিদ্ধান্ত নেয় যে কোনও কেন্দ্রীয় পার্টি কাঠামো এড়িয়ে তারা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে সমাজে রায় বর্ণিত নব-মানবতাবাদ প্রচার করবে। 1973-এ এই ধারার এক সার্থক প্রতিনিধি মণি দাসগুপ্ত গড়ে তোলেন গোবরডাঙ্গা রেনেশাঁ ইনস্টিটিউট। 1974 থেকে 1979 পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় আরও অনেক বিজ্ঞান ক্লাব ও সংগঠন গড়ে ওঠে। এই গভীর রাজনৈতিক বীক্ষা এবং অন্বেষার ফসল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনগুলি তৎকালীন গণতন্ত্রর প্রতি আগ্রহের জল-হাওয়ায় পুষ্টি লাভ করতে থাকে।

1980র গোড়ায় জন্ম হলো 'মানুষ' এবং পরে 'উৎস মানুষ'-এ রূপান্তরিত হওয়া পত্রিকার। সমাজের অপূর্ণ

চাহিদা মেটাতে এগিয়ে আসা এই জাতীয় সংগঠন ও পত্রিকাগুলির দ্রুত সামাজিক প্রতিষ্ঠা এক নতুন ধারণা, এক নতুন মতবাদিক আন্দোলনের সূচনা বিন্দু নির্ধারণ করে।

এস.ডব্লু.এফ. তখন তার স্লাইড শো, মাসিক বক্তৃতামালা ইত্যাদি নিয়ে গ্রামে গঞ্জে ছুটে বেড়াচ্ছে। জপুরে রাসায়নিক দূষণ, কুন্তিঘাটে তাপ বিদ্যুতের ছাই, কল্যানীর সতীমার মেলা - সব জায়গাতেই গণ-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল উপস্থিতি। ভূপাল গ্যাস কান্ড নতুন করে প্রচারের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। আজ পেছন ফিরে দেখলে মনে হয় যে ভূপাল-ভিত্তিক আন্দোলন ক্রমশ বিদেশী অর্থ পুষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পুরোপুরি কব্জায় চলে যাওয়ার পেছনে কি আমাদের কোনও 'অবদানই' নেই? ভূপাল নিয়ে প্রথম মিছিলেন ডাক দিয়েছিলো বি-ও-বি। র-চ-র ঘরে নাজেসের উদ্বেগপূর্ণ খবরের ভিত্তিতে! 'পৃথিবীর আর কোথাও ভূপাল নয়' শিরোনামে ছাপা/লেখা স্লিপ হাতে হাতে বিলি করে মিছিল সংগঠিত হয়েছিল। বি-ও-বির পাতায় ক্রমাগত ভূপাল নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, যখন ডাক্তারদের ক্যামা মধ্যপ্রদেশ সরকার ভেঙে দিয়েছে গৌতম, ডেভিডকে গ্রেপ্তার করেছে, তখনও বি-ও-বি তার প্রতিবাদ জারি চেয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টে নিযুক্ত ভূপালের কমিটিতে কোলকাতার চিকিৎসক প্রতিনিধি ছিলেন, কোলকাতার ডাক্তারি ছাত্ররা পালা করে ভূপালে গিয়ে ক্লিনিক চালিয়েছেন, কলকাতার সঞ্জয় মিত্র ভূপালের 'মা ও শিশু'-র মূর্তি নির্মাণের অন্যতম নাম, তবুও ভূপাল আন্দোলনের রাশ চলে গেছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির হাতে। এ নিয়ে আমাদের আত্ম-সমীক্ষা তেমন চোখে পড়েনি, সেই চিরাচরিত 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব'-র নিশ্চিন্ত বর্মের আড়ালে আমরা মুখ ঢেকে নিজেদের বিবেককে সান্ত্বনা দিয়েছি! ভূপাল আমাদের সামনে বিশ্বায়ণের নান্দীমুখকে বেপর্দা করার, বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে ভারত সরকারের আঁতাত বেপর্দা করার এবং জল-সার-কীটনাশক-বীজকে ঘিরে বহুজাতিক তথা আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতির নাটকটি মঞ্চস্থ হচ্ছিল, সেটিকে 'রাজনৈতিক' হয়ে পড়ার মন-গড়া আশঙ্কায় দূরে সরিয়ে রেখেছি। গণ-বিজ্ঞানের মতো একটি আদ্যন্ত রাজনৈতিক শক্তি যখন 'অ-রাজনৈতিক' প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন মঞ্চ প্রস্তুত হয় 'স্বেচ্ছাসেবী' সংগঠনের জন্য - তারা মঞ্চের কেন্দ্রস্থল দখল করে। বেদনার সঙ্গে এই ইতিহাস স্মরণ করা প্রয়োজন।

আমাদের সামনে দ্বিতীয় সুযোগ ছিলো ঘরের পাশে - সুন্দরবন ফার্টিলাইজার কম্পানির বিরুদ্ধে আন্দোলনে। মন্দির বাজারে বিশুদ্ধদারা সব ধরণের সামাজিক সংগঠনের সাহায্যে তখন সরকারি মদতপুষ্ট কম্পানিটিকে পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য করলেন, তখনও আমরা গা-ছাড়া ভাব নিয়ে রাসায়নিক সার নিয়ে তেমন প্রচার করিনি। সুযোগ এসেছিলো যখন সেই সংস্থা জলপাইগুড়িতে আবার সিঙ্গল সুপারফসফেট কারখানা খোলার উদ্যোগ নেয় এবং খানিকটা সফল হয়। পরিবেশ বাঁচানোর আন্দোলনে অংশ নিয়ে শহীদের তালিকা তখন বাড়ছে, গোয়া ছাড়িয়ে জলপাইগুড়িতেও পুলিশের গুলিতে এই আন্দোলনের একজন শহীদ হলেন। গণ-বিজ্ঞান আন্দোলন তখন তুঙ্গে থাকা সত্বেও সামাগ্রিক ভাবে গণ-বিজ্ঞানের কর্মীরা ফেটে পড়লেন না। বিজ্ঞানমঞ্চ এবং উন্নয়নপন্থীদের সঙ্গে নিষ্ফলা বিতর্কে গিয়ে আমাদের সব আন্দোলনের তীব্রতা ক্ষয়প্রাপ্ত হলো।

জলাভূমি বাঁচানো বা পরিবেশ আন্দোলন তখন গণ-বিজ্ঞানের মূল ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। গঙ্গা দূষণ রোধে সুপ্রীম কোর্টের হস্তক্ষেপ, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের ফলে বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রস্থান ইত্যাদি আমাদের আন্দোলনকে ক্রমশ আদালত-নির্ভর করে তুলছে। সই সংগ্রহ অভিযান, ডেপুটেশন, মামলা ইত্যাদির বিষময় চক্রে, আমাদের শক্তি আপাতত কেন্দ্রীভূত - কর্মীর অভাবে সংগঠনগুলি ধুঁকছে। এই সময়ে আমাদের হয়ত একমাত্র জয়ের কাহিনী বলতে মৌড়িগ্রামে স্লটার কারখানা আল্লানাকে রুখে দেওয়া।

ইতিমধ্যে বাংলার আকাশ-বাতাসে পরিবর্তনের হাওয়া। আমাদের অনেকেই সেই হাওয়ায় উড্ডীন। পরিবর্তন অবশেষে সাধিত হলো। এইবার কাজের পালা। আমাদের অনেকেই এখন শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবেশ-সংস্কৃতি জগতের নীতি নির্ধারক কমিটিগুলির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। পরিবর্তনের আগে আমরা মোবাইল টাওয়ারের ক্ষতিকর দিক নিয়ে প্রচার এবং আন্দোলন করেছি - দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে ডেপুটেশন দেওয়ার সময়ে জেনেছি যে পর্ষদের হাতে নাকি এই দূষণ প্রতিরোধের যথেষ্ট আইন নেই। আমরা আইনী সংস্থান দেখিয়েছি এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের এই বিষয়ে নিষ্ক্রিয়তাকে তাদের সরকার-প্রেমের সংকেতবাহী বলে তিরস্কার করেছি। তখন আমাদের বন্ধু, সেদিনের আন্দোলনের সাথীরা, যাঁরা তখন পাকেচক্রে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য, তাঁরা বলছেন যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ

পর্ষদের হাতে নাকি সত্যিই আইন নেই, অতএব কিছুই করার নেই! তাহলে পরিবর্তনের আগের আমলে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কী দোষ করেছিলো? সেখানে আমাদের আন্দোলনের বন্ধুদের অর্ন্তভুক্তি ঘটেনি, এটাই তাহলে মূল বিষয় ছিলো?

1985 থেকেই অ্যান্টি নিউক্লিয়ার ফোরাম সহ প্রায় পুরো গণ-বিজ্ঞানের ধারাটি পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতে বাণিজ্যিক পরমাণু চুল্লি বসানোর বিপক্ষে। দু দুবার এই রাজ্যে এই বাণিজ্যিক পরমাণু চুল্লি বসানো প্রবল আন্দোলন করেই থামানো গেছে—এমন কি সরকারি গণ-বিজ্ঞান সংস্থা, 'বিজ্ঞানমঞ্চ'-এর একাংশকেও এই বিরোধিতায় সামিল করা গেছে। কিন্তু পরিবর্তনের পর এই আন্দোলনে যুক্ত বড় অংশটিই বর্তমান সরকারের আপাতত চুল্লি-বিরোধী অবস্থানকে সম্বল করে আন্দোলন, প্রচার বন্ধ রেখেছেন। তাঁরা ভুলে গেছেন যে 123 চুক্তি মতে ভারত সরকারকে 2018-এর মধ্যে সারা ভারতে 8টি চুল্লি বসাতেই হবে এবং 8ম চুল্লিটির অবস্থান এই পশ্চিমবঙ্গেই হবে। এখানেও আমাদের আন্দোলনের কর্মীরা এখন সরকারের 'পক্ষে'। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার লাইন কী আশ্চর্য রকম সফল ভবিষ্যতবাণী:

তাই শত্রুর তপ্ত ভোজে হে প্রিয়
ধরেছো ঠান্ডা ধুয়ো!

তিন

1940 থেকে 1971 - এই দীর্ঘ সময় ব্যায়িত হয়েছিলো গণ-বিজ্ঞানের সামাজিক মান্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠায়। 1947-এর পর স্বাদেশিকতার আবেদন জনমানসে ফিকে হয়ে আসে - তার ছায়া পড়ে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ও রাজনৈতিক কাজকর্মে। 1967-র পর ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়ার এক পরিবর্তন গণ-বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রেক্ষিতটি নির্মাণ করে দেয়। 1990-এর থেকে বন্ধ্যা রাজনীতি, বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে দিশাহীনতা এক ঝাঁক কর্মী-নেতাকে পরিবর্তনপন্থী করে তোলে।পরিবর্তন, বিবর্তন সরলরৈখিক নয় - অনেক সময় তা পশ্চাৎগামীও। চল্‌তি-হাওয়ার-পন্থী হওয়ার উন্মাদ আগ্রহে আমরা বিসর্জন দিয়েছি আমাদের মতাদর্শকে, হারিয়ে ফেলেছি গণ-বিজ্ঞানের রাজনৈতিক তাৎপর্যকে। মোহ-র বশে, বয়েস ভারাক্রান্ত হয়ে ভুলে গেছি "চকচক করিলেই সোনা হয়না"—মায়াহরিণের পেছনে বৃথা ছুটে চলা বন্ধ করে আমরা স্থিত হই। পুনরুদ্ধার করি আমাদের অতীতকে, আজকেই, কালকে সোজা এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

With Best Compliments from

AIMBEE

36/1/1 Pulin Khatik Road (Tangra Road), Kolkata-700015
Contact No: 9330446711 (2 p.m. to 8 p.m.)

Services for

Pest Control - Dusting & Cleaning - Book Preservation
White Ant Treatment - Termite Control - General Order Supply

References:

Calcutta University (Departments, Libraries, Laboratories, Accounts Offices, etc.)

Banks:

Central & State Government Offices

তিলোত্তমাও কি ক্রমশঃ ধোঁয়াশার করাল গ্রাসে?

অপর্ণা চক্রবর্তী
[apachakrabarti@hotmail.com]

হঠাৎ আকাশের সব আলো কে যেন শুষে নিল। কলকাতা বিমানবন্দরের অফিসারদের কার্যত হতবাক করে দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে দৃশ্যমানতা নেমে এল হাজার মিটার থেকে পঞ্চাশ মিটারে। এতটাই আচমকা এই অন্ধকারের নেমে আসা, যে কোনো বিমানকেই আগে থেকে সতর্ক করতে পারেনি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল। ফলে 2 মার্চ 2017, বৃহস্পতিবার, সকাল সাতটা চল্লিশ মিনিটের পরে কলকাতায় নামতে আসা সাতটা বিমানকে মুখ ঘুরিয়ে উড়ে যেতে হয় অন্য শহরে। পরে আকাশ পরিষ্কার হতে সেগুলো ফিরে আসে। শহরের নামী খবরের কাগজে 3 মার্চ ঘটনার রিপোর্ট বের হয়। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের কর্তা শ্রী গোকুল চন্দ্র দেবনাথ এবং আরও কিছু আবহাওয়াবিদের মতে হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া ধোঁয়াশার কারণেই এই আচমকা অন্ধকার ও বিপত্তি। বঙ্গোপসাগরে উচ্চচাপের কারণে সেদিন প্রচুর জোলো হাওয়া রাজারহাট, নিউটাউন প্রভৃতি বিমানবন্দর সংলগ্ন অঞ্চলে ঢোকে। তাপমাত্রা এবং হাওয়ার গতি ছিল কম। বাতাসে দূষণের মাত্রা ছিল খুব বেশি। বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণা (পার্টিকুলেট ম্যাটার বা পিএম) কুয়াশার সঙ্গে মিশে অল্প সময়ের মধ্যে জমাট বেঁধে ধোঁয়াশা তৈরি করে। মার্চের গোড়ায় এমন ঘটনা সাধারণতঃ ঘটে না।

ধোঁয়াশার 'কি' ও 'কেন'

ব্যাপারটা ভাববার, সারা পৃথিবীর বড় বড় শহরে কেন এত ধোঁয়াশা বা স্মগ্-এর প্রাবল্য? প্রকৃতিতে শিল্পবিপ্লবের (1750 সাল) আগে ধোঁয়াশার অস্তিত্ব ছিল না। তখন ঠাণ্ডার সময় মাঝে মাঝে কুয়াশা (fog) দেখা যেত। শীতকালে বাতাসের উষ্ণতা হঠাৎ শিশিরাঙ্কের (যে উষ্ণতায় বাতাস তাতে থাকা জলীয়বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয়) নীচে নেমে গেলে জলীয় বাষ্প ছোট ছোট জলকণায় পরিণত হয়ে বাতাসের ধূলিকণা আর অন্যান্য দূষণ সৃষ্টিকারী কণাগুলোকে আশ্রয় করে ভাসতে থাকলে যে অস্বচ্ছ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাই হল কুয়াশা; আর কুয়াশার সাথে যানবাহন, শিল্পকারখানা থেকে বের হওয়া ধোঁয়া (smoke) মিশে তৈরি হয় ধোঁয়াশা। শীতকালে বাতাস যখন স্থির থাকে ধোঁয়াশা বেশ কিছুটা অঞ্চল জুড়ে পাকাপাকিভাবে স্থায়ী হয়। এখানে বাতাসের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এমনিতে পৃথিবীতে মাটি কাছাকাছি থাকা বাতাসের উষ্ণতা বেশি হয়, যত উচ্চতা বাড়ে উষ্ণতা তত কমতে থাকে। কিন্তু কুয়াশা সৃষ্টির সময় ব্যাপারটা উল্টো হয়ে যায় (প্রাকৃতিক কারণে), অর্থাৎ মাটির কাছাকাছির বাতাস উপরের অঞ্চলে থাকা বাতাসের তুলনায় বেশী ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। এই ঘটনাকে উষ্ণতার ইনভারসন (inversion) বলা হয়।

'স্মগ' (smog) কথাটার প্রথম প্রচলন হয় বিশ শতকের গোড়ায়। স্মোক্ ফগ্ একসাথে করে স্মোকি ফগ্ (smoky fog) এবং তার অস্বচ্ছতা ও গন্ধ বোঝাতে 'স্মগ' কথাটার প্রথম ব্যবহারকারী হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে Dr. Henry Antoine Des Voeux-এর নাম। 1905 সালে লন্ডনের পাবলিক হেলথ্ কংগ্রেসে পড়ার জন্য তাঁর গবেষণাপত্র 'Fog and Smoke'-এ এই কথাটির উল্লেখ করেন তিনি। লন্ডনের খবরের কাগজ 'ডেইলি গ্রাফিক' 26 জুলাই 1905-এর সংস্করণে তাঁকে উদ্ধৃত করে বলে যে বড় বড় শহরে যেমন লন্ডনে, যা প্রায়শই দেখা যায়, অথচ গ্রামাঞ্চলে যার টিকিটি দেখা যায় না তাকে বোঝার জন্য গূঢ় বিজ্ঞানের দরকার হয় না, এটা হল স্মোকি ফগ বা 'স্মগ'। বিখ্যাত লন্ডনের কুয়াশার জন্য Dr. Voeux যথোপযুক্ত নতুন এক শব্দের ব্যবহার করে সত্যিই যে বড়মাপের কাজ করেছেন, তা জানাতেও ভোলে না সংবাদপত্রটি। অবশ্য এর কিছু আগেও কথাটা ব্যবহৃত হয়েছিল বলে জানা গেছে। 19 জুলাই 1893 'লস্ এঞ্জেলেস্ টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক কৌতুকপ্রিয় অনামী ইংরেজ লেখকের প্রতিবেদনে 'স্মগ্' শব্দটি পাওয়া যায়। শহরের বিখ্যাত কুয়াশা নিয়েই প্রতিবেদন লেখা হয়েছিল। অবশ্য এটা ঠিক যে Dr. Voeux বিশেষজ্ঞদের সভায় কথাটা

প্রথম উত্থাপন করেন, তাই তাঁর নামের সাথে স্মগের প্রথম পত্তনকারীর নাম অনেক বেশি স্বীকৃতভাবে জড়িয়ে গেছে।[1] বাংলায় ধোঁয়াশা শব্দটা অস্পষ্টতা বা অস্বচ্ছতা (কোনো কিছু স্পষ্টভাবে বলা বা মতামত দেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা) বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এই শব্দটাই স্মগের মত একটা প্রাকৃতিক ঘটনা বোঝানোর জন্য প্রথম কবে বাংলায় ব্যবহার হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা নেই।

পরিবেশে ধোঁয়াশা তৈরির জন্য যে বিষয়গুলি সরাসরি দায়ী সেগুলো হল, বায়ুদূষণ, কম তাপমাত্রা, বাতাসের শুষ্কতা, এবং বাতাসের প্রবাহমানতা কমে যাওয়া; এই চারটি বিষয়ের মধ্যে শেষ তিনটি প্রাকৃতিক, এতে মানুষের কোন হাত থাকে না। তবে বায়ুদূষণের কারণগুলো এখানে আলোচনার দাবি রাখে। কয়লা, যানবাহন, শিল্পকারখানা, বাড়িঘর-রাস্তার নির্মাণ সামগ্রী আর জৈব ও অজৈব আবর্জনা—এগুলোকে বায়ুদূষণের মনুষ্যসৃষ্ট উৎস বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। এর সাথে অপ্রতিরোধ্য প্রাকৃতিক কারণ হিসাবে দাবানল, ধূলিঝড় এবং আগ্নেয়গিরির ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। গৃহস্থালীর প্রয়োজন বা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লার দহনে যে ধোঁয়া তৈরি হয় তা বায়ুদূষণ তথা ধোঁয়াশার প্রধান কারণ। এই ধোঁয়ায় কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড প্রভৃতি বিষাক্ত গ্যাস ছাড়াও প্রচুর পরিমানে দূষককণা (পার্টিকুলেট ম্যাটার বা পিএম) থাকে। কয়লা থেকে এই ধরনের বায়ুদূষণ ইংল্যান্ডে মধ্যযুগ থেকে চলে আসছে বলে জানা যায়। বিশ শতকের মাঝের দিকে কয়লার ধোঁয়া জনিত স্মগের কারণে লন্ডন শহর তো কুখ্যাত হয়ে আছে। সারা বিশ্বে এটি 'লন্ডন স্মগ' নামে পরিচিত। এর স্থানীয় প্রচলিত নাম হল pea-soupers (প্রচলিত কথা as thick as pea soup থেকে এসেছে)। যে যে শহরে এখনও যথেষ্ট পরিমানে কয়লা পোড়ানো হয় সেখানে বায়ুদূষণ শহরবাসীর কাছে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ হিসাবে চীনের হারবিন (Harbin) শহরের 2013 সালের শরৎকালের স্মগের কথা বলা যেতে পারে, যার কবলে পড়ে শহরের যান চলাচল, এয়ারপোর্ট ও স্কুলগুলো কিছুদিনের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। ট্রাক, বাস বিভিন্ন ধরনের গাড়ি যেগুলো পেট্রল-ডিজেলের মত জীবাশ্ম জ্বালানিতে চলে তাদের ইঞ্জিন থেকে নির্গত ধোঁয়া বায়ুদূষণের আর এক অন্যতম প্রধান উৎস। কয়লার ধোঁয়ার মত বিপজ্জনক গ্যাস ও পিএম ছাড়াও এর মধ্যে মিশে থাকে বিভিন্ন ধরনের গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন। হাইড্রোকার্বন অণুগুলো সূর্যের আলোয় জলীয় বাষ্প, অক্সিজেন প্রভৃতির সঙ্গে বিক্রিয়া করে ওজোন, অ্যালডিহাইড, PAN জাতীয় বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে। এর থেকে উৎপন্ন হওয়া ধোঁয়াশা 'ফোটোকেমিক্যাল স্মগ' নামে পরিচিত। বিশ শতকের মাঝের দিক থেকে লস্ এঞ্জেলেস্ শহরের সঙ্গে ফোটোকেমিক্যাল স্মগের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। শিল্পকারখানা থেকে নির্গত উপজাত গ্যাস বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সঠিকভাবে পরিশোধন না করেই বাতাসে মেশানো হয়। এই গ্যাসগুলির বায়ুদূষণে ভূমিকা কয়লার দহন বা যানবাহন নিঃসৃত গ্যাসের থেকে কোনো অংশে কম নয়। এছাড়া অ্যাসবেস্টস, সিমেন্ট কারখানা, কয়লাখনি থেকে নির্গত গ্যাসে প্রচুর পরিমানে সিলিকা বা কার্বন কণার মত পিএম মিশে থাকে। কনস্ট্রাকশনের কাজের জন্য ইঁট, বালি, সিমেন্টের মত উপকরণ রাস্তার ধারে খোলা অবস্থায় দিনের পর দিন ফেলে রাখা হয়, না ঢেকে বাড়ি বা রাস্তা তৈরির কাজ চলতে থাকে, এছাড়াও খোলা পাত্রে পীচ গলানো হয়। সব ঘটনাগুলোই বায়ুদূষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষাক্ত গ্যাস আর পিএমের ভালো রকম জোগানদার। বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা প্লাস্টিক সহ নানা জৈব ও অজৈব আবর্জনা এক জায়গায় সংগ্রহ করে পুড়িয়ে নষ্ট করে দেওয়ার পদ্ধতি আমরা শহরে গ্রামে নানা জায়গায় দেখতে পাই। এর থেকে তৈরি হাওয়া ধোঁয়ায় বিভিন্ন বিপজ্জনক গ্যাসের সঙ্গে ক্যানসার সৃষ্টিকারী জটিল জৈব যৌগও উপস্থিত থাকে। বায়ুদূষণের এক প্রাকৃতিক কারণ হল দাবানল। দাবানল প্রবণ অঞ্চলে মাঝেমধ্যেই আগুন লাগে, যা সহজে নেভে না। বলাই বাহুল্য এর থেকে তৈরি বিভিন্ন গ্রীণ হাউস গ্যাস আর ছাই বাতাসে মিশে দূষণ ঘটায়। যে সব জায়গায় ভৌগোলিক কারণে বালির অধিক্য বেশি সেখানে অনেক সময় ধূলিঝড় দেখা যায়। এই ধূলিঝড় বাতাসে ধূলিকণা, বালির সূক্ষ্মকণার পরিমান অনেক বাড়িয়ে দেয়। উদাহরণ হল সৌদি আরবের রিয়াধ শহরে ধূলিঝড়ের কারণে সৃষ্ট স্মগ। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বাতাসে সালফার ডাই অক্সাইডের মত বিষাক্ত গ্যাস আর প্রচুর পরিমাণে পিএম বায়ুতে মেশে। এই দূষণে যে স্মগ তৈরি হয় তাকে 'ভগ' (Vog) নামে অভিহিত করা হয়।[1]

ধোঁয়াশার মারণ বিষের জ্বালা

ধোঁয়াশা এখনকার দিনে বিশ্বের বড় বড় শহরগুলোতে কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রভাবে দৃশ্যমানতা কমে যায়, ফলে রাস্তায় যান চলাচল, বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামার কাজ ব্যাহত হয়। স্মগের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের ওপর। দূষিত বাতাসে যে সব বিষাক্ত গ্যাস আর পিএম মিশে থাকে সবগুলোই প্রাণী শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, কণাগুলোর মধ্যে যাদের ব্যাস 5 মাইক্রন-এর (পিএম 5) থেকে বেশি সেগুলো নাকের গহ্বরেই আটকে যায়। এর থেকে ছোট মাপের কণাগুলো প্রশ্বাসের সাথে ফুসফুসে প্রবেশ করে, সঙ্গে নিয়ে যায় কণার পৃষ্ঠতলে আটকে থাকা বিভিন্ন বিপজ্জনক রাসায়নিক যেমন পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন, অ্যালডিহাইড প্রভৃতি। এর ফলে মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণীদের ফুসফুসের সমস্যা, হাঁপানি, যক্ষা, স্নায়ুর রোগ, হরমোনের সমস্যা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, হৃদরোগ এমনকি ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে, এর সঙ্গে চোখ জ্বালা, এলার্জি, সর্দিকাশি তো আছেই। বিষাক্ত ধোঁয়ায় ফুসফুসের ক্ষতিসমূহের আলোচনা করে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার এক অধ্যাপকের কথার সূত্র ধরে বলা হয় 'বিভিন্ন ভাসমান কণা, ফুসফুসের বায়ুপথ ও বায়ুথলিতে জমলে তা থেকে অকালেই হাঁপানি হতে পারে। কিন্তু যানবাহনের ধোঁয়া ফুসফুসে গিয়ে জমা হলে ধোঁয়ায় মিশে থাকা বেঞ্জিন ঘটিত রাসায়নিকগুলো ধীরে ধীরে বায়ুথলির কোষগুলিকে মেরে ফেলে। যার নিট ফল হল ফুসফুসের ক্যানসার। শহরের যাঁরা বাসিন্দা বিশেষত বয়স্ক নাগরিক ও শিশুরা তাঁদের পাশাপাশি যাঁরা বাইরে থেকে শহরে নানা কাজের জন্য আসছেন তাঁরাও এই মারাত্মক দূষণের শিকার।'

একটি আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটি জানাচ্ছে স্মগ সৃষ্ট শ্বাসকষ্টের অসুস্থতা থেকে শহরবাসীর অকালমৃত্যুর হার বেড়ে গেছে। ল্যাঙ্কেস্টার ইউনিভার্সিটির (Lancaster University) গবেষকরা দূষণ কবলিত মেক্সিকো ও ম্যাঞ্চেস্টার শহরে বসবাসকারী 3 থেকে 92 বছর বয়সী 37 জন নাগরিকের ওপর পরীক্ষা করে তাদের মস্তিষ্কে যথেষ্ট পরিমাণে ন্যানো ম্যাগনেটিক কণার সন্ধান পেয়েছেন। এগুলিকে তাঁরা নার্ভের সমস্যা আর অ্যালজাইমার্স রোগের সম্ভাব্য কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেন। 1997 থেকে 2006 সালের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার সান জোকুইন ভ্যালির (San Joaquin Valley) ধোঁয়াশা আক্রান্ত এলাকার জন্মগত ত্রুটিযুক্ত 806 জন শিশুর মা আর 849 জন সুস্থ শিশুর মায়েদের ওপর আর একটি গবেষণা চালানো হয়েছিল। এতে দেখা যায় স্মগ কবলিত জায়গায় জন্মানো শিশুদের দু'রকম জন্মগত ত্রুটির সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে, একটি মেরুদণ্ড ও অন্যটি মস্তিষ্কের গঠনগত ত্রুটি। এছাড়াও এইসব অঞ্চলে স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজনের শিশু জন্মানোর প্রবণতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।[1]

ধোঁয়াশা যে মানুষের শরীর স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক, তা যে বন্যা, খরা বা ভূমিকম্পের মত মানষের অকালমৃত্যুকে ডেকে এনে নগরজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে তা মানুষ প্রথম জেনেছিল দুটো আলোড়ন তোলা বায়ুদূষণের ঘটনার পর থেকে। 'লন্ডন স্মগ' আর 'লস্ এঞ্জেলেস্ স্মগ' নামের পৃথিবীর দুটো বড় বড় শহরকেন্দ্রিক ধোঁয়াশার কথা আজ পরিবেশ সচেতন প্রত্যেক মানুষের কাছে পরিচিত। 1952 সালের 5 থেকে 9 ডিসেম্বর পুরো পাঁচটা দিন লন্ডন শহর ও তার আশপাশের এলাকা ঢেকে গিয়েছিল ঘন ধোঁয়াশায়। অবস্থা এমন হয়েছিল যে পাঁচদিন ধরে সূর্যের মুখ দেখা যায়নি, ট্রেন, গাড়ি, বিমান - সমস্ত যান-চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ঐ ক'দিন। শুধু মেট্রোরেল চালু ছিল। মানুষ রাস্তায় বের হতে পারত না। যারা নিতান্ত প্রয়োজন বাইরে যেত, তাদের সারা শরীর কয়লাখনির শ্রমিকদের মত ধূসর হয়ে যেত। শহর জীবনকে অচল করে পাঁচদিনে 4000-এর ওপর মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছিল ঐ মারণ ধোঁয়াশা, তার সঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ে আরও বেশ কয়েক হাজার। পরবর্তী একমাসের মধ্যে আরও প্রায় 8000 মানুষ মারা যায়। ধোঁয়াশার ভয়াবহতা জানা না থাকায় তখন প্রথমে মনে করা হত 'ফ্লু'-এর মত কোনো মহামারীতে এত জীবহানি ঘটেছে। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা এই ধোঁয়াশাকে 'the killer smog that blanketed the London' বলে অভিহিত করেন। এই ঘটনাকে পৃথিবীর ভয়ংকরতম বায়ুদূষণ বলা হয়ে থাকে। লন্ডন শহরে শীতকালে ঠাণ্ডা স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ার জন্য কুয়াশা দেখা যায়, আর বহুকাল আগে থেকেই ঠাণ্ডার মোকাবিলা করার জন্য মানুষ

ফায়ারপ্লেসে কয়লা পোড়ায়। ঐ কয়লার ধোঁয়ার সঙ্গে বেরিয়ে আসা বিষাক্ত গ্যাস আর কার্বন কণা কুয়াশার সাথে মিশে ধোঁয়াশা তৈরি করে। সভ্যতার আদিযুগ থেকে শীতকালে অল্পস্বল্প ধোঁয়াশাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চলতে শহরের মানুষ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে ক্রমাগত জনসংখ্যা আর কয়লাকেন্দ্রিক শিল্পকারখানা বাড়ার ফলে 1952 সালের ঐ মারণ ধোঁয়াশার প্রাদুর্ভাব ঘটে। এরপরে সরকার জনমতের চাপে পড়ে ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট 1956 (Clean Air Act 1956) চালু করে। এই আইনে রাজধানী বিভিন্ন ধোঁয়াহীন অঞ্চল গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়। গৃহস্থালী বা শিল্পে অশুদ্ধ কয়লার বদলে কোক ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আইন বলবৎ হওয়ার পর আস্তে আস্তে লন্ডন শহর মারণ ধোঁয়াশা থেকে মুক্তি পায়। দূষণের প্রদুর্ভাব কমার পর থেকে শহরের বড় বড় ঐতিহাসিক সৌধ এবং বাড়িগুলো যেগুলি দু'শ বছর ধরে স্মগের কবলে পড়ে কালিমালিপ্ত হয়েছিল সেগুলি পরিষ্কার করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবার কাজ শুরু হয়। কয়লার ধোঁয়া থেকে মুক্তি পেলেও যানবাহন দূষণ জনিত স্বল্পমাত্রার স্মগ আজও লন্ডন শহরের শীতকালের সঙ্গী।[1]

1948 সালের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের রাজধানী শহর 'লস্ এঞ্জেলেস্' এক প্রবল ধোঁয়াশার আক্রান্ত হয়েছিল। এই স্মগ 'লস্ এঞ্জেলেস্ স্মগ' বা 'ফোটোকেমিক্যাল স্মগ' নামে পরিচিত। এই ধোঁয়াশা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর পর 1943 সাল থেকে অল্প অল্প হয়েছিল। 1948-এ তীব্র আকার নেয়। এখানে উল্লেখ করা ভাল যে 1943-এর 26 জুলাই দুপুরে লস্ এঞ্জেলেস্ শহর হঠাৎ বাদামী ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। শহরবাসী তাতে আতঙ্কিত হয়ে মনে করে জাপানীরা রাসায়নিক অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। যাই হোক 'ফোটোকেমিক্যাল স্মগ' থেকে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য শহরের জনসাধারণ খুব সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রচুর 'অ্যান্টি-স্মগ' গ্রুপ তৈরি হয়েছিল। এদের মধ্যে কয়েকটা গ্রুপ ছিল শুধু মহিলাদের। তারা তাদের শিশুদের গ্যাস-মুখোস পরিয়ে ধোঁয়াশার প্রতিকারের দাবিতে পদযাত্রায় নিয়ে আসত। দলগুলো জনমত সংগ্রহ করে রাজনৈতিক নেতাদের এই ভয়াবহ সংকটের প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করে । সরকারও জনমতের চাপে পড়ে স্বীকার করে নেয় যে ধোঁয়াশা জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।[1]

ধোঁয়াশার রসায়ন

পৃথিবীর যে দু'টো নামকরা শহরের ধোঁয়াশার কথা এখানে উল্লেখ করেছি তাদের ব্যাপার স্যাপার মোটেই একরকম নয়। লন্ডন শহরের কুয়াশার আধিক্য আর সূর্যালোকের অপর্যাপ্ততার প্রসিদ্ধি জগৎজোড়া, এদিকে রৌদ্রকরোজ্জ্বল লস্ এঞ্জেলেস্ শহরে ভৌগোলিক কারণে হালকা ঠাণ্ডা বাতাসের আস্তরণ। দুই শহরের ধোঁয়াশার ক্ষেত্রে সূর্যের আলো আর কুয়াশার ভূমিকা এই দুটো আবহাওয়া কেন্দ্রিক ঘটনার মধ্যে বিভাজন রেখা টেনে দিয়েছে। লন্ডন স্মগের বর্ণ ধূসর, তাতে ধূলিকণা, কার্বনকণা ও সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাসের প্রাধান্য, এর জন্য চাই ভোরবেলাকার ঠাণ্ডা ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া, আর উৎসে রয়েছে মূলত কয়লা। পক্ষান্তরে লস্ এঞ্জেলেস স্মগ দেখতে মোটের ওপর বাদামী রঙের, দুপুরের তীব্র সূর্যালোকে তা ঘটে, এতে থাকে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড, ওজোন, বিভিন্ন গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন, যাদের উৎস হল পেট্রল-ডিজেলের মত জীবাশ্ম-জ্বালানী; ফোটোকেমিক্যাল স্মগের গ্যাসীয় উপাদানগুলির উৎপত্তির জন্য হাজারো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই স্মগের পিছনে সম্ভাব্য যে বিক্রিয়াগুলো সাধারণভাবে দায়ী বলে ভাবা হয় তারা এই রকম:[2]

(1) যানবাহনের ইঞ্জিন থেকে নির্গত নাইট্রিক অক্সাইডে (NO) বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা জারণ ও তার ফলে গঠিত নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইডের (NO_2) অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে ভেঙে একক অক্সিজেন র‍্যাডিক্যাল (O) তৈরি হওয়া। নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড গ্যাস বাদামী রঙের, এই কারণেই ফোটোকেমিক্যাল স্মগ বাদামী বর্ণ ধারণ করে:

$$2NO+O_2 \rightarrow NO_2$$

$$2NO \rightarrow NO_2+O$$

(2) একক অক্সিজেন র‍্যাডিক্যাল বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওজোন (O_3) গ্যাস তৈরি করে। এই বিক্রিয়ায় বিভিন্ন পদার্থের অণু অণুঘটকের কাজ করে:

$$O_2+O \rightarrow O_3$$

(3) খনিজ জ্বালানীর দহনের থেকে বাতাসে মেশা বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন গ্যাস (RH) ওজোন ও নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে পারঅক্সি অ্যাসাইল নাইট্রেট (Peroxy Acyl Nitrate) বা PAN তৈরি করে:

$RH+NO_2+O_3 \rightarrow R^1C(O)O_2NO_2$

পারঅক্সি অ্যাসাইল নাইট্রেটের ফর্মূলা হল—

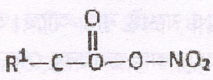

R^1গ্রুপের বিভিন্নতা অনুযায়ী PAN কয়েকটা যৌগের মিশ্রণ।

এর মুখ্য উপাদান পারক্সি অ্যাসিটাইল নাইট্রেট:

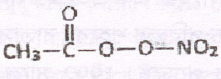

(4) গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন একক অক্সিজেন র‍্যাডিক্যাল দ্বারা জারিত হয়ে অ্যালডিহাইড তৈরি করতে পারে:

$RH+O \rightarrow R^1CHO$

এই রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা চলতে পারে। বলা ভাল, আবহাওয়ামণ্ডলের পরিস্থিতির ওপর (যেমন, উষ্ণতা, চাপ, সূর্যালোক) নির্ভর করে বিক্রিয়াগুলি নিজেরা যে স্থিতাবস্থায় থাকে, তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। আর এই প্রতিযোগিতাই ধোঁয়াশায় কোন কোন গ্যাস কতটা পরিমানে থাকবে তা ঠিক করে দেয়। তবে এখনও পর্যন্ত যতটা জানা গেছে তাতে ফোটোকেমিক্যাল স্মগের প্রধান উপাদানগুলি হল নাইট্রিক অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড, ওজোন, গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন, PAN, অ্যালডিহাইড, ইত্যাদি।

লস্ এঞ্জেলেস্ শহরের সঙ্গে সান জোকুইন উপত্যকাও একই ধরনের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ধোঁয়াশা প্রবণ অঞ্চল হিসাবে কুখ্যাত। লস্ এঞ্জেলেসের অবস্থান হল নিম্ন সমতল উপত্যকায় যার তিনদিক পাহাড় আর একদিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। ঠাণ্ডা সমুদ্র থেকে যে বায়ুস্রোত আসে তা পাহাড় ঘেরা শহরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আর মাটির কাছে তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি হয়ে পড়ে। এতে বাতাসের স্বাভাবিক উল্লম্ব পরিচলন ব্যবস্থা (vertical convection) বাধাপ্রাপ্ত হয়। একেই এককথায় উষ্ণতার ইনভারশন বলে। যাই হোক, এর ফল ভুগতে হয় শহরবাসীকেই। পাতলা ঠাণ্ডা বাতাসের স্তর সবসময় শহরকে ঢেকে রাখে, যা যানবাহন নিঃসৃত দূষক গ্যাস ও কণাগুলোকে শহর ছেড়ে যেতে দেয় না। 1963 সালে ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট চালু হবার পর জাতীয় সড়কে নজরদারি, যানবাহন নিঃসৃত গ্যাসের গুণগত মান যাচাই ইত্যাদি ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এতে 1963 থেকে 2012 সালের মধ্যে বাতাসে অবাঞ্ছিত জৈব যৌগের গাঢ়ত্ব 50 শতাংশ কমে গেছে এবং অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাসগুলোর পরিমান 70 শতাংশ থেকে 80 শতাংশ কমেছে।[1]

দশ শহরে ধোঁয়াশার দশ কথা

লস্ এঞ্জেলেস স্মগের পরিচিতি বেশি হলেও, আমেরিকার পেনসিলভেনিয়ার দোনোরা শিল্প শহরে প্রায় একই সময়ে ঘটা ধোঁয়াশা সে দেশের ইতিহাসে ভয়াবহ বায়ুদূষণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। Monongahela নদীর ধারে পিটস্‌বার্গ থেকে প্রায় 40 কিমি দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এই শহরে 1948 সালের 27 অক্টোবর থেকেই ঘন কুয়াশার প্রকোপ দেখা যায়। পরদিন থেকেই উপত্যকার মানুষজন কাশির দাপটে বেদম হয়ে পড়েন, সঙ্গে ছিল শ্বাসকষ্টজনিত উপসর্গ। 31 অক্টোবর প্রবল বর্ষণে ধোঁয়াশা দূরীভূত হয় ঠিকই, কিন্তু মাঝের এই চারদিনে তার বিষবাষ্প কুড়িটি তাজা প্রাণ হরণ করেছে। শহরের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ঘটনার একমাসের মধ্যে আরও 50 জনের মৃত্যু ঘটেছে। নিউইয়র্ক শহরেও 1966 সালের ধোঁয়াশায় অন্ততঃ পক্ষে 169 মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়।[1]

পৃথিবীতে বর্তমানে বহু শহর নানা সময়ে ধোঁয়াশার কবলে পড়েছে। বায়ুদূষণের নিরিখে বিশ্বের প্রথম দশটা শহরের কথা এ প্রসঙ্গেআলোচনা করা যেতেই পারে। বায়ুদূষণের নিরিখে চীনের রাজধানী শহর বেজিং-এর কথা সর্বজনবিদিত। নানজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের (Nanjing University) School of Environment-এর গবেষকরা জানাচ্ছেন, চীনে প্রতিবছর যত মানুষের মৃত্যু হয় তার এক তৃতীয়াংশের কারণ হল স্মগ্। ধোঁয়াশা কবলিত বাতাসে শ্বাস নেওয়া ধূমপানের মতই স্বাস্থ্যহানিকর। Matthew Kahn নামে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অর্থনীতির অধ্যাপকের কথায় 'বায়ুদূষণ বেজিং শহরে ধনী ও দরিদ্র নাগরিকদের মধ্যে অসাম্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।' CNNকে দেওয়া একটি ই-মেল বার্তায় তিনি আরও জানিয়েছেন 'ধনীরা শহরের অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন এলাকায়

বাস করে, অসহ্য দূষণের সময় নিজেদের গাড়িতে তারা কর্মস্থলে যায় এবং সেখানে দামী ও কার্যকরী এয়ার ফিল্টার দ্বারা সুরক্ষিত পরিবেশে কাজ করে, অসুস্থ হলে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া বা গ্রামাঞ্চলে নিজেদের আলাদা বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার ব্যবস্থা তাদের সাধ্যের বাইরে নয়। দরিদ্রদের সেই সুযোগ নেই। তাই বেজিং হয়ে দাঁড়িয়েছে একই শহরের মধ্যে দুই শহরের গল্প, যেখানে ধনীদের জন্য পয়সা দিয়ে কেনা বিশুদ্ধ বাতাসে শ্বাসগ্রহণের ব্যবস্থা, আর গরীব নাগরিকদের জন্য বরাদ্দ দূষিত বাতাস। এখানে বড়লোকের ছেলেমেয়েদের জন্য তৈরি হয়েছে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা, সেখানে স্কুল ও সংলগ্ন খেলার মাঠে দূষিত বাতাস থেকে পড়ুয়াদের সুরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। সুযোগ সুবিধার তারতম্যের ভিত্তিতে স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের বেতনও বিভিন্ন। সমাজতান্ত্রিক দেশের ধনী ও দরিদ্র মানুষের এমনকি শিশুদের মধ্যেও বিভাজনের কি হাল! লাগামছাড়া উন্নয়নের ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হতে গিয়ে চীন তার সমাজব্যবস্থাতেই বোধহয় বড় ফাটল ধরিয়ে ফেলেছে। এই দেশের সচেতন জনসাধারণ ও সংবাদমাধ্যম বিশ্বাস করে জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষা আর সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সরকারের যথেষ্ট সচেতন হওয়া দরকার। এ সব তথ্য CNN-এর ওয়েবসাইটে খুঁজলে সহজেই জানা যায়।[৩] স্মগের প্রাবল্যের দিক থেকে বেজিং-এর পরেই নাম করা যায় ইরানের আভাজ (Ahvaz) শহরের। তেল ও গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ, ধাতু নিষ্কাশন কেন্দ্রের মত বড় বড় শিল্প নির্গত গ্যাস আর পিএম এই শহরের বাতাসকে ক্রমাগত দূষিত করে তুলেছে। বায়ুদূষণের মাত্রার নিরিখে এরপরে মঙ্গোলিয়ার উলান বাতর (Ulaan Bataar) শহরের নাম উল্লেখ করা হয়। এটিও একটি বড় মাপের শিল্পশহর, প্রাকৃতিক কারণে বাতাসের উষ্ণতাও যথেষ্ট কম। এই শহরের স্মগের জন্য 70% দায়ী গৃহস্থালীর ফায়ার প্লেস সমূহ, বাকিটার জোগানদার শিল্প আর যানবাহন। পাকিস্তানের লাহোর আর ভারতের রাজধানী দিল্লির অবস্থান দুটো আলাদা দেশে হলেও এদের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব খুব দেশি নয়। তাই বোধহয় বায়ুদূষণের গুণগত মানের নিরিখে এদের অবস্থানও পাশাপাশি। এই দুটি শহর বিগত বেশ কয়েকবছর ধরে স্মগের শিকার। দুর্ভাগ্যক্রমে, গতবছর (2016) নভেম্বর মাসে এই দুটো শহরই প্রবল ধোঁয়াশার কবলে পড়ে। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধ-এর স্মগ-প্রবণতার জন্য সেখানকার বালু-ঝড়, শিল্প ও যানবাহন নিঃসৃত গ্যাসকে একযোগে দায়ী করা যায়। অতিরিক্ত যানবাহন ও শিল্পকারখানার জন্য মিশরের কায়রো শহরেরও যথেষ্ট নাম আছে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে অশুদ্ধ কয়লার ব্যবহার আর জনঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার ফলে যানবাহনের চাপ—মূলতঃ এই দুটি কারণে বাংলাদেশের ঢাকা শহরও বায়ুদূষণ তথা স্মগ-প্রবণ শহরের তালিকায় নিজের জায়গা করে নিয়েছে।[৪] পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর উপত্যকা শহর মেক্সিকো সম্বন্ধে বলা হয়: এক প্রজন্মের সময়কালের ব্যবধানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পরিচ্ছন্ন শহরের বাতাস সবচেয়ে বেশি মাত্রায় দূষিত হয়ে পড়েছে। 1992 সালে রাষ্ট্রসংঘ মেক্সিকোকে 'গ্রহের সবথেকে দূষিত শহর' বলে ঘোষণা করে। ঐ সময় প্রতিবছর বায়ুদূষণে 1000-এর ওপর মানুষের মৃত্যু আর কমবেশি 35000 মানুষের অসুস্থতার তথ্য আছে। এরপর থেকে শহরের প্রশাসন ঐ সংকটজনক অবস্থার মোকাবিলায় দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প বন্ধ করা বা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া থেকে শুরু করে যানবাহন চলাচলে রাশ টানে। এত কিছু ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও গত এক দশক ধরে মেক্সিকোর বায়ুদূষণ এক প্রবল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত 2012 সালে শহরের বাতাসে ওজোন ও অন্যান্য দূষণের মাত্রা লস্ এঞ্জেলেস্ (1948) শহরের মত হয়ে যায়। আর 2013-র 17 মার্চ মেক্সিকো শহর আবার প্রবল স্মগের কবলে পড়ে। 2016-র এপ্রিল-মে মাস পর্যন্ত পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায় বাতাসের ওজোন ও পিএম এর মাত্রা তখনও পর্যন্ত জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল।[৫] বলাই বাহুল্য, এই শহরের স্মগের প্রকৃতি হল ফোটোকেমিক্যাল। প্রথম দশের মধ্যে না পড়লেও লস্ এঞ্জেলেস্ এবং মেক্সিকোর মত ফোটোকেমিক্যাল স্মগ দেখা যায় চিলির সানদিয়াগো শহরে, গ্রীষ্মকালে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে। এই শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে মাঝে মাঝে ঘটা দাবানল, শহরে প্রবল যানবাহনের চাপ, বন্দরের জাহাজ, চাষের কাজে ব্যবহৃত ট্রাক্টর: সব মিলিয়ে এখানে বাতাসে দূষকের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। 1990-এর দশকের মাঝের দিকে এই শহরের বায়ুদূষণ ভয়ংকর আকার ধারণ করেছিল। সরকার গৃহীত ব্যবস্থায় তা অনেকটা কমলেও 2011- তে ক্যালিফোর্নিয়ার আমেরিকান লাঙ অ্যাসোসিয়েশন ধোঁয়াশা সৃষ্টি ও বাতাসের দূষণমাত্রার নিরিখে সানদিয়াগো শহরকে 'F' গ্রেড দিয়েছে। 'F' গ্রেডের অর্থ হল যে সব মানুষজন অ্যাজমা বা ফুসফুসের সমস্যায় কষ্ট পায় তাদের

5-B

পক্ষে ঐ বাতাস অস্বাস্থ্যকর।[৬]

গতবছর অর্থাৎ 2016 সালের নভেম্বর মাসে বিশ্বের বড় বড় চারটি শহর প্রবল ধোঁয়াশার কবলে পড়ে। দিল্লি, বেজিং, তেহেরান আর লাহোর। এই স্মগের প্রাদুর্ভাব আকস্মিকভাবে ঘটেনি, প্রত্যেকটা শহরই বিগত বেশ কিছু বছর ধরে শীতকালে কমবেশি ধোঁয়াশায় ভুগতে থাকে, এর মধ্যে বেজিং শহরে বায়ুদূষণের প্রভাব সবথেকে বেশি। দেশের মধ্যে বায়ুদূষণের নিরিখে দিল্লি সেরা, আবহাওয়া দপ্তরের বিশেষজ্ঞদের মতে দূষণের প্রভাবে দিল্লির শীতকালীন উষ্ণতা 1998 সাল থেকে ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। 2013-14 সালে এই শহরে শীতের বাতাসে পিএম 2.5 প্রায় 44% বেড়ে গিয়েছিল। দূষণজনিত স্মগের কারণে দিল্লিতে রেল ও বিমান পরিবহন ব্যবস্থা প্রতি বছরই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়—সংবাদমাধ্যমে পরিবেশিত এই ঘটনার কথা আমাদের প্রত্যেকেরই জানা। অস্বাস্থ্যকর বাতাসে থেকে রাজধানীর শিশু ও মহিলাদের মধ্যে অ্যাজমা ও লাঙ ক্যানসারের সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে, এর ফলে প্রতি বছর বেশ কিছু মানুষের মৃত্যু হয়। শহরের বেশি ভাগ নাগরিকদের মধ্যে বায়ুদূষণের বিপজ্জনক সীমা আর তার থেকে তৈরি হওয়া অসুস্থতার বিষয়ে সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। 1996 সালে Centre for Science & Environment (CSE) সুপ্রীম কোর্টে এক জনস্বার্থ মামলা করে, তার রায়ে 1998-এ সর্বোচ্চ আদালত দিল্লির সব ট্যাক্সি ও বাসে লেড যুক্ত পেট্রল ব্যবহার বন্ধ করে সিএনজি (CNG) ব্যবহারের নির্দেশ দেয়। দিল্লি ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এরপর থেকে সমস্ত বাস পরিবেশবান্ধব CNG-তে চালানোর ব্যবস্থা করে, যা সংখ্যাগতভাবে পৃথিবীর অন্যান্য শহরের তুলনায় সবচেয়ে বেশি। 2003 সালে বায়ুদূষণের মোকাবিলায় বিকল্প জ্বালানী ব্যবহারের দৃপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য রাজধানী শহর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি দপ্তরের 'Clean Cities International Partner of the Year' পুরস্কার পায়। দিল্লি মেট্রোও অবশ্য শহরকে বায়ুদূষণ রুখতে অনেকটা সাহায্য করেছে। ভারতীয় শহরের মধ্যে গাছপালার পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেও এই শহর তৃতীয় স্থানে। কিন্তু এতসব প্রচেষ্টার পরেও প্রথমদিকে বায়ুদূষণ কিছুটা কমলেও পরবর্তীকালে আবার তা বাড়তে থাকে। পরিবেশবিদদের মতে এরজন্য দায়ী পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের ফসল তোলার পর কৃষিজ উপজাত (খড়) নির্বিচারে পুড়িয়ে নষ্ট করার পদ্ধতি, বদরপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে পুরানো প্রযুক্তিতে কয়লার দহন, রাস্তায় অতিরিক্ত ডিজেল গাড়ির আধিক্য, মানুষজনের যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবে গণপরিবহন ব্যবস্থার (বাস ইত্যাদি) ওপর নির্ভরতা কমে যাওয়া, শহরে জমে থাকা আবর্জনা, রাস্তার ধুলো, নির্মাণকাজ থেকে বের হওয়া দূষক—এইসব বিভিন্ন উৎসের প্রভাবে রাজধানীর বাতাস যখন সারা বছর অবাঞ্ছিত গ্যাস ও পিএম-বিষে জর্জরিত সেই সময় শীতের শুরুতে দীপাবলি উৎসবে আতসবাজি পোড়ানো অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেবার মত একদিনে বায়ুদূষণের মাত্রা অনেক বাড়িয়ে দেয়। এইভাবেই, গত নভেম্বরে তৈরি হয় দিল্লির কুখ্যাত স্মগ। ধোঁয়াশায় মুড়ে গিয়েছিল রাজধানী শহর, গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়েছিল প্রায় সপ্তাহ দু'য়েক ধরে। খবরে প্রকাশ ঐ সময় (7 নভেম্বর, 2016) দিল্লির বাতাসে পিএম 2.5 স্বাভাবিকের 16 গুণ আর পিএম 10 স্বাভাবিকের চেয়ে 10 গুণ বেড়ে যায়। দৃশ্যমানতা 200 মিটারে নেমে আসে, যানবাহন ও বিমান চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, মানুষজনের শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা, ফুসফুসের সমস্যা ঐ সময় প্রবল আকার ধারণ করে। সমস্যা মোকাবিলায় প্রশাসন কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি, দ্রুত নানান ব্যবস্থা নেয়। এই ব্যাপারে যে দশদফা উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তা হল (1) দিল্লির স্কুলগুলি কয়েকদিনের জন্য বন্ধ রাখা, (2) সপ্তাহব্যাপী ভাঙাভাঙি ও নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ স্থগিত রাখা, (3) হাসপাতাল ও আপাত কালীন কেন্দ্রগুলি ছাড়া 10 দিন যাবৎ ডিজেল জেন-সেট ব্যবহার বন্ধ করা, (4) এই সময় বস্তিতে বস্তিতে সরকারি উদ্যোগে বিদ্যুৎ সরবরাহ, (5) বদরপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কিছুদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া এবং শহরের মধ্য দিয়ে কয়লার ছাই পরিবহন না করা, (6) কৃষিজ অবশিষ্টসমূহের দহন নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ দপ্তরের বিশেষ অ্যাপস্ চালু করা, (7) শহরের রাস্তা পরিস্কারের কাজে অত্যাধুনিক ভ্যাকুয়ম ক্লিনিং ব্যবস্থা প্রয়োগ, (8) শহরের রাস্তায় নিয়মিতভাবে জল ছিটানোর কাজ চালু করা, (9) জনসাধারণকে বাড়ির বাইরে না বেরোন এবং বাড়ি থেকেই অফিসের প্রয়োজনীয় কাজ চালানোর পরামর্শদান এবং (10) জোড় ও বিজোড় সংখ্যার (রেজিস্ট্রেশন নং) গাড়ির রাস্তায় নামানোর সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে NRC (National Response Corporation : একটি

বিশ্বমানের সংস্থা যারা শিল্পের সঠিক পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কাজ করে চলেছে) আগে থেকেই সুপ্রীম কোর্টে ডিজেল গাড়ি নিয়ন্ত্রণে গাড়িগুলির ওপর 30% সেস বসানোর আর্জি জানিয়েছে। দূষণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সুপ্রীম কোর্ট 25 নভেম্বর 2016 দিল্লিতে, সব রকমের বাজি বিক্রি বন্ধের নির্দেশ দেয়।[7] যাইহোক অসুস্থ হয়ে আতঙ্কে বেশ কয়েকদিন কাটানোর পর বাতাসের উষ্ণতা যখন কমল আর শীতের জোরালো হাওয়া বইতে শুরু করল তখন কাটল ঐ ধোঁয়াশা। এই বছর দেওয়ালীর আগে সর্বোচ্চ আদালত আবার 9 অক্টোবর 2017 সবরকম বাজি বিক্রি ও ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। কৃষিজ অবশিষ্ট সমূহ থেকে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে National Green Tribunal-এর নির্দেশনামায় 'সি' ধারাতে বলা আছে শস্যচাষ, পরিবহন এবং শস্যের অবশিষ্টগুলির সঠিক ব্যবস্থাপনা রাজ্য সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব, যদি এই দায়িত্ব পালনে অপারগ হয় তাহলে সরকার কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেবে। এই নির্দেশনামার 'এফ' ধারা অনুযায়ী ঐ কৃষিজ অবশিষ্টসমূহের সঠিক পদ্ধতিতে পোড়ানো বা অন্য কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির ব্যবস্থা করে সরকারই কৃষকদের সাহায্য করবে।[8] এখন এই বছর রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নেয় সেটাই দেখার। তবে কৃষকদের কিছু সংগঠন জানিয়েছে যে পুড়িয়ে দেওয়া ছাড়া শস্যের অবশিষ্টসমূহ ধ্বংসের তাদের কাছে আর কোনো উপায় নেই। অন্যান্য ব্যবস্থার সবগুলোই খরচসাপেক্ষ, তাদের সাধ্যের বাইরে। চাষীদের বিরুদ্ধে এই ব্যাপারে কোনোরকম ব্যবস্থা নিলে রাজনৈতিক দলগুলোও আন্দোলনে নামবে বলে জানিয়েছে। তবে দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ দপ্তর কিন্তু ক্রমাগত চিন্তাভাবনা করে চলেছে। রাজধানীতে দূষণ নিয়ন্ত্রণে ডিজেল জেনারেটরের ব্যবহার ও বদরপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পরিবেশ দূষণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ডূরে লাল। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সূত্রে পাওয়া দিল্লির বাতাসের গুণমান সূচক (Air Quality Index বা AQI) সংবাদপত্রে ছাপা হয়, যা সারণী 1-এ দেখানো হল।[9]

সাধারণভাবে AQI 100-এর মধ্যে থাকলে বাতাসের অবস্থা সন্তোষজনক মনে করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গতবছরের তুলনায় AQI কমলেও এই বছর অর্থাৎ 2017 সালেও বেশ খারাপের তালিকাতেই রয়েছে বাতাসের হাল।

তিলোত্তমায় ধোঁয়াশা : কিছু কথা, ভাবনা কিছু

ছোটবেলায় মফস্বলে থাকতাম, শীতকালে ভোরবেলায় মাঝে মাঝে ঘন কুয়াশায় চতুর্দিক ঢেকে যেতে দেখেছি। ঐ সময় খোলা জায়গায় কিছুটা হাঁটলে মুখে মাথায় গুঁড়ো গুঁড়ো জলকণা লেগে যেত, বেশ মজা লাগত। এখন কর্মসূত্রে মহানগর কলকাতায় থাকা। এখানে এখন কুয়াশা একাকী জমে না, কেননা শহুরে ধোঁয়া তার পিছু ছাড়তে চায় না। ছেলেবেলার সেই বিশুদ্ধ কুয়াশা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে! আমাদের প্রিয় কলকাতা শহর দিল্লির মত অত বেশি না হলেও সারা শীতকালে ধোঁয়াশার হালকা চাদরে ঢেকে থাকে। বিশেষ করে বিগত কয়েকবছর ধরে অক্টোবরের শেষ থেকে মার্চ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকটা দিনরাত কমবেশি ধোঁয়াশায়

সারণী 1 : দিল্লীর বাতাসের AQI, দেওয়ালীর সময়

বাতাসের গুণমান নির্ধারণের দিন	AQI-এর মান	
	2016 সাল	2017 সাল
কালী পুজোর আগের দিন	404	302
কালীপুজোর দিন	431	319
দেওয়ালীর দিন	445	346

5-F

ভরে থাকছে কলকাতা-হাওড়া অঞ্চল। হালকা ধোঁয়াশার অস্তিত্ব এমনিতে মালুম হয় না, কোনো উঁচু জায়গা থেকে চারপাশটা তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায়। যারা বিদ্যাসাগের সেতুর ওপর দিয়ে যাতায়াত করেন তারা শীতের সময় প্রতিদিন এই ধোঁয়াশা লক্ষ্য করে থাকবেন, মনে হয় আকাশ যেন মাটির টানে নেমে আসতে চাইছে। এই সময়টা আতঙ্কের হয়ে ওঠে শহরবাসীর কাছে, শীতের আমেজের আরামটুকু তারা খুশীমনে উপভোগ করতে পারেন না, অপেক্ষা করতে থাকেন মার্চের শেষের ঘর্মাক্ত দিনগুলোর জন্য, যে সময় থেকে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমান বাড়ে আর ধোঁয়াশা ধীরে ধীরে কাটতে থাকে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে শীতকাল ছাড়া বছরের অন্য সময় বাতাস আর্দ্র থাকে আর মাঝমাঝে বৃষ্টি হয়, ফলে বাতাসে ভাসমান কণাগুলো বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। শীতকালের শুষ্ক আবহাওয়ায় তা হয় না বলে বাতাসে দূষিত কণার এত আধিক্য। আবহাওয়ার এই সুবিধাটুকু না থাকলে সারাবছরই ধোঁয়াশাজনিত দূষণের জ্বালা সইতে হোত শহরকে। অন্যান্য শহরের মত কলকাতায় বায়ুদূষণের কারণগুলোও সেই একই: অত্যাধিক জনঘনত্ব, যার ফলে যানবাহনের আধিক্য, খোলা রাস্তায় পীচ গলানো, নির্মাণকাজ, শহরের উপকণ্ঠের ছোট ছোট শিল্পকারখানা, রাস্তার ধুলো, জমে থাকা আবর্জনা পোড়ানো, কালীপুজো সহ অনেক উৎসবে বাজি ফাটানো, এর সঙ্গে রয়েছে সঠিকভাবে ধোঁয়া পরীক্ষা না হওয়া পুরানো যানবাহনের অবাধে চলাচল আর কয়লার উনুনের ব্যবহার। কয়লার উনুন বেশির ভাগ মানুষজন গৃহস্থালীতে ব্যবহার না করলেও বস্তি অঞ্চলে অনেকে ব্যবহার করেন; এছাড়া রাস্তার ধারে ইস্ত্রিওয়ালা, খাবারের দোকান সব মিলিয়ে শহরে ঠিক কত কয়লার উনুন জ্বলে প্রশাসনের কাছে তার সঠিক হিসাব নেই। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে কলকাতায় বায়ুদূষণের মূল উৎস হল ডিজেল চালিত গাড়ি। মেট্রো শহরগুলোতে ডিজেল চালিত গাড়ির ব্যবহারে কলকাতার স্থান ওপরের দিকেই। অটোরিক্সা আর কিছু ব্যক্তিগত গাড়ি ছাড়া আর সব গাড়ি এখানে পেট্রল বা ডিজেলে চলে। সিএনজি বা এলপিজির ব্যবহার কলকাতা শহরে অনেকটাই কম। বড় বড় পণ্যবাহী যেসব ট্রাক রাতে শহরে ঢোকে সেগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়—এক্ষেত্রে প্রশাসনের নজরদারির অভাব থাকে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে দীর্ঘদিন কাজ করা এক পরিবেশবিদ জানাচ্ছেন, রাতের শহরে যেসব পণ্যবাহী লরি ঢোকে তাদের যথাযথ ধোঁয়া পরীক্ষা করলে দেখা যাবে সেগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই রাস্তায় চলার ছাড়পত্র পেত না। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রদত্ত তথ্যে দেশে দূষিত নগরের তালিকায় দিল্লির পরেই কলকাতার স্থান, পাশের শহর হাওড়াও কম যায় না, তার স্থানও দূষণের নিরিখে দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে। যানবাহনের দূষণ নিয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা করেছিলেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত। গতবছর অর্থাৎ 2016-র সেপ্টেম্বর মাসে আদালত রাজ্য সরকারের কাছে ছ'মাসের মধ্যে এই ব্যাপারে হলফনামা চেয়েছিল।[10] এই মামলায় 10 এপ্রিল 2017 তারিখে জাতীয় পরিবেশ আদালত শহরে জ্বালানী হিসাবে গাড়িতে ডিজেল ব্যবহারের ফলে তৈরি হওয়া বায়ুদূষণ নিয়ে সরকারের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে এবং সিএনজি কেন ব্যবহার করা হচ্ছে না জানতে চায়। সরকার পক্ষ আদালতকে জানিয়েছে রাজ্যে সিএনজি মেলে না, ফলে সিএনজি চালিত বাস চালু করা হলেও জ্বালানি নিয়ে সমস্যা হবে। এখানে উল্লেখ্য, প্রশাসন সূত্রে আরও খবর পাওয়া গেছে পরিবেশবান্ধব জ্বালানী নিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গ্যাস অথরিটি অফ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে যৌথ সংস্থা গড়ার কথা থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।[11] এর মধ্যে একটা আশার খবর শহরের বাতাসে কোন উৎস থেকে কতটা দূষণ ছড়াচ্ছে তা মাপার দায়িত্ব সিএসআইআর-এর জাতীয় গবেষণাগার নিরিকে (National Environmental Engineering Research Institute) দিয়েছে রাজ্য সরকার। পরিবেশ দপ্তর সূত্রের খবর আগামী ছ'বছর ধরে ঐ কাজ করবেন নিরির বিশেষজ্ঞরা—দূষণ প্রতিরোধের পদ্ধতিও তারাই বাতলে দেবেন। আপাতত কলকাতায় 19টি আর হাওড়ায় 6টি মনিটারিং স্টেশন গড়া হবে। পরে খনি ও শিল্পশহরগুলিতেও ঐ প্রকল্প চালু হবে। মানুষের উৎসবমুখীনতার কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না, তার সঙ্গে আনন্দের উপকরণ হিসাবে বাজি না পোড়ালে কি চলে? এমনিতেই দেশের বেশীর ভাগ শহরের বাতাসের মান হু-র নির্ধারিত গুণমানের ধারেকাছে নয়। তার ওপর পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য বলছে বাজির ধোঁয়ায় কালীপুজো ও তার পরদিন দেওয়ালীতে কলকাতা ও আশপাশ এলাকার বায়ুদূষণ বাড়ে দুই থেকে তিন গুণ, পর্ষদের তথ্য থেকে (সারনী-2) বিগত

দু'বছরের অবস্থার তুলনা করলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।[12]

সারণী-2: কলকাতার বাতাসে কালীপুজোর সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ধূলিকণার মাত্রা

ধূলিকণার টাইপ	স্বাভাবিক মাত্রা*	2015 সালে			2016 সালে		
		কালী পুজোর 5 দিন আগে	কালীপুজোর দিন	দেওয়ালীর দিন	কালী পুজোর 5 দিন আগে	কালীপুজোর দিন	দেওয়ালীর দিন
পিএম 10	100	108	201	302	166	202	239
পিএম 2.5	60	57.5	146	193.5	88	130	151

*মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার

দেখা যাচ্ছে 2015-র অবস্থা ছিল বেশি খারাপ। তবে এইবার অর্থাৎ 2017 সালে কালীপুজোয় দেদার বাজি পোড়ানো হলেও বৃষ্টিস্নাত আবহাওয়া দূষণের পরিমান কমিয়ে দিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। কালীপুজোর পরদিন পিএম 10-এর পরিমান বাতাসে প্রতি ঘনমিটার 20 মাইক্রোগ্রামের নীচে নেমে গিয়েছিল। বাতাসের গুণমান সূচক (AQI) ছিল 86 (100-এর মধ্যে থাকলে সন্তোষজনক ধরা হয়)।[9]

গত দু'দশক ধরে শব্দবাজির বিরুদ্ধে প্রচার চললেও এবারই প্রথমবার আলোর বাজির বিপদের কথা জানিয়ে জনগণকে এর থেকে দূরে থাকতে বলল রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। এর পটভূমিকায় আছে সুপ্রীমকোর্টের নির্দেশে দিল্লিতে সবরকম বাজি বিক্রি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়া আর বম্বে হাইকোর্টের নির্দেশে মুম্বাই শহরে বাজির ব্যবহার বন্ধ হওয়া। বিশেষজ্ঞদের মতে আলোর বাজি যত রঙচঙে হবে তত বেশি মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ তার মধ্যে ধাতব রাসায়নিকের পরিমান অনেক বেশি থাকে। দহনের পর ঐ রাসায়নিকগুলো বাতাসে মিশে শরীরে প্রবেশ করে মারাত্মক বিপদ ডেকে আনে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত বাজির ওপর নিষেধাজ্ঞাকে একটি পরীক্ষমূলক ব্যবস্থা বলেই প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের মতে এই ব্যবস্থায় বায়ুদূষণের মাত্রা কতটা নেমে আসে এই বছর সেটা দেখে ভবিষ্যতে বাজির ব্যবহার বিষয়ে স্থায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। এই পরীক্ষামূলক সতর্কতা বিজ্ঞানভিত্তিক ও নৈতিক। মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর দূষিত বায়ুর কুপ্রভাব সম্পর্কে পরিবেশবিদ ও চিকিৎসক সমাজ বারবার সতর্ক করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মেট্রো শহরের প্রায় 35% শিশু শ্বাসের সমস্যায় কষ্ট পায়। হীল (HEAL) ফাউন্ডেশন 'ব্রেথ ব্লু 2015' প্রোগ্রামে ঐ বছর দিল্লি, মুম্বই, ব্যাঙ্গালোর ও কলকাতা এই চারটি মেট্রো শহরের শিশুদের ওপর তিনমাস ধরে পরীক্ষা করে এই তথ্য জানায়।[13] শহরের বস্তি এলাকার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় থাকা শিশুদের মধ্যে এই শ্বাসযন্ত্রের সমস্যার হার আরও বেশি, প্রায় 70%। বাস ড্রাইভার, গ্যারেজ ও পেট্রোল পাম্পের কর্মী, ট্রাফিক পুলিশ যাদের দিনের মধ্যে বেশিরভাগ সময়টা খোলা বাতাসের মধ্যে বাইরে কাজ করতে হয়, তাদের মধ্যেও এই ধরনের অসুস্থতার প্রবণতা যথেষ্ট বেশি। বিশ্ববিখ্যাত জার্নাল 'ল্যানসেট' পৃথিবী জুড়ে দূষণের প্রভাবের ওপর তাদের দু'বছর ধরে চালানোর সমীক্ষার যে রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায় 2015 সালে বিশ্বে দূষণজনিত কারণে মারা গিয়েছেন 90 লক্ষের ওপর মানুষ, এর মধ্যে প্রায় 65 লক্ষ বায়ুদূষণে, 18 লক্ষ জলদূষণে আর 8 লক্ষ মারা গিয়েছেন কর্মক্ষেত্রের দূষণজনিত কারণে, 25 লক্ষ মৃত্যু নিয়ে তালিকার শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছে ভারত, দ্বিতীয় স্থানে চীন, চীনে ঐ বছর দূষণে 18 লক্ষ্য মানুষ মারা যায়।[14] যাইহোক, যে প্রসঙ্গে এত কথা

বলা, সেই বাজির ব্যবহার বন্ধের সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে দিল্লির নাগরিক সমাজের একাংশ এবং কেন্দ্রের জনপ্রতিনিধিরাও ক্ষুব্ধ। নাগরিকের শ্বাসগ্রহণের স্বাধীনতা নয়, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ নষ্ট করে আনন্দ করার স্বাধীনতায় সর্বোচ্চ আদালত কেন হস্তক্ষেপ করছে, তাদের কাছে এটাই বড় প্রশ্ন! শুধু তাই নয়, জনপ্রিয় লেখক এর মধ্যে হিন্দুবিরোধী 'মেকী ধর্মনিরপেক্ষতার' আভাসও প্রত্যক্ষ করছেন।[15] এদিকে রাজ্যের পরিবেশমন্ত্রীর মতে 'পরম্পরা' অনুযায়ী দীপাবলি এসেছে; সঙ্গে হাত ধরে হাত ধরে এসেছে বায়ুদূষণ। বাজি পুড়িয়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় সেটি পরম্পরা, যা নিতান্তই ব্যক্তিগত, কিন্তু দূষণ সর্বজনীন। তাৎক্ষণিক আনন্দকে অতিক্রম করে সমাজের আর নিজেদের দীর্ঘমেয়াদী মঙ্গলের কথা অনেক মানুষ ভাবতে শেখেনি। এখানেই প্রশাসনের গুরুত্ব। সুতরাং শুধু কোর্টের নির্দেশে হবে না, বায়ুদূষণ রোধে পুলিশ প্রশাসন জনসমাজ সবাইকেই একযোগে সক্রিয় হতে হবে। অনুর্ধ 17 বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষ্যে যে যে শহরে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে, দেশের সেরকম ছ'টি শহরে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ভারতের পরিবেশ দপ্তর কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদও গত 26 সেপ্টেম্বর 2017 কলকাতা ও বিধাননগর পুরসভা ও পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন এলাকা ও বিমানবন্দরের আশপাশের এলাকাকে 'গ্রীণ জোন' ঘোষণা করে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রশাসন চেষ্টা করলে দূষণ প্রতিরোধে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম।

বায়ুদূষণ তথা ধোঁয়াশার মূল কারণ ডিজেলের দহন কমানোর জন্য সারা বিশ্ব জুড়ে চিন্তাভাবনা চলছে। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে ভারত, ফ্রান্স, ব্রিটেন, নরওয়ের মত বহু দেশই সাম্প্রতিককালে পেট্রোল-ডিজেলের পাট চোকাতে কোমর বেঁধেছে। ভারতের রাস্তায় 2030 সালের মধ্যেই সমস্ত গাড়ি বিকল্প জ্বালানিতে বিশেষ করে ব্যাটারিতে চালানোর পক্ষে নির্দেশ জারি করেছে ভারত সরকারের সড়ক পরিবহন দপ্তর। ব্রিটেন আর ফ্রান্স লক্ষ্যমাত্রা ধরেছে 2040 সাল। এর মধ্যে ফ্রান্সের রাজধানী শহর প্যারিস প্রশাসনের লক্ষ্যমাত্রা হল 2025-এর মধ্যে ঐ শহরকে পেট্রোল-ডিজেল মুক্ত করা, কারণ ঐ বছর গ্রীষ্মেই অলিম্পিক গেমসের আসর বসবে সেখানে। নরওয়ে বলেছে 2025-এ সেখানে বিক্রি হওয়া সব নতুন গাড়িতে কার্বন নির্গমন শূন্যে দাঁড়াবে। বিশ্বের সবচেয়ে দূষণকারী দেশ চীনও সম্প্রতি জানিয়েছে তারাও ব্যাটারি চালিত গাড়ি চালানোর দ্রুত চেষ্টা করছে। এই প্রচেষ্টাগুলো ধোঁয়াশার অস্বচ্ছতায় আলোর দিশার মত, আশা করতে ইচ্ছা হয়, গাড়ির ব্যাটারি চার্জের জন্য প্রয়োজনীয় তড়িৎশক্তির জোগান দেবে সৌরশক্তি বা বায়ুশক্তির মত সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব উৎসগুলো। আমাদের দেশ সহ পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা নানান গাড়ি কোম্পানী ব্যাটারি চালিত গাড়ি তৈরিতে নেমে পড়েছে। সবচেয়ে দূষণমুক্ত যান সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায় চীনের দক্ষিণ-পূর্বের গুয়াংডা প্রভিন্সের অত্যাধুনিক শহর শেনজেনে। ঐ শহরে এই পরিষেবা শুরু করেছে বেজিং-এর সাইকেল শেয়ারিং-এর স্টার্ট আপ সংস্থা 'ওফো', 2014 সালে। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট প্রোগ্রাম হিসাবে এই প্রকল্পের উদ্যোগ নেন ওখানে পিএইচডি পাঠরত ছাত্র ডাল উই এবং তার চার সতীর্থ। 2015 সালে আর এক স্টার্ট-আপ সংস্থা 'মোবাইক' বাজারে আসে। বিশ্বের প্রায় 100টি শহরে তাদের মোট 10 কোটি নথিভুক্ত গ্রাহক রয়েছে বলে দাবি করেছেন 'মোবাইকে'র প্রেসিডেন্ট হু ওয়েই।[16] আমাদের দেশেও বেশ কিছু শহরে এই সাইকেল পরিষেবা প্রচলনের চেষ্টা হচ্ছে, খবরে প্রকাশ কর্ণাটক সরকার ব্যাঙ্গালোর শহরে তাদের ট্রিনট্রিন প্রোজেক্টটির সম্প্রসারণের জন্য নতুন করে 80.80 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এই প্রোজেক্টে শহরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায় ঘন্টা হিসাবে। মাস কয়েক ধরে মহীশূরে পরীক্ষামূলভাবে এই প্রোজেক্ট চলার সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যাঙ্গালোরে এই প্রকল্প চালু করার ব্যবস্থা করেছে কর্ণাটক সরকার। সাইকেল ব্যবহারে আমাদের রাজ্যে কলকাতার অভিজ্ঞতা খুব একটা ইতিবাচক নয়। কলকাতার পাটুলি থেকে উল্টোডাঙা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চোদ্দ কিমি রাস্তার দুধারে সাইকেল লেনের ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের পরিকল্পনায় ছিল। কিছু অংশ তৈরিও হয়ে গেছে, কিন্তু প্রশাসনের সচেতনতার অভাবে আজও তা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়নি। মানুষ প্রতিদিন বিপদ মাথায় নিয়ে বাস গাড়ির সঙ্গে রাস্তার ধার দিয়ে সাইকেল চালান। ইতিমধ্যে ঐ সাইকেল লেনের কিছু কিছু অংশ জবরদখল করে রাস্তার পাশের হকাররা বসতে

শুরু করে দিয়েছেন। এর প্রতিবাদে 'কলকাতা সাইকেল সমাজ' গত 27 আগস্ট এক মিছিলের আয়োজন করে, তাদের দাবি ছিল ইএম বাইপাসে এবং শহরের বড় বড় রাস্তায় অবিলম্বে সাইকেল লেন চালু করা।[17] আমাদের দেশের অন্য রাজ্য যখন সাইকেল ব্যবহারের চিন্তাভাবনা করছে তখন আমরাই বা পিছিয়ে থাকব কেন? বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আদালত বায়ুদূষণ রুখতে নানান নির্দেশ দেয় কিন্তু তা সঠিকভাবে কার্যকর হয় না। আদালত আইন আর সমাজের মধ্যে সংযোগকারী সেতু গঠনের ব্যাপারে নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে, কিন্তু সেই সেতু তৈরির প্রধান উপকরণগুলো হল নাগরিকদের যুক্তিবাদী চেতনা আর প্রশাসনের সঠিক পদক্ষেপ। আশার কথা সংবাদপত্র এবং পরিবেশবিদরা এই ব্যাপারে যথেষ্ট সদর্থক ভূমিকা পালন করে। তবে শুধু ছোট ছোট ছাপার অক্ষরে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতামত নয়, মানুষ ও প্রশাসনকে সচেতন করতে স্বচ্ছ ভারতের মত আরও বেশি প্রচার দরকার। পৃথিবীতে শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে শুরু হওয়া বায়ুদূষণ একদিনে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় কিন্তু এইভাবে লাগাতর চেষ্টা চললে তার সুফল একদিন না একদিন মিলবেই।

কলকাতার চারদিকটা দেখলেই বুঝতে পারা যায় মহানগর এখন আন্তর্জাতিক শহর হওয়ার স্বপ্নে মজে রয়েছে। শহরের পূর্ব পাড়ের জলাভূমি ভর্তি করে গড়ে উঠছে গগনচুম্বী অট্টালিকা, রাজপথের ওপরে রেলপথ, ইতিউতি ছড়িয়ে পড়ছে প্রাসাদোপম মল ও তার সংস্কৃতি। দক্ষিণ কলকাতার এমনই একটা মলের পাশে খোলা মাঠে বিগত মার্চের এক সকালে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আমরা প্রত্যক্ষ করি পরিবেশে যেন আঁধার নেমে আসছে। মলের দেওয়াল অস্পষ্ট আবছা, গোটা এলাকা জুড়ে ধোঁয়ার চাদর বিছিয়ে গেল। পরের দিন কলকাতার সংবাদপত্রগুলোতে এই ঘটনার রিপোর্ট বেরোলেও তাকে নেহাতই কুয়াশা বলে উল্লেখ করা হয়। যদিও আদপে তা ছিল ধোঁয়াশা।[18] এই লক্ষণ কিন্তু মোটেই শুভ লক্ষণ নয়। কেমন যেন হাড়হিম করা ভয় বুকের মধ্যে চেপে ধরে। আমাদের তিলোত্তমা কলকাতাও কি আগামী দিনে প্রবল ধোঁয়াশার কবলে পড়া পৃথিবীর বিখ্যাত শহরগুলোর তালিকাভুক্ত হবে? আজ থেকেই যদি সচেতন না হওয়া যায় সেই বিপর্যয়কে ঠেকানো কিন্তু সত্যিই কঠিন হয়ে উঠবে।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার:

তথ্যসংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করার কাজে শ্রী ওমপ্রকাশ চক্রবর্তী বিশেষ সহযোগিতা করেছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

টীকা:

1. ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট 1963: 'The Air Pollution Control Act 1955' হল বায়ুদূষণ সংক্রান্ত আমেরিকার প্রথম যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন (federal legislation)। বায়ুদূষণের উপর যাবতীয় গবেষণার অর্থ জোগানোর বন্দোবস্ত এই আইনে ছিল। 'The Clean Air Act 1963' হচ্ছে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে আনার প্রথম যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনী ব্যবস্থা। আমেরিকার পাবলিক হেলথ্ সার্ভিসের অধীনে এই আইনের দ্বারা দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধী উদ্যোগের সূচনা হয় এবং বায়ুদূষণ পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশলের উদ্ভাবন ও প্রয়োগ সংক্রান্ত গবেষণাকে বৈধতা দান করা হয়। পর্যায়ক্রমে আরও কঠিন আইন আনা হয় 1970 সালে, 1977 সালে (প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে) এবং 1990 সালে—উদ্দেশ্য বায়ুদূষণ কার্যকরীভাবে রোধ করা।[19]

2. ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট 1956: 'The Clean Air Act 1956' হল 1952 সালে লন্ডনে হওয়া বিখ্যাত ধোঁয়াশার প্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্যের সংসদে পাস হওয়া প্রথম আইন। এইট কার্যত লাগু হয় 1964 সালে, ইংল্যান্ডের Ministry of Housing and Local Government এবং স্কটল্যান্ডের স্বাস্থ্যবিভাগের তত্ত্বাবধানে।[20]

তথ্যসূত্র:

1. 'Smog' Wikipedia, *https://en.wikipedia.org/wiki/Smog,* 7 March 2017.
2. 'The mechanism of photochemical smog formation', *http://www.researchgate.net.*
3. 'Bejing's smog : A tall of two Cities', *http://edition.Cnn.com...*,7 March 2017.

4. 'These are top 10 smog-filled cities in the world' *by* Haamiz Ahmed, *http://propakistani.pk/2016/11/07/top-10-smoggiest-cities....*,7 March 2001.
5. 'Air pollution in Maxico City', *http://en.wikipedia.org.....*, 7 March 2017.
6. 'San Diego's air pollution among the worst in nation', *http://www.sandiegouniontribune.com...*, 7 March 2017.
7. 'Great smog of Delhi', *http://en.wikipedia.org/wiki...*,7 March 2017.
8. 'SAD demands financial package for formers" *The Hindu* 15 October 2017.
9. 'বায়ুদূষণ কমলেও শব্দ তাণ্ডব দিল্লিতে', আনন্দবাজার পত্রিকা, 21শে অক্টোবর, 2017.
10. 'সঙ্কটে শহর বিষাক্ত বায়ু', দেবদূত ঘোষ ঠাকুর, কুন্তক চট্টোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা, 7 এপ্রিল, 2017.
11. 'সিএনজি-কাঁটা, প্রশ্নে প্রশাসন', আনন্দবাজার পত্রিকা, 11 এপ্রিল, 2017.
12. 'বায়ুদূষণ নিয়ে চিন্তা, নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেই', আনন্দবাজার পত্রিকা, 15 অক্টোবর, 2017.
13. 'Wrold Asthma Day', *www.firstpost.com.*
14. The Statesman, 21 October 2017.
15. 'দূষণের অধিকার', আনন্দবাজার পত্রিকা, 12 অক্টোবর, 2017.
16. সাইকেল শেয়ারিং-এ দূষণ কমাচ্ছে শেনজেন', এই সময় 23 নভেম্বর, 2017.
17. 'অন্যে ভাবে আমরা না', আনন্দবাজার পত্রিকা, 17 অক্টোবর, 2017.
18. 'কলকাতার ভবিতব্যে ধোঁয়াশার বিষ', এই সময়, 31 মার্চ, 2017.
19. 'Evolution of the Clear Air Act', *http:// www.epa.gov>evolution-clean-air.....*
20. 'Clean Air Act 1956', *http://en.m.wikipedia.org>wiki>Clean....*

গণবিজ্ঞান আন্দোলনের একটি পত্রিকার সম্পাদকীয় আড্ডায় প্লাস্টিক এবং থার্মোকল নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করার প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা

সুমিত চক্রবর্তী (বলাই)
(sumitbalai@gmail.com)

[বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী (বি ও বি) পত্রিকাটি 1977 সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের গণবিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 2/1এ. আশুতোষ শীল লেন; কলকাতা-9 ঠিকানায় পত্রিকাটির সম্পাদকীয় আড্ডা বসে। সেখানে যে কোনো আগ্রহী ব্যক্তি আসতে পারে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জীবনতলা থানার বেড়েরখাল গ্রামে আমরা একটি সংস্থার উদ্যোগে গত বছর দেড়েকে 10-12 বার পরিস্কার করে (স্বচ্ছ ভারত অভিযান বা নির্মল বাংলা মিশনের অংশ হিসাবে না) বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক থার্মোকল ইত্যাদি জড়ো করেছি। আমরা দেখেছি এর মধ্যে যা বিক্রি করা যায় (বিক্রি করে সব মিলে বোধহয় 70-80 টাকা পেয়েছি) তার পরিমাণ পুরো আবর্জনার 10 শতাংশ নয়। যেগুলো বিক্রি হয় না প্রথমদিকে গ্রামের লোকের সাহায্যে আমরা পুড়িয়ে ফেলতাম। এটা সময় সাপেক্ষ

এবং দূষণ সৃষ্টিকারী বলে পরে আমরা গ্রামের ইঁটের রাস্তার (গ্রামেও আর মাটির রাস্তা সুলভ না) পাশে সেখানে গাছ হবে না মনে হয়েছে, সেখানে পুঁতে দিয়েছি। পরে মনে হয়েছে এখানে গাছ নেই বটে কিন্তু মানুষের সদিচ্ছা হলে গাছ এখানে হতেই পারে। এবার আমরা সংস্থার ভিতরে মাটির রাস্তার মধ্যে গর্ত করে পুঁততে আরম্ভ করলাম। রাস্তায় তো আর গাছ হবে না! পরে মনে হল এখন যেখানে রাস্তা, পরে হয়ত সেখানে গাছ লাগান হবে এবং রাস্তা সরেও যেতে পারে। এরপর থেকে আমরা বিক্রি অযোগ্য প্লাস্টিক, থার্মোকল এই সব আবর্জনাগুলি ইঁট দিয়ে ঘিরে এক জায়গায় জড়ো করে রাখছি। প্রচুর জমে গেছে। বি ও বি-র আড্ডায় জিজ্ঞাসা করেছি এগুলো নিয়ে কি করা যায় - কোন স্পষ্ট উত্তর কেউই দিতে পারেননি। গত মাসখানেক আগে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি যে ঝড় বৃষ্টি হল, তাতে বারুইপুরে বছর পনেরোর একটি শিরীষ গাছ উপড়ে গেছে দেখলাম। শিকড়ে জড়িয়ে রয়েছে ইমারতি বর্জ্য এবং প্লাস্টিক। পশুরা অন্ত্রে প্লাস্টিক জড়িয়ে মারা যাচ্ছে, এটা এখন পুরোনো খবর। বহু জায়গাতেই, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে এখন গাছের পায়ের নীচে মাটি নেই। ইমারতি বর্জ্যের কথা বাদই দিলাম, প্লাস্টিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সরকার এবং সংবাদ মাধ্যম যেটা করে চলেছে তাকে ইয়ারকি বলা যেতে পারে। এগুলির উৎপাদন এবং বিক্রি বিষয়ে কথা না বলে তাঁরা জনগণকে সচেতন করে চলেছেন। আর মাঝে মাঝে হৈ চৈ করে সব্জি বিক্রেতা, মুদি দোকানি, এদের নির্বিষ হুমকি দিচ্ছেন। স্বচ্ছ ভারত অভিযান বা নির্মল বাংলা মিশনের একমাত্র বক্তব্য দাঁড়িয়ে গেছে, লোকে যেন মাঠে পায়খানা না করে ঘরে পায়খানা করে। অথচ প্লাস্টিক দূষণে দুনিয়া ছয়লাপ হয়ে গেল। নর্দমা দিয়ে জল যেতে পারে না, অল্প বৃষ্টিতে শহরে জল জমে যাচ্ছে। জলাশয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে থার্মোকল আর প্লাস্টিক। বস্তুত প্লাস্টিক দূষণই সম্ভবত দৃশ্যমান দূষণের সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ। সরকার, রাজনৈতিক দল, সংবাদ মাধ্যম সকলেরই টিকি বৃহৎ পুঁজির কাছে বাঁধা। প্লাস্টিক শিল্পও বৃহৎ পুঁজির শিল্প। সুতরাং প্লাস্টিক শিল্পের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ভূমিকা নেয়া এদের পক্ষে সম্ভব না। যে সমস্ত বিজ্ঞানী, লেখক, শিল্পী এদের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করেন, তারাও কথা বলতে গিয়ে লক্ষ্মণ রেখা অতিক্রম করে নিজেদের বিপন্ন করবেন, এটাও আমরা আশা করতে পারি না। বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকেও যেন শীতঘুমে পেয়েছে। এ রকম পরিস্থিতিতে ব্যক্তি মানুষকেই প্লাস্টিক থার্মোকল দূষণ প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে এবং জোটবদ্ধ হতে হবে। যাইহোক গত 2রা মার্চ, 2017 বৃহস্পতিবারের আড্ডায় প্লাস্টিক এবং থার্মোকল নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করার প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা হল তা এতটাই অপ্রত্যাশিত যে টাটকা স্মৃতি থেকে সেদিনের কথোপকথন লিখে রেখেছিলাম। পরে কয়েকজন বন্ধুকে এটা পড়ালে তাঁরা কেউ কেউ বলেন, 'এগুলো পুরো নিষিদ্ধ করা সম্ভব না। তবে এদের ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া জরুরি।' বি ও বি-র আড্ডায় 'পেপার'-এর অভাবের কথা বলে আমার বক্তব্যকে নস্যাৎ করা হল, অথচ বিষয়টিকে ঘিরে আলোচনার মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো প্রস্তাব তৈরি হতেই পারে। সেই কারণে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা বি ও বি-র পাঠকদের জানাতে চাই একটু বড় পরিসরে আলোচনার জন্য।]

2রা মার্চ 2017 বৃহস্পতিবার 'বি ও বি'-র সাপ্তাহিক আড্ডার নির্বাচিত সংলাপ

বলাই: রবীনদা, কিছুদিন আগে একটা ইংরেজি দৈনিকে রামচন্দ্র গুহর একটা লেখা পড়তিছিলাম। বলছেন, 'একটা নদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম কিছুদিন আগে। দেখি নদীতে জল নাই কিন্তু নদীর বুকে প্রচুর পরিমানে প্লাস্টিক থার্মোকল এইসব ছড়ায় রইছে।' তিনি আশা প্রকাশ করছেন, অদূর ভবিষ্যতে এগুলো বন্ধ হইলে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন হবে। পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষের স্তরে প্লাস্টিক এবং থার্মোকল নিষিদ্ধ করার দাবি নিয়ে বি ও বি কি সই সংগ্রহ অভিযানে নামতে পারে? আমি পদ্ধতিগুলো জানি না। ওয়েবসাইট বা ইন্টারনেট ব্যবহার কইরেও এইটা হইতে পারে। এবং রবীন চক্রবর্তি হয়ত ঘরে বইসেই অনেক দূর অব্দি কাজটা করতে পারবে। কোথাও কোথাও তো দেখি এইভাবে লক্ষ লক্ষ সই জোগাড় করে।

নিখিলেশ পাল: ওম প্রকাশদা, আমার এই ব্যাপারটা.....

বলাই: নিখিলেশদা, আমি একটা কথা বলতিছি। বড় মানুষ কথা বললে কান খাড়া কইরে শোনবা আর আমার মতন ক্ষুদ্র লোকের কথার মধ্যে.....

নিখিলেশ পাল: আরে আমার অল্প কথা.....

বলাই: আমার কথা শেষ হয় নাই। আর অন্যরা এই নিয়ে কি বলে সেইটা আমি শোনতে চাই। যাই হোক বহু লোক নিশ্চই সই করবে। অনেক নামি লোকও সই করবে। কাগজে আলোচনা হইতে পারে। সহজেই হয়ত একটা বড় আন্দোলন গইড়ে ওঠবে।

প্রদীপ দত্ত: বড় বড় লোকের উপর নির্ভর করে আন্দোলন?

বলাই: জানি জিনিসটা ঠিক না, তবু লাভ হইতে পারে।

নিখিলেশ পাল: আমার প্রতি তোর আচরণের প্রতিবাদে আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। (ঈষৎ থেমে) বাইরে কাজ আছে।

বলাই: চায়ের দোকানে থাকতেছ তো?

নিখিলেশ পাল: হ্যাঁ। (নিখিলেশের প্রস্থান)

রবীন মজুমদার; চল্লিশ মাইক্রনের চেয়ে মোটা প্লাস্টিক সরকার অনুমোদন করেছে। এগুলো বহুবার ব্যবহার করা যায়। যারা ময়লা কুড়ায় প্লাস্টিক কুড়িয়ে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। সরকার এদের অর্থ সাহায্য দেবে না, কিন্তু পরিচয় পত্র দেবার কথা ভাবছে।

বলাই: (অসহিষ্ণুভাবে) চল্লিশ মাইক্রন বা তার চেয়ে মোটা প্লাস্টিকও লোকে বহুবার ব্যবহার করে না। একবার ব্যবহার কইরেই ফেইলে দেয় এবং সেগুলো রাস্তা ঘাট ময়লা করে। নিতান্ত দু একজন লোক হয়ত একাধিক বার ব্যবহার করে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তাই দেখতিছি।

রবীন মজুমদার এবং প্রদীপ দত্ত: ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এসব বলা যায় না, পেপার কোথায়?

বলাই: তোমরা দ্যাখছ পেপার?

রবীন মজুমদার: দেখিনি তবে থাকতে পারে।

বলাই: এবার তো দেখতিছি দাঁতের ব্যথায় কষ্ট হয় বললেও বলবা, পেপার কই? নিজের অভিজ্ঞতারে জেনারেলাইজ করতেছ।

ওমপ্রকাশ চক্রবর্তি: এই প্রসঙ্গে বলি, ডি.জে. সাউন্ড সিস্টেমের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে চাকদার লোক এটা বন্ধ করেছে। আনন্দবাজার এটাকে খবর করেছে। আমাদের কসবা এলাকাতেও আমরা কথা বলছি ডি.জে. নিয়ে কিছু করা যায় কি না। 18-ই মার্চ এই নিয়ে কলেজ স্ট্রিটে মিছিল আছে।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়: বলাই তোমারে আমি টালাপার্কে নিয়ে যাব। কত লোক ময়লা প্লাস্টিক কুড়ায়ে জীবিকা নির্বাহ করে তুমি দ্যাখবা। আবোল তাবোল কথা বললেই তো হবে না! তবে থার্মোকলটা বন্ধ হওয়া দরকার।

রবীন মজুমদার: কম্পিউটার পার্টস প্লাস্টিকে মোড়া থাকে, ওষুধ প্লাস্টিকে মোড়া থাকে, প্লাস্টিক ব্যান করব বললেই কি হয় নাকি!

বলাই: বিস্কুট, পাউরুটি এই রকম নানা জিনিস প্লাস্টিকে মোড়া থাকে, বিভিন্ন জিনিসের যেমন শ্যাম্পুর পাউচ প্যাক, ক্যারি ব্যাগ, জল চা দেয়ার ইউস অ্যান্ড থ্রো প্লাস্টিক থার্মোকলের কাপ, এগুলো তো বন্ধ করা যাইতেই পারে! আমি বোঝতে পারতিছি না এত সামুলি বিষয়ে তোমরা এইসব কূটতর্ক তোলতেছ কেন! আমার মনে হয় তোমাদের পেশার কারণে এই আপত্তিটা আসতেছে। সব কথায় পেপার পেপার..... আর আমি কাগজে খবর দেখছি কমপ্যাকটর মেসিন আসার পরে র‍্যাগ পিকারদের কাজের সুযোগ অনেক কইমে গেছে।

সাহিত্য সমাজ বিজ্ঞান সাময়িকী **কালধ্বনি** 2/1A আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা

<kalodvani@yahoo.co.in>ফোন:9830227186

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ফোন: 9830922194 এবং 9331012567

প্রাচীন ভারতের উত্তরাধিকার: হিন্দুত্ববাদীদের হাতেই ছেড়ে দেবেন সেকুলার-বামেরা?

বিশ্বজিৎ রায়

হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে লড়তে চাও, তো রামায়ণ-মহাভারত পড়েছ? গুহক চণ্ডালকে, শুদ্রক কে জানো? না জানলে লড়াইটা করবে কি ভাবে? লড়াইটা চৈতন্যের স্তরে। গান্ধী তুলসীদাসের রামচরিতমানস থেকে হরিজনের ধারণা নিয়েছিলেন। রাম আর তার রাজত্ব একটা প্রতীক কিন্তু ওটাই শেষ নয়। এর উত্তরণ ঘটাতে হবে। আজকের রাম হল ঢোঁড়াইচরিত মানসের ঢোঁড়াই। সতীনাথ রামচরিতমানসের জনপ্রিয়তাকে মাথায় রেখে সমসাময়িক দেশের রাজনীতি এবং প্রান্তিক জনের চেতনা ও অভিজ্ঞতার আলোয় নতুন রামকে এঁকেছিলেন। ধর্মের ইতিহাস বহুস্তরীয়। এটা একটা মহাফেজখানা। ভারতে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ধর্মের ধারা শুধু অন্ত্যজ বা দলিতদের মধ্যেই নয়, সমাজের অন্য স্তরেও ছিল। সঙঘ পরিবারের বিরুদ্ধে লড়তে হলে ধর্মকে নিয়ে ওঁদের আধিপত্যবাদী বয়ানের পাল্টা প্রতিবাদী বা অন্তর্ঘাতকারী বয়ানগুলিকেও জানতে-বুঝতে হবে। এটা ধর্মের 'ইন্সট্রুমেন্টালিস্ট' ব্যবহার থেকে আলাদা। ইতিহাস দিয়ে রাম-দুর্গা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ যাকে কবির মনোভূমি বলেছেন, লড়াইটা সেখানেও।

বক্তা প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্র যিনি নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার অন্যতম পরিচিত মুখ।

হিন্দু ধর্ম তথা প্রাচীন ভারত থেকে আমাদের সময়োপযোগী নেওয়ার মতো কি আছে? জাতপাতের অচলায়তন আর নারী-বিদ্বেষ ছাড়া! ধর্মের নিন্দা করতে চাই না। কিন্তু মনুস্মৃতির বিরোধিতা তো করতেই হবে। উমা চক্রবর্তী একবার বলেছিলেন আমি তো একজন ভালো হিন্দুই হতে চাই। কিন্তু সেটা কোথায়? হিন্দু ধর্মের নামে এখন বিজেপি-আর এস এস যা সব করছে, তার বিরুদ্ধে কোনও হিন্দু প্রতিষ্ঠান প্রতিবাদ করছে কি? তা ছাড়া প্রাচীন ভারত বা হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমরা বলতে গেলে ওরা শুনবে কেন? ওরা তো বলে: কমিউনিস্টরা ধর্মশাস্ত্র জানে না, রামায়ণ-মহাভারত জানে না। তা ওরাও তো জানে না। প্রাচীন ভারতের সঙ্গে প্রাচীন গ্রিসের তুলনা টানতে গেলেই তেড়ে আসবে। চার্বাকদের নিয়ে বলতে গেলে ওরা উড়িয়ে দেবে। তাই প্রতিবাদের প্রশ্নে আমরা ধর্মকে ব্যবহার করব না। পুরোন বামপন্থী ধ্যানধারণা থেকে সাধারণ মানুষের রুটি-রুজি, জীবনসংগ্রামের ইস্যুগুলিকে সামনে আনতে হবে। প্রতিবাদের পুরোন ভাষার গুরুত্ব আজও আছে। হ্যাঁ, পরিস্থিতি অনেকটা বদলে গেছে এটা ঠিক। কিন্তু আধুনিকতা তথা সংবিধান, আইনের শাসন, গণতন্ত্রের কথা বলতেই হবে। তবে একটা তাস নিয়ে খেললে হবে না। ওরা ঘন ঘন তাস বদলাচ্ছে। আমাদের স্ট্র্যাটেজিও একটাই হবে না। বক্তা প্রখ্যাত বামপন্থী ইতিহাসবিদ তনিকা সরকার যার আর এস এসের অন্দরমহল নিয়ে গবেষণা দেশজ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী সংগঠনটির হাইড্রাসুলভ কার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রেখেছে।

এদেশে হিন্দুত্ববাদ একটি শক্তিশালী মতাদর্শ হয়ে উঠছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির একটা ঐতিহ্য আছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় লেখা শাস্ত্রভিত্তিক ঐতিহ্যের আবেদন সীমিত। সে জন্য আর এস এস শাস্ত্র নিয়ে বেশি কপচায় না। বদলে ওরা একটা সোনার ভারতের বানানো ইতিহাস বলে শোনায়। সেখানে ফিরলেই আজকের সমস্যামুক্তির কথা বলে লোককে ভোলায়। এর বিরুদ্ধে বামপন্থীদের লড়াইতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির বস্তুবাদী-যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার একটি ঐতিহ্য আছে। হিন্দু ধর্মের প্রধান গ্রন্থগুলির বিশ্লেষণের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যবাদী ধারার প্রতিস্পর্ধী দর্শন ও ধর্মমতের ইতিহাস নিয়ে ডি ডি কোসাম্বি থেকে সুকুমারী ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জানকী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গেছেন। আজকের বামেদের তা থেকে শিখতে হবে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। হিন্দুত্ববাদীদের শিবিরে প্রকৃত ইতিহাসমনস্ক, শিক্ষিত লোক নেই। আমরা হিন্দুত্বের সংজ্ঞা (রি-ডিফাইন) বদলে দিতে পারি।

বক্তা প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী সাহিত্য সমালোচক ও বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসকার শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। মুসোলিনির বন্দিশালায় মৃত আন্তনিও গ্রামশ্চি ও হিটলারের মুরুব্বিদের হাতে গুমখুন রোজ লুক্সেমবুরগ, এই দুই ব্যতিক্রমী কমিউনিস্ট বিপ্লবীর মননভুবনকে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীদের কাছে হাজির করার কাজেও শমীকবাবু অন্যতম পথিকৃৎ।

এটা দুঃখের বিষয় যে ডিডি কোসাম্বী, রোমিলা থাপার, রামশরণ শর্মাদের পর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস নিয়ে গবেষণা নতুন প্রজন্মের বামপন্থী ইতিহাসবিদরা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। ফলস্বরূপ প্রাচীন ভারত চর্চা বা সাধারণ মানুষের কাছে এ নিয়ে বলার অধিকার ও সুযোগ এখন হিন্দুত্ববাদীদের একচেটিয়া। বেদ-উপনিষদ-পুরাণের কাল সম্পর্কে যা খুশি তাই গালগল্প বলে বেড়াচ্ছে।

বক্তা ইতিহাস ও তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক কুণাল চট্টোপাধ্যায় যার বলশেভিক বিপ্লব নিয়ে পড়াশুনোর ব্যপ্তি ও গভীরতা পরিচিত।

প্রথম তিনটি বক্তব্য (আমি যতটুকু বুঝেছি) ফ্যাসিবাদ ও আজকের ভারত নিয়ে সাম্প্রতিক এক ধারাবাহিক বক্তৃতামালায় শোনা। চতুর্থ জনের মন্তব্য দিল্লির জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ধারার বাম ছাত্র আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে কলকাতায় এক আলোচনা সূত্রে। প্রসঙ্গ হিন্দুত্ববাদী তান্ডবের বিরুদ্ধে মার্ক্স-ভগত সিং-আম্বেদকর-পেরিয়ার-ফুলেদের সূত্রে বাম ও দলিত আন্দোলনকে মেলানোর প্রয়াস।

বামপন্থার বিভিন্ন ঘরানার চার ইতিহাসবিদ রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিস্টও বটেন। তাদের মতামতে অধুনা রাষ্ট্রক্ষমতাসীন হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের মোকাবিলায় প্রাচীন ভারতের প্রধান ও গৌণ-প্রান্তিক ধর্মগুলি, ধর্মাশ্রিত সংস্কৃতি, দর্শনের বিভিন্ন ধারা নিয়ে চর্চার প্রয়োজনীয়তা এবং তা থেকে আমাদের শস্ত্র সংগ্রহের গুরুত্ব নিয়ে বাম বৌদ্ধিক মহলের মতবিরোধ প্রতিফলিত। এই তর্কের ধারাবাহিকতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসের প্রতি বাম-সেকুলারদের মনোভাবের কথা অবধারিতভাবেই আসে।

গণেশের দুগ্ধপান বা তার নেয়াপাতি ভুড়ি শোভিত ধড়ের উপর হস্তিমুন্ডের নেপথ্যে প্রাচীন শল্যচিকিৎসার চমৎকারিত্ব, মাধ্যাকর্ষণ-বিজয়ী মুনি-ঋষিদের শূন্যভ্রমণ, রাম না হতেই রামায়ণের মতোই রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের বহুকাল আগেই, দেবতা এবং দেবাংশী পুরুষদের পুষ্পক রথে বিমানবিহার, সুলক্ষণযুক্ত পুত্রলাভে গর্ভসংস্কার বা গো-মূত্র তথা পঞ্চগব্যের রোগনিবারণ ক্ষমতা—ইত্যাদি নিয়ে নরেন্দ্র মোদী— মোহন ভাগবতের নেতৃত্বে গৈরিক বাহিনীর সাম্প্রতিক উবাচগুলি দেশবাসীর কাছে বহুলপ্রচারিত। আম জনতা তো বটেই, ইতিহাসবিদ ও বৈজ্ঞানিক মহলেও সঙ্ঘ-প্রাণিত হিন্দু সভ্যতার গৌরবগাথা প্রতিষ্ঠায় পদার্থবিদ্যা-রসায়ন-গণিত থেকে শুরু করে শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতীয় আবিষ্কার-উদ্ভাবন বা জ্ঞানের ঐতিহ্য বিষয়ে নানা দাবি তোলা হচ্ছে সরকারি মদতে। টেলিভিশনে যোগগুরু বাবা বা মায়েদের কল্যাণে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই দাবিগুলির প্রধান সমর্থক ও সামাজিক ন্যায্যতার উৎপাদক। এই দাবিগুলিকে দেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রকৃত ইতিহাসের আলোয় বিচার-বিশ্লেষণ করে 'দুধ কা দুধ, পানি কা পানি' আলাদা করে জনসমক্ষে প্রতিস্পর্ধী প্রতর্ক গড়ে তোলার তাগিদ বাম-সেকুলারদের মধ্যে বিশেষ দেখছি না। বরং সাধারণভাবে আজকের বামপন্থী বা যুক্তিবাদী-বস্তুবাদী ঘরানার ইতিহাসবিদ-বৈজ্ঞানিকরা তা অদ্ভুত বিশ্বাসপ্রসূত উদ্ভট বলে নাকচ করে তাদের দায়িত্ব শেষ করছেন। হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রপ্রকল্পের অতীতনির্মাণের প্রতি এই অতিপ্রতিক্রিয়ায় 'বাথ ওয়াটার'-এর সঙ্গে 'বেবি'-কেও ছুঁড়ে ফেলার তাড়নাই প্রবল। আমরা যারা ইতিহাসবিদ বা বৈজ্ঞানিক নই তারাও রাজনৈতিক ঘরানার সূত্রে নিয়ে পাড়ার চায়ের দোকানে বা নিজেদের আড্ডায় সঙ্ঘী অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার ও অপবিজ্ঞান নিয়ে হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠছি।

আমজনতার মনোজগতে এইসব দাবি বা বিশ্বাস আজ আরও বেশি করে শেকড় পেলেও আমরা তাদের থেকে নিজেদের অগ্রণী ভেবে আত্মশ্লাঘায় ভুগছি। কেন না এতকাল ধরে আমাদের বামপন্থা, আধুনিকতা এবং বিজ্ঞানসম্মত ধ্যানধারণা যে সমার্থক। জনসংস্কৃতিতে শাসকের মতাদর্শ-সংস্কৃতির আধিপত্য নিয়ে মার্ক্স থেকে গ্রামশ্চি কপচালেও চেতনার স্তরে পাল্টা ইতিহাসটা হাজির করা দূরে থাক, এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে চর্চার ধারাটিও শুকিয়ে গেছে।

মজা হচ্ছে, এরই মধ্যে আমরা নিজেদের মধুমেহ-রক্তচাপ, অস্থি-গ্রন্থি বা মুত্রথলির সমস্যা সামলাতে 'যোগা' করছি। কারণ এটা শারীরবিজ্ঞানসম্মত। আয়ুর্বেদ মেনে গাছ-

গাছড়ার শিকড়-বাকড় জোগাড় করে সেদ্ধ বা ভিজিয়ে খাচ্ছি। কারণ এর পিছনে উদ্ভিদবিজ্ঞানের অনুমোদন আছে। তার সঙ্গে আছে পরম্পরাগত লোকজ্ঞানের প্রতি নবার্জিত আস্থা। দ্বিতীয়টি পশ্চিমি ধ্রুপদী আধুনিকতা ও বিজ্ঞানভাবনার উৎসজাত না হলেও ইদানীং পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা, সর্বপ্রাণঘাতী প্রযুক্তি ও ভোগবাদের বিষময় ফলাফল নিয়ে বিশ্বজুড়ে পরিবেশ আন্দোলনের ফল। তার প্রভাবে দেরিতে হলেও নবীন বামপন্থীদের একাংশের মধ্যে সমাজপ্রগতি তথা মানবসভ্যতার অভীষ্ট যাত্রাপথ নিয়ে পুরোন স্বতঃসিদ্ধগুলিকে ফিরে দেখার দায়বোধ দেখা দিচ্ছে। এই 'এক্লেক্টিজম' বা বিভিন্ন উৎসজাত ধ্যানধারণাকে প্রতিদিনের জীবনে আমরা মেলাই, অনেক সময়ই সে সময়ে সচেতন না থেকেই। এতে নিজেদের বিশ্বাস ও অভ্যাসগুলি পুনর্বিচারের দায় ও টানাপড়েন থাকে না। কিন্তু একে ভাবের ঘরে চুরি বললে কম বলা হয়। এ আসলে আমাদের সামগ্রিক বৌদ্ধিক বন্ধ্যাত্ব এবং তা স্বীকারে অনীহার প্রকাশ।

হিন্দু ধর্ম-সমাজ, সঙঘ পরিবার ও চলতি সেকুলার-বাম দৃষ্টিকোণ

শুধু প্রাচীন ভারতে বস্তুবাদ ও বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস নয়, নয়ের দশক থেকেই দেখছি সেকুলার-লিব্যারাল রাজনীতি, বিশেষত বাম মহল ইসলাম-পূর্ব ভারতের সামগ্রিক ইতিহাসের উপর সঙঘ পরিবারের মৌরসিপাট্টা কার্যত মেনে নিয়েছে। একাদেমিয়া ও অ্যাক্টিভিজমের মধ্যে পূর্বতন সাঁকোটি ভেঙেচুরে যাওয়ায় কিছু বহুব্যবহারে জীর্ণ লব্জের বাইরে প্রতিস্পর্ধী প্রতর্ক হাজির করার তাগিদ ও ক্ষমতা আমাদের নেই।

ঔপনিবেশিক কালে প্রাচীন ভারত ঘিরে মেকলে-ম্যাক্সমূলরের তাচ্ছিল্য-মুগ্ধতার দ্বৈত বয়ানের সঙ্গে আমরা পরিচিত। রোমিলা থাপারের ইতিহাসবিদরা দুটি ধারাকেই বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস চর্চার পক্ষে বিপদজনক মনে করেন। এর জেরে স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ইংরেজ প্রশাসক-ইতিহাসবিদ এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের নানা ঘরানার মধ্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভাল-মন্দ এবং দেশজ ঐতিহ্য ও পশ্চিমি আধুনিকতার সংঘাত-সংশ্লেষ নিয়ে নানা বিতর্ক, বলা ভালো বিতণ্ডা চলেছে। ভারত সম্পর্কে মেকলে ঘরানার ব্রিটিশ ইতিহাসবিদদের ঔপনিবেশিক তাচ্ছিল্য ও দম্ভের জবাবে ম্যাক্সমূলর ঘরানার প্রভাবে বঙ্কিম থেকে তিলক-রাণাডে, রমেশ মজুমদার থেকে ভান্ডারকর বস্তু ও ভাবজীবনে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার অর্জনকে কার্যত আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার সমতুল্য প্রমাণের চেষ্টা চালিয়েছেন। সঙঘ পরিবারের হিন্দুত্ববাদীরা মুখে ম্যাক্সমুলরপন্থী হলেও আসলে হিটলারপন্থী।

অন্যদিকে এদেশের বাম-সেকুলার চিন্তকদের কয়েকজনকে বাদ দিলে অধিকাংশই মেকলে-পন্থী। স্বাধীনতার আগে এস এ ডাঙ্গে বা ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদের মতো প্রথম যুগের ভারতীয় কম্যুনিস্ট নেতারা সমাসাময়িক কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা গোত্রীর হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজনে প্রাচীন ভারত নিয়ে পড়াশুনো করতেন। ডাঙ্গে তাঁর 'ইন্ডিয়া ফ্রম প্রিমিটিভ কমুনিজম টু স্লেভারি, এ মারক্সিস্ট স্টাডি অফ এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি ইন আউটলাইন' বইতে লেখেন: 'এটা আমার দৃঢ় ধারণা যে হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্রাদি, সামাজিক রীতিনীতি এবং অতিকথা ('মাইথোলজি')র বিশাল সম্ভার সম্পর্কে চর্চা জরুরি। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোয় পড়লে এবং ব্যাখ্যা করলে হিন্দু রক্ষণশীল ও বুর্জোয়া দর্শনের প্রবক্তারা লজ্জা পাবে।' নিজেদের তত্ত্ববিশ্বাস মোতাবেক সেই চেষ্টাটাও আজকের মার্ক্সবাদীরা করেন না। উলটে বাম ভাবনার সঙ্গে হিন্দুত্ববাদীদের ভাবনা বিপরীত মেরুতে থাকলেও সেই সময়কে 'এসেন্সিয়ালাইজ' করার প্রশ্নে দুই তরফেই সমাপতন লক্ষ্যনীয়।

আমাদের পাথুরে বাম বয়ানে প্রাচীন ভারত ছিল এক ভাববাদী কল্পস্বর্গ যা শাস্ত্রবেত্তাদের বাগাড়ম্বরের আড়ালে অলঙ্ঘনীয় বংশানুক্রমিক বর্ণব্যবস্থা, মায়াবাদ ও কর্মফলবাদ ভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও সহযোগী রাজতন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী দমন-পীড়ন, কদাচার-কুসংস্কারে ন্যুব্জ, স্থবির। রাজসভা, পুরোহিত ও নগরশ্রেষ্ঠীদের বৈভব ও ক্ষমতার প্রদর্শনীর আড়ালে গ্রামভারত এক অচলায়তন যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী সময় থমকে ছিল। ঔপনিষদিক ঔদার্য আসলে আধিভৌতিক বিশ্বচেতনার বুদ্বুদ মাত্র যা ভাববাদী দর্শনের কুৎসিত ও হিংস্র সামাজিক প্রকাশগুলিকে সাময়িক চাপা দেয়। অনেক কাল পরে এই অহল্যাভূমির প্রাণ ফেরে পশ্চিমি ঔপনিবেশিক জাদুকাঠির ছোঁয়ায়।

সন্দেহ নেই, নাজিবাদ ও ফ্যাসিবাদের আগে জার্মান

রোমান্টিসিজম যদি হয় হিন্দুত্ববাদের পূর্বসূরি, তবে সিপাহি বিদ্রোহের কালে মার্ক্স-এঙ্গেলসের ভারতদর্শন তথা 'এশিয়ান মোড অফ প্রোডাকশন' ও 'ওরিয়েন্টাল ডেস্পটিজম'-এর ধারণা আমাদের বামমার্গীদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা তথা শ্রেণীসংগ্রামের গতিশীল প্রবাহের ধাক্কায় কালসন্ধিতে সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অনিবার্যতার সূত্রগুলির বৌদ্ধিক অভিঘাত যুগান্তকারী। ইতিহাসচর্চার পুরোন ধোঁয়াটে প্রদীপ ও কালিমাচ্ছন্ন লণ্ঠনগুলিকে হঠিয়ে একটি দূরগামী ও জোরালো সার্চলাইটের আলোয় অতীত ও ভবিষ্যৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কিন্তু সে যে সুড়ঙ্গের মধ্যে আলো, তাই সুড়ঙ্গের দেওয়ালই আলোর সীমানা আর দূরদৃষ্টির সীমা—এই বোধ ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হয়েছে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়েই। মার্ক্সবাদের জনকেরা উপনিবেশিক বর্বরতাকে ধিক্কার ও শোষিত-নিপীড়িত কালো-বাদামি মানুষের প্রতি সহানুভূতি জানালেও তাঁদের চোখে মানবসভ্যতার প্রগতির ভরকেন্দ্র ইউরোপ। এই প্রগতিতে পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজ-সম্পর্ক, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা সম্পর্কে তাঁদের বিশ্লেষণও ইউরোপকেন্দ্রিক। যার সূত্রে পশ্চিমি ঔপনিবেশবাদ ও পুঁজিবাদ বিশ্ব-ইতিহাসের সারথি হয়ে দাঁড়ায়। যে ব্যাখ্যায় পুঁজিবাদী প্রতীচ্যের ঔপনিবেশিক ধর্ষণের ফলে দীর্ঘ বন্ধ্যাত্বের পর অসূর্যম্পশ্যা প্রাচ্যের বৈপ্লবিক গর্ভসঞ্চার ঘটে। অপরিমের রক্তপাত এবং দুঃসহ যন্ত্রণা সত্ত্বেও আখেরে তা ধর্ষিতার পক্ষে মঙ্গলজনক হয়ে ওঠে। যেহেতু বস্তুর চলমানতায় বলের ভূমিকা অনস্বীকার্য, তাই এসিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার বলাৎকার তথা ইউরোপীয় শিশ্নক্ষুধাকে ইতিহাসের অনিবার্য সুধাক্ষরণের উপায় জ্ঞানে ধারণ করাই বিধেয় বটে। তবে ভারত ইতিহাসের অন্যতর বস্তুবাদী পাঠগুলি ভিন্ন কথা শোনায়। তারা জানায়: প্রাগার্য, প্রাক-বৈদিক পর্ব থেকে শুরু করে আর্য-অনার্য পারস্পরিক বৈরিতা ও আত্তীকরণ সূত্রে অর্থনীতি-রাজনীতি, ধর্ম-সংস্কৃতি এবং সামাজিক অনুশাসনের বিবর্তন সূত্রে আজকের গতিতে না হলেও উপমহাদেশের সমাজ ছিল চলমান। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-লোকায়তিক ও উপজাতীয় ভারতের ভিতরে বর্ণ-গোষ্ঠী-ভাষা, কাল ও অঞ্চল ভেদে বহুস্বর প্রতিধ্বনিত হয়েছে বারংবার। রমাপ্রসাদ চন্দ, অতুলকৃষ সুর, ডি ডি কোসাম্বী, ভান্ডারকর, রোমিলা থাপার, রামশরণ শর্মা, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, নীহাররঞ্জন রায়, সুকুমারী ভট্টাচার্য প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ, সমাজতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদদের গবেষণায় তা আমরা জেনেছি।

রোমিলা থাপার তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস - 1000 খ্রিস্টপূর্বাব্দ-1526 খ্রিষ্টাব্দ' (ওরিয়েন্ট লংম্যান, 1980) বইতে স্পষ্টতই 'ওরিয়েন্টাল ডেস্পটিজম' বা প্রাচ্যদেশীয় স্বেচ্ছাচার-এর তত্ত্বপ্রসূত 'ভারতীয় সংস্কৃতি(র) বহু শতাব্দী ধরেই অপরিবর্তিত ও জড়বৎ' দশার ধারণাকে 'অতিশয়োক্তি' বলে নিন্দা করেছেন। 'জাতিভেদ প্রথা, ভূমি ব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক কাজকর্মের কয়েক শতাব্দী ব্যাপী ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তনশীল সামাজিক সম্পর্কের সামান্য বিশ্লেষণ করলে প্রমাণ হয়ে যেত যে, ভারতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গঠন, আর যাই হোক, মোটেই স্থিতিশীল ছিল না.....আশ্চর্য লাগে উনবিংশ শতকে ইউরোপে যেমন সেখানকার ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ধারা আবিষ্কারের উপর প্রচন্ড জোর দেওয়া হয়েছিল, এশিয়ার ইতিহাস অনুসন্ধানের সময় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়নি। (সূত্রঐ)।

যদিও আজকের নানা গবেষণায় প্রমাণিত শিল্পবিপ্লব কালের ইউরোপের গতিশীলতার তুলনায় স্থবির হলেও প্রাচীন ভারত বা চিন ও জাপান যে রেনেসাঁ ও রিফরমেশন-পূর্ব তো বটেই, তার পরবর্তী কালের ইউরোরে থেকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কতিক মানদণ্ডে পিছিয়ে ছিল না। কৃষি ও নগরসভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সমুদ্র ও স্থলবাণিজ্য, পর্যটন-পরিব্রাজন সূত্রে তথ্য, জিজ্ঞাসা ও জ্ঞান বিনিময়ে বাকি বিশ্বের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। থাপার বা তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের রণবীর চক্রবর্তীর মতো (প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, আনন্দ পাবলিশার্স, 1398) ইতিহাসবিদেরা দেখিয়েছেন আনুমানিক 200 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে 300 খ্রিষ্টাব্দ পর্বে রোম সাম্রাজ্য তথা ভূমধ্যসাগরীয় গ্রেকো-রোমান সভ্যতা এবং পশ্চিম এশিয়ার আরব জগতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সূত্রে ভাবজগতের আদান-প্রদানও সজীব হয়ে ওঠে। পূবে চিন ও ইন্দো-চায়না কাছে আসে। ইথিওপিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এই দেওয়া-নেওয়ার সূত্রে জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, জাহাজনির্মাণ, সমুদ্রবিদ্যা, মানচিত্র ও মুদ্রা ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে। প্লিনি-টলেমি-মেগাস্থিনিস থেকে তাভারনিয়ের-

বারনিয়ের-মানুচ্চি, হুয়েন সাং থেকে আল বেরুনি - পশ্চিম ও পূবের ভারত-পর্যটকদের বিবরণী তার সাক্ষ্য দেয়। কৃষি ও বাণিজ্যিক অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে নগর-লাগোয়া গ্রামাঞ্চলে বা নগরের প্রান্তে নানা পেশার দক্ষ কারিগর-শিল্পীদের সংঘ বা গিল্ড জাতীয় সমাজ-সংগঠনের বিস্তার ঘটেছে ইউরোপের প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজের মতোই। মৌর্য থেকে মুঘল যুগে মণিমুক্তোয় মোড়া, সুগন্ধি মসলায় ম ম ভারতীয় সমৃদ্ধির কিংবদন্তীর নেপথ্যে কিছু ঐতিহাসিক সত্যতা তো প্রমাণিত। সেই ভারতের প্রতি ভাসকো দা গাম - কলম্বাসদের আকর্ষণ সোনায় মোড়া ইনকা-আজতেক সভ্যতার প্রতি করতেস-পিজেরোদের লুটেরা লুব্ধতার থেকে কম ছিল না।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদ

সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর 'ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য' (ইংরেজি 'লিটারেচার ইন ভয়েস এজ' এর অনুবাদ) বইতে অর্থববেদ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতে ব্যাধি ও চিকিৎসার কথা উল্লেখ করেছেন। পূর্বকালের বৈদিক সাহিত্যের তুলনায় অথর্ববেদে অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বস্তুবাদী চর্চা বাড়ার ইঙ্গিত। পশুপালক আর্য সমাজ কৃষিজীবী হয়ে ওঠার এই পর্বে রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ইন্দ্রজাল ও ধর্মাচরণ তথা মন্ত্রপাঠ ও যাগযজ্ঞের মাধ্যমে দেবদেবীর তুষ্টিসাধনে বিশ্বাসে প্রাধান্য থাকলেও ভেষজবিদ্যা তথা আয়ুর্বেদ চর্চার মাধ্যমে প্রাকৃতিক উপায়ে রোগ-নিরাময় বা তার প্রকোপ প্রশমনের চেষ্টা বাড়ে। এমন কি শল্যবিদ্যারও শুরু সে সময়ে। ''অথর্ববেদের অন্যতম শাখা চরণবৈদ্যকে যে চরক-সংহিতার লুপ্ত উৎস রূপে মনে করা হয়ে থাকে তা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। আনুষ্ঠানিক নির্দেশগুলি বা বিনিয়োগগুলিতে আমরা লক্ষ্য করি যে ওষধি, ধাতু, এবং রাসায়নিক পদার্থ ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত হত; শিশু চিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা ও শল্যচিকিৎসার উপাদানগুলি খুবি প্রাথমিক স্তরে হলেও বিদ্যমান ছিল''। স্রেফ দেবানুগ্রহ তথা মন্ত্রের শক্তিতে বিশ্বাসী আর্য পুরোহিতদের ভেষজবিদ্যার প্রতি প্রবল তাচ্ছিল্য ছিল। অথর্ববেদ যে দীর্ঘকাল বৈদিক সাহিত্যের অংশ বলে স্বীকৃতি পায়নি তার অন্যতম প্রধান কারণ এতে 'চিকিৎসা-সংক্রান্ত বহু মন্ত্র রয়ে গেছে'। শুধু তাই নয়, পরবর্তী কালে মৈত্রী উপনিষদে চিকিৎসকদের জন্য স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু কালান্তরের বৈদিক সাহিত্যে এই 'ভিষক' বা ভেষজবিদরা সম্মানিত পেশাগুলির অন্যতম।

থাপার তাঁর পূর্বোক্ত বইতে আদি বৈদিক যুগে অঙ্কের চর্চার শুরু প্রসঙ্গে লিখেছেন: ''বলিদানের অনুষ্ঠানের থেকে প্রসঙ্গত কয়েকটি বিষয়ের চর্চা আরম্ভ হয়। বলিদানের জায়গায় বিভিন্ন উপকরণ রাখবার সঠিক ক্ষেত্র নির্ণয়ের জন্য বিস্তারিত আঙ্কিক হিসেবের দরকার হত। এ থেকে অঙ্কের চর্চা বাড়ল। আবার ঘন ঘন বলিদানের জন্য পশুর দৈহিক গঠনতন্ত্রের সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সুবিধে হল। তার ফলে বহুদিন পর্যন্ত শারীরবৃত্তি বা রোগ-নিরূপণ বিদ্যার চেয়ে দৈহিক গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান অনেক বেশি অগ্রসর ছিল। (দ্বিতীয় অধ্যায়, আর্য সংস্কৃতির প্রভাব) (ঋগবেদের) সৃষ্টি স্তোত্রে যে সংশয় ব্যক্ত হয়েছে তা সে যুগের জ্ঞানপিপাসা ও আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার একটি উদাহরণ মাত্র। এর একটি পরিণতি হল বৈরাগ্য। ....সন্ন্যাসী জীবন সব সময়ই পলায়নী মনোভাবের পরিচায়ক মনে করলে ভুল হবে। উপনিষদ পড়লেই বোঝা যায় এই ঋষিদের মধ্যে অনেকেই জীবনের কিছু কিছু মূল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করছিলেন। কোথা থেকে এসেছিল এই জগতসংসার? একই নক্ষত্র জগতের কোন সঙ্গমের ফলে সৃষ্টি? তাপ থেকে? তপশ্চরজা থেকে ? আত্মা বলে কি কিছু আছে? আত্মা তাহলে কি? মানব-আত্মার সঙ্গে জগত-আত্মার কি তাহলে সম্পর্ক?

বামপন্থী থাপারের বইতে এই উদ্ধৃতিগুলি সবই এ এল ব্যাশামের 'দা ওয়ান্ডার দ্যাট ওয়াজ ইন্ডিয়া' থেকে। ব্যাশাম মোটেই মার্ক্সবাদী ছিলেন না। জন্মমাত্র পুরুষানুক্রমিক জাতপাতের জোয়াল কাঁধে নিয়ে গতজন্মের কর্মফলের মূল্য চোকাতে এ জীবনে সকল শোষণ-শাসন-লাঞ্ছনা মেনে নেওয়ার ধর্মীয় দর্শন এবং সামাজিক অনুশাসনের ক্রমকাঠিন্য ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেওয়ার প্রক্রিয়াটি থাপারের চোখ এড়িয়ে যায়নি। পাশাপাশি একই সমাজের নানা স্তরে বস্তু ও ভাব জীবনের টানাপড়েনে উঠে আসা জীবন ও জগত ঘিরে জিজ্ঞাসাকেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। কেন না ঐতিহাসিক সত্য এটাই যে ঐ জিজ্ঞাসার পথ বেয়েই বিজ্ঞানচেতনার শুরু। পূবে বা পশ্চিমে কোথাও হঠাৎ একদিন আকাশ থেকে বস্তুবাদী বর্ষণ শুরু হয়নি।

উদ্দালক আরুণি

প্রাচীন ভারতে বস্তুবাদী দর্শন এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানচেতনার উন্মেষের ইতিহাস বিষয়ে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দুটি আকর গ্রন্থ - 'হিস্ট্রি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া' এবং 'লোকায়ত, এ স্টাডি ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান মেটেরিয়ালিজম' বামপন্থী মহলে আদৃত। 1991 সালে প্রথম বইটির প্রকাশের পাঁচ বছর আগে আর একটি বইতে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সাধনার ইতিহাসের একটি উপক্রমনিকা লেখেন। মুখবন্ধ জোসেফ নিডহ্যামের।

তাঁর বর্ণনায় খ্রিষ্টপূর্ব 1750 সাল নাগাদ বৈদিক সভ্যতার অনেক আগে সিন্ধু সভ্যতাকে ঘিরে নগর-সভ্যতার প্রথম পর্বে ইজিপ্ট ও মেসপটেমিয়ার মতো এই উপমহাদেশেও গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার হদিশ মেলে। খ্রিষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে দ্বিতীয় নগরায়ণ পর্বে বস্তুবাদী প্রকৃতিচেতনার উষালগ্নে আদি ঔপনিষদিক কালের উদ্দালক আরুণিকে দেবীপ্রসাদবাবু এদেশের তো বটেই, বিশ্বের বিজ্ঞান চর্চার জনকের স্থান দিতে চেয়েছেন। পদ্ধতিগতভাবে পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষা নির্ভর বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ আরুণিকে তিনি মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে একটি সংহত তত্বভাবনার ভ্রূণ স্থাপনের কৃতিত্ব দিয়েছেন। আরুণি একজন ব্যক্তির নাম বা গোতমী গোষ্ঠীর ভাষ্যকারদের কৌলিক পরিচয় তা নিয়ে ধন্দ থাকলেও তিনি বা তাঁরা বস্তু ও জীবজগত ঘিরে সে যুগের প্রশ্নারত, চিন্তাশীল মননের অন্যতম প্রতিনিধি। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাঁর চিন্তা-চেতনাকে ভাববাদী ধর্মীয় দর্শনের ধুম্রজালে আচ্ছন্ন করে প্রচার করেছে অনেক কাল। অন্যদিকে আধুনিক কালে ইউরোপীয় পন্ডিতেরা আরুণির বিশ্লেষণকে বস্তুবাদী ভাবনার ঊষাকিরণ বলে স্বাগত জানাননি।

এর নেপথ্যে সাহেবদের ইউরোপকেন্দ্রিক ইতিহাসচেতনাকেই দায়ী করেছেন মার্ক্সবাদী দেবীপ্রসাদ। তবে একই সঙ্গে ভি যে চিল্ডে, নিডহ্যাম, জে ডী বারনাল, হেরম্যান জ্যাকোবি প্রমুখের ব্যতিক্রমী মানসিকতাকেও প্রশংসা করেছেন। সেকুলার জ্ঞান চর্চা তথা বিজ্ঞানভাবনার বিকাশে প্রাচ্যের সভ্যতাগুলির অবদান এঁরা স্বীকার করেছেন। দেবীপ্রসাদবাবুর পাঠ: আরুণির সমসাময়িক যাজ্ঞবল্ক্যরা যখন অনুমান-উপলব্ধি নির্ভর জ্ঞানের পূজারী তখন উদ্দালক প্রত্যক্ষ-সংবেদন ও পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষা নির্ভর প্রকৃতি পাঠের কথা বলেছেন। এটাই তাঁকে তাঁর সময় থেকে এগিয়ে রেখেছিল।

পরম ব্রহ্ম নয়, প্রাণের জন্মকথায় আরুণির উৎসনির্দেশ: 'তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যান্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি'। সেই ভূতগণের উৎপত্তির তিনটি কারণ—ইহারা অণ্ডজ, জীবজ, এবং উদ্ভিজ। (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ষষ্ঠ অধ্যায়। সূত্র উপনিষদ, [illegible]ণ্ড সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী)। পেটে ভাত না পড়লে যে বেদস্মৃতি মন থেকে মুছে যায় বা ব্রহ্মচেতনা ঊধাও হয়, নিজ সন্তান ও বেদাভিমানী শ্বেতকেতুকে সেটা হাতে কলমে বোঝান। বাবার নির্দেশ মতো ছেলে কিছুদিন উপোসী থাকার পর জানান যে তাঁর বেদসূত্র মনে পড়ছে না, চেতনাও লুপ্তপ্রায়। খাদ্যগ্রহণের পর তাঁর স্মৃতিশক্তি ফিরে এলে আরুণি বলেন: 'অন্নময়ম হি সোম্য; মনঃ আপোময়ঃ প্রাণ তেজোময়ী বাক ইতি'। হে সৌম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, বাক তেজোময়। (সূত্র ঐ)। খাদ্যের সঙ্গে স্মৃতি-চেতনা তথা মনের সম্পর্ক নিয়ে এহেন পরীক্ষাভিত্তিক বিশ্লেষণ সে যুগে ছিল অভাবনীয়। এভাবে বিজ্ঞানের সত্যকে আরুণি এই ক্ষুৎপিপাসারহিত তপস্যা বা কঠোর কৃচ্ছসাধনের দেশে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

দেবীপ্রসাদ উল্লেখ না করলেও তৈত্তিরীয় উপনিষদেও অন্নের গুরুত্ব নিয়ে একাধিক শ্লোক রয়েছে। 'অন্নাদ্বৈ প্রজা প্রজায়ন্তে। যা কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতা...অদ্যতেহত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদচ্যুতে ইতি'। অন্ন হইতে প্রজাগণ জন্মে—সেই অন্ন (খাদ্য) গ্রহণ করা যায় তাই জীর্ণ হইয়া রস-রক্তাদি ক্রমে শুক্রে পরিণত হয়, সেই শুক্র হইতে প্রাণিগণ জন্মে। জীবের দেহ ধ্বংস হইলে উহা পঞ্চভূতে পরিণত হয়। ঐ পঞ্চভূত হইতে আবার ব্রীহিযবাদি অন্ন জন্মে...ভূত দেহের উপাদান সমূহ এই প্রকারে অন্নের অন্তর্ভুক্ত হয় বলিয়া বলা হইয়াছে অন্ন ভূতগণকে ভক্ষণ করে। (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, দ্বিতীয় অধ্যায়, 2 অনুবাক, সূত্র ঐ)। অন্নভক্ষক থেকে ভূতভক্ষক অন্নে জীবজগতের চক্রবৎ যাত্রার এই প্রাচীন উপলব্ধি ও তার কাব্যিক সূত্রায়ণে কি জীবন ও প্রকৃতির আন্তঃসম্পর্ক (মিথস্ক্রিয়া?) নিয়ে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ চেতনা নেই যাকে আমরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যের খুব কাছাকাছি ভাবতে পারি?

৬-৮

আরুণি প্রসঙ্গে ফিরে আসি। প্রাচীন ভারতে জগত ও প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে প্রকৃতিঋদ্ধ ভাবনার জনক আরুণি কার্যকারণ সূত্রে ছন্দোবদ্ধ বিশ্বের অস্তিত্বের মৌলিক কারণ বা উৎসের সন্ধানে আগ্রহী ছিলেন। দৃশ্য ও শ্রাব্য বস্তুজগতে ঘটনা ক্রমের নেপথ্যে পারস্পরজের ধারাবাহিকতায় প্রথম কারণ (আল্টিমেট কজ) কে জানতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বস্তুর প্রত্যক্ষ রূপের গভীরে পরম বস্তু বা 'সৎ'-এর ধারণা আনেন। তাঁর মতে এই 'সৎ' খাদ্য, তেজ ও অপ (জল)-এর উৎস। বস্তুর অজস্র রূপের গভীরে মৌল কণাদের অস্তিত্বের ইঙ্গিত এভাবেই তাঁর প্রাচীন মননে ধরা পড়েছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে আমরা পাই:

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা দ্বিতীয়ম। তদৈধক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবা দ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত।" সৌম্য, প্রথমে এই জগত এক ও অদ্বিতীয় সৎ রূপে বর্তমান ছিল। কেহ কেহ বলেন, প্রথমে এই জগত এক ও অদ্বিতীয় 'অসৎ' রূপে বর্তমান ছিল। এবং সেই অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এর পর আরুণি দ্বিতীয় মতকে খন্ডন করছেন। "কৃতস্তু খলু সৌম্যেবং স্যাদিতি হোবাচ কথম সতঃ সজ্জায়েতেতি/সত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম।" কিন্তু সৌম্য, ইহা কি করিয়া হইতে পারে? কি করিয়া অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইতে পারে? এই জগত পূর্ব এবং অদ্বিতীয় সৎ রূপেই বিদ্যমান ছিল। দেবীপ্রসাদের মতে, এই সৎ বলতে আরুণি আদি বস্তু (primeval matter)কে বুঝিয়েছেন। এই সূত্রেই তিনি 'from nothing to being' বা অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের ধারণা নাচক করেছেন।

আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান না অপবিজ্ঞান

আয়ুর্বেদকে দেবীপ্রসাদ 'system of rational medicine' যুক্তিবাদী চিকিৎসা ব্যবস্থা বলে মান্যতা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। পূর্বোক্ত বইতে তিনি লিখেছেন: "ভেবেচিন্তেই যুক্তিবাদী তকমাটি ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে (আয়ুর্বেদ) খাস বিজ্ঞানের মর্যাদা পায়।" (ফ্রম ম্যাজিক টু মেডিসিন, সূত্র ঐ) চরক সংহিতা ও শুশ্রুত সংহিতা এবং অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ এবং পরবর্তী যুগের ভাষ্যগুলি উদ্ধৃতকরে তিনি আয়ুর্বেদকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতে অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, এমব্রায়োলজি, সার্জারি থেকে ফার্মাকোলজি, টক্সিকোলজি ইত্যাদি চিকিৎসাবিদ্যায় সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানচর্চার ভ্রুণগলির জন্মকথা শুনিয়েছেন। আধুনিক চিকিৎসা শিক্ষা-ব্যবস্থায় যা আজও গৃহীত নয়, সেই সংহত প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে মানুষের রোগ ও চিকিৎসার ওতপ্রোত সম্পর্ক নিয়ে ভাবনা থেকেই বটানি ও জুওলজি এমনকি ক্লাইমেটোলজির চর্চাও এর সঙ্গে যুক্ত। অ্যালকেমি বা প্রাচীন রসায়ন বিদ্যা থেকে আফ্রোডিজিয়াকস বা যৌনক্ষমতাবর্ধক তথা কামকলা ও রতিসুখ বৃদ্ধির চর্চাও বাদ যায়নি।

আরুণির মতোই চরক আসলে এক জন ব্যক্তিবিশেষ না চরণবৈদ্য নামে অভিধাপ্রাপ্ত ভ্রাম্যমান চিকিৎসকদের কৌলিক পরিচয় এনিয়ে বিদ্বান মহলে মতভেদ রয়েছে। তবে এটা স্পষ্ট মধ্য বৈদিক যুগ থেকে বৌদ্ধ-জৈন যুগ....এই দীর্ঘ কাল পরিক্রমায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতাজারিত জ্ঞানে পুষ্ট ও পরিমার্জিত হয়েছে আয়ুর্বেদের ঐতিহ্য।

শুধুমাত্র আটটি পুঁথির 126টি অধ্যায় সম্বলিত চরক সংহিতার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে দেবীপ্রসাদ দেখিয়েছেন: তিরিশটি অধ্যায় জুড়ে প্রাচীন চিকিৎসা বিদ্যার ইতিহাস, মূল নীতি বা সিদ্ধান্তসমূহ; আটটি অধ্যায়ে নানা রোগের উপসর্গ এবং কারণ বর্ণনা। পরের আটটি অধ্যায় জুড়ে খাদ্যাখাদ্য সূত্রে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক বা প্রাণিজ বস্তুর রেচনপ্রক্রিয়া ইত্যাদি, অপর আট অধ্যায়ে শারীরতন্ত্র, শল্যবিদ্যা ও ভ্রুণবিদ্যা। এর পর বারোটি অধ্যায়ে নানা রোগ নির্ণয়, তিরিশটি অধ্যায় নিয়ে ঔষধি, পথ্য, আরোগ্যের প্রক্রিয়া, পরের বারটি অধ্যায়ে ভেষজবিদ্যা pharmacopoeia এবং সবশেষে মল-মুত্রঘটিত সমস্যার সমাধান ইত্যাদি।

সুশ্রুত সংহিতার মূল বিষয় সার্জারি বা শল্যচিকিৎসা। পাঁচটি পুঁথিতে 120টি অধ্যায়ের মধ্যে সূত্র-স্থানে 46টি অধ্যায় জুড়ে চিকিৎসা শাস্ত্রের সাধারণ নীতিমালা এবং শল্যবিদ্যার সঙ্গে তার প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নির্মাণ ও ব্যবহার প্রসঙ্গ। এর পর নিদান-স্থানে 16টি অধ্যায়ে রয়েছে রোগ ও রোগের কারণ নিয়ে আলোচনা। পরের শরীর-স্থানে 10টি অধ্যায়ে অ্যানাটমি ও এমব্রায়োলজি। অনুবর্তী চিকিৎসা স্থানে 40টি অধ্যায়ে নানা থেরাপি চর্চা এবং কল্প-স্থানে বিষক্রিয়া নিয়ে আলোচনা।

6-B

শুধু তাই নয়, এই চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জনের উদ্দেশ্য-প্রকরণ নিয়ে সামগ্রিক একটি এপিস্টেমোলজি বা জ্ঞানতত্ত্বের চর্চাও শুরু হয়। ন্যায়-বিশেষিকা ধারার বস্তুবাদী দর্শন দ্বারা প্রাণিত এই জ্ঞানতত্ত্বে চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি নিয়মিত পারস্পরিক সংলাপ-অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং তর্ক-বিতর্কে উৎসাহিত করা হয়। এই ধারা প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের দর্শনের দিকেও আলোকপাত করে। মৃতদেহ জোগাড় এবং তার নিয়ন্ত্রিত পচনের পর সরেজমিন কাটাকুটিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অন্দরমহলকে জানার প্রক্রিয়া, অতঃপর কঙ্কাল থেকে অস্থিবিদ্যায় জ্ঞানলাভ - শবব্যবচ্ছেদের পদ্ধতির এহেন পুঙ্খানুপুঙ্খ থেকে স্পষ্ট, আয়ুর্বেদ শুধু বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা প্রশমনে শেকড়েবাকড় ব্যবহারের শাস্ত্র ছিল না।

আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত প্রামাণ্য পুস্তকগুলির পরতে পরতে সমসাময়িক ভাববাদ ও বস্তুবাদের মিশেল থেকে দেবীপ্রসাদ দেখানোর চেষ্টা করেছেন কিভাবে রাজকীয় আনুকূল্য, পুরোহিততন্ত্রের অনুমোদন লাভের প্রয়োজনে নিজেদের পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষালব্ধ বিশ্লেষণকে ভাববাদী মোড়কে ঢাকতে বাধ্য হয়েছেন প্রাচীন চিকিৎসক তথা ভেষকবিদরা। অন্যদিকে কালান্তরে জনপ্রিয় চিকিৎসাবিজ্ঞানকে নিজেদের শাস্ত্রমালায় জায়গা দিতে গিয়ে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যবাদীরা তাদের পছন্দসই ব্যাখ্যা চাপিয়ে দিয়েছে। তাই কর্মফলবাদ, গো-অর্চনা, ব্রাহ্মণদের দানধ্যানে পুণ্যলাভ, মোক্ষলাভ ইত্যাদিও আয়ুর্বেদে জায়গা পেয়েছে। জল থেকে দুধকে আলাদা করার দায় পালন করেছেন পরবর্তী প্রজন্মের ভাষ্যকাররা কেউ কেউ। আজ মোদি-ভাগবতদের হাত থেকে চরক-সুশ্রুত-জীবকদের ঐতিহ্য তথা আয়ুর্বেদকে রক্ষা করার দায় আমাদের।

দ্বিতীয় পর্ব

হিন্দু ধর্ম একটি নির্দিষ্ট ধর্মই নয়?

হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও কট্টর হিন্দুত্ববাদের নির্মাণ ঘটেছে ব্রিটিশ শাসনের গর্ভে, বিশেষত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিংশ শতকের প্রথমার্ধে। কিন্তু হিন্দু ধর্ম ও সমাজ কী শুধুই বঙ্কিম-বিবেকানন্দ, তিলক-মালব্য, দয়ানন্দ সরস্বতী-সাভারকর- হেডগেওয়ার-গোলওয়ালকরদের নির্মাণ? সেকুলার-বামেরা, বিশেষত বাম বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রভাবশালী অংশ হিন্দু ধর্মকে একটি ধারাবাহিক এবং সংহত ধর্মের স্বীকৃতি দিতেই রাজি নন। সেই ধারাবাহিকতায় আজকের তরুণ বামপন্থীদের কাছে হিন্দু ধর্ম একটি 'পলিটিক্যাল কন্সট্রাক্ট' মাত্র। ভয়ঙ্কর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলতা সত্ত্বে নানা গভীরশায়ী বৈশিষ্ট্যের কারণে বৃহত্তর দক্ষিণ এশিয়ায় হিন্দু ধর্ম ও সমাজের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রয়েছে। বিভক্ত ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ আমজনতার জীবনে এর গভীর প্রভাব আজও বিদ্যমান। এর কারণগুলো সম্পর্কে তলিয়ে অনুসন্ধানের বদলে সেকুলার-বাম ক্রমবর্ধমান উন্নাসিকতার কারণে সঙ্ঘ পরিবার হিন্দুত্বের ঠিকাদারি নিতে পেরেছে।

এটা ঠিক অবিসংবাদী প্রফেট ও পবিত্র পুঁথিনির্ভর সেমিটিক ধর্মগুলির তুলনায় হিন্দু ধর্ম ও সমাজের গড়ন ও বিকাশ আলাদা। এর আওতায় একই সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব প্রশ্নে অস্তিবাদী, নাস্তিবাদী ও অজ্ঞেয়বাদীদের প্রতিস্পর্ধী অথচ পাশাপাশি অবস্থান। এমনকি আস্তিকদের মধ্যেও সাধ্য ও সাধনপথের অনেকান্ততা। বৈদিক-পৌরাণিক যুগ এবং পরবর্তী বৌদ্ধ-জৈন-লোকায়তিক পর্বে ভাববাদ ও স্বভাববাদ পাশাপাশি চলেছে। এসব কারণে একে আমরা ধর্মমত ও দার্শনিক গোষ্ঠীগুলির মল্লযুদ্ধের মঞ্চ, বড়জোর একটি জগাখিচুড়ি ধর্মবিশ্বাসের বেশি গুরুত্ব দিইনি বা দিই না।

প্রাচীন সংস্কৃত থেকে পালি, কোন ধর্মসাহিত্যেই 'হিন্দু' শব্দটি নেই এবং আরব ও গ্রিক-সূত্রে সিন্ধু তীরের বাসিন্দাদের ঐ পরিচিতি নেহাত স্থানবাচক, জাতি বা ধর্মীয় সম্প্রদায়বাচক নয়—এসব বলে আমরা হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব বা প্রাচীনতা সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলি বটে। কিন্তু এটা আমাদের বালখিল্য ওজর মাত্র। কেননা প্রাচীনতর ব্যবিলনিয়-মেসোপটেমীয়-অ্যাসিরীয় পশুপালক-কৃষি সমাজের সর্বপ্রাণবাদী ও অন্যান্য 'প্যাগান' ধর্মগুলির পাশাপাশি গ্রেকো-রোমান নগরসভ্যতার বহুদেবতাবাদী ধর্মগুলির পরিচয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানবাচক। আহলে কিতাব বা পবিত্র ধর্ম গ্রন্থগুলির অনুসারী প্রধান সেমিটিক ধর্মগুলি তথা ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলমান সম্প্রদায় সহ বিশ্বের প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়গুলিও নানা উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত। আলাদা ধর্মসম্প্রদায় হিসেবে খ্রিস্টানদের পরিচিতি খ্রিস্টের বহু পরে। গলগাথায় ক্রুশবিদ্ধ যীশু একজন বিদ্রোহী ইহুদি মাত্র। পরবর্তী কালের খ্রিস্ট ধর্মে পরম পিতা-পুত্র ও

পবিত্র আত্মার 'হোলি ট্রিনিটি' বা ইসলামের কট্টর একেশ্বরবাদ এমনকি বৌদ্ধ ধর্মের অজ্ঞেয়বাদও স্বীয় অনুসারীদের বিভাজন ঠেকাতে পারেনি। তাই বিভাজন দিয়ে হিন্দু ধর্মের সাধারণ ঐক্য সূত্রগুলিকে নস্যাৎ করার প্রবণতা অনৈতিহাসিক। এটা ঠিক প্রাচীন ভারতে উত্তরে মৌর্য-গুপ্ত বা দক্ষিণে চোল-চালুক্য-বিজয়নগর ইত্যাদি সাম্রাজ্যের কালেও বিন্ধ্যের দুপারেই রাষ্ট্রনৈতিক, ভাষিক-সামাজিক ও ধর্মাচরণে বিপুল বৈচিত্র্য। এই কারণে হিন্দু ধর্ম কোনও আসমুদ্রহিমাচল কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য ও চার্চ নিয়ন্ত্রিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম হতে পারেনি। এর ফলে আজকের ভারত জুড়ে আম হিন্দুদের কোনও শিলীভূত ডগমার মাধ্যমে মৌলবাদীরা সহজে কুক্ষিগত করতে পারবে না। হিন্দু ধর্মের এই দুর্বলতার জায়গাটাই আমাদের অন্যতম জোরের জায়গা হয়ে উঠতে পারত। আজকের হিন্দু ফ্যাসিবাদী শক্তি হিন্দু ধর্ম ও সমাজের স্বঘোষিত রক্ষাকর্তা হয়ে উঠতে পারত না। যদি সেকুলার-লিব্যারাল-বামেরা দেশ জুড়ে জাতপাত, ভাষা, এথনিক ও আঞ্চলিক ভাবে বহুবিভক্ত হিন্দু মানসের অভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাতের পাশাপাশি তার ন্যূনতম ঐক্যচেতনা, যুগে যুগে ঘর ও বাহিরের ভিন্নতাকে আত্তীকরণের ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিতেন।

দক্ষিণ এশিয়া তথা অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশে বিবিধতার মধ্যে মিলন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনার শুরু অতি প্রাচীন কালেই, যা পরে আসা জনগোষ্ঠীগুলি ও পর্যটকদের কাছে হিন্দু সমাজ ও ধর্ম বলে পরিচিতি পেয়েছে। তুর্কি-আফগান-মুঘল শাসনে, বিশেষত আকবরের কালে যা শাসকীয় সহিষ্ণুতার সুযোগে নিম্ন বর্ণের হিন্দু-মুসলমানের ভক্তি আন্দোলন বা মিশ্র ধর্মসংস্কৃতিতে বিকশিত হয়।

উচ্চকোটির উপনিষদিক জিজ্ঞাসা থেকে নিম্নকোটির নানক-কবীর-রবিদাস-রজ্জব হয়ে লালনের কাল পর্যন্ত এই অভিযোজন-ক্ষমতাই রবীন্দ্রচেতনায় ভারতীয় সভ্যতার আধারস্বরূপ। যা সঙ্ঘী হিন্দু রাষ্ট্রবাদ বা সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের চালচিত্রে আঁটা ভারতমাতার প্রতিমা থেকে মৌলিক ভাবে আলাদা। হিটলার-মুসোলিনি প্রাণিত সঙ্ঘী যুদ্ধবাজ জাতীয়তাবাদের বিপরীতে সেকুলার-বাম মহল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার জয়গানকে সঠিক ভাবেই তুলে ধরেন। কিন্তু তাঁর 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'-এই ইতিহাস তথা সভ্যতাদর্শনে হিন্দু অতীত বিশেষত ঔপনিষদিক পর্বের ভাববাদী দর্শনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও মুগ্ধতার ভূমিকা আমরা ভুলে যাই।

আধো-চেনা আধো-জানা বহুস্তরান্বিত সেই প্রাচীনের পরতের পর পরত খুলে আধুনিকতার নানা নিরিখ....ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ, বাকস্বাধীনতা, তর্কপ্রিয়তা, সহিষ্ণুতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র চেতনার উন্মেষকথা রবীন্দ্রনাথ থেকে অমর্ত্য সেন শুনিয়েছেন। পাশাপাশি প্রকৃতি ও পুরুষ, জীবন ও জগত নিয়ে ভাববাদী দার্শনিক অনুসন্ধিৎসার গর্ভে প্রতিস্পর্ধী বস্তুবাদী জিজ্ঞাসা তথা পর্যবেক্ষণ-অনুমান-পরীক্ষা-প্রমাণের ভিত্তিতে বিজ্ঞানচেতনার ইত্যাদির ভ্রূণদশার কথা শুনিয়েছেন অক্ষয় কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ধারাবাহিকতায় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সমরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ। দূর অতীতের জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চার হাল হকিকত, সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরার কাজটি জটিল ও পরিশ্রমসাপেক্ষ।

তার পরিবর্তে বৈদিক সাহিত্যে সমসাময়িক সমাজ-সময় ও মানবচেতনার আখর খোঁজার বদলে তাকে আদিম পশুপালক জনগোষ্ঠীর শিশুসুলভ প্রকৃতি-ভীতি ও বিহ্বলতাজারিত দৈবী অনুগ্রহকামনা, তাদের ইন্দ্রজাল-যাগযজ্ঞের ধুম্রজালে আচ্ছন্ন ঐহিক ও পারত্রিক কামনাবাসনাকে গালগল্প বলে ব্যঙ্গ করা সহজ এবং সেটাই রেওয়াজ। উপনিষদসমূহ ও রামায়ণ-মহাভারতের সাহিত্য-মূল্য স্বীকার করলেও তাদের সমসাময়িক ও আধুনিক দার্শনিক ও ঐতিহাসিক মূল্য এবং সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে চর্চা ঔপনিবেশিক সূত্রে হিন্দু ভদ্রলোক ও সেকুলার-বাম চেতনার অবশ্যম্ভাবী অংশ ছিল এই সেদিনও। গ্রিক রাষ্ট্র ও সমাজদর্শন এবং নাটক-সাহিত্যের নানা ধারণা আমাদের আঁতেল আড্ডার লব্জে এবং জনপ্রিয় সিনেমা-নাটক-সাহিত্যেও এখনও ছড়িয়ে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে দর্শন, নাটক-সাহিত্য-শিল্পজ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা শুধু বিশেষজ্ঞ মহলের ব্যাপার। সেই স্তরেও প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার বিবর্তন এবং আধুনিক সময়ে তার প্রভাব নিয়ে চর্চার আগ্রহ কার্যত শুকিয়ে গিয়েছে। এতে সঙ্ঘ পরিবারের পোয়া বারো হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ও গৌণ ধর্মগুলির ইতিহাস চর্চা সেকুলার জ্ঞানচর্চার অঙ্গ বলে পশ্চিমে স্বীকৃত হলেও আমাদের বাম বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক মহলে এ বিষয়ে নাক-সিঁটকানো বিজ্ঞান ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা বলে পরিচিত। অথচ ধর্ম, বিশেষ করে ক্রিস্টানিটি তথা খ্রিষ্ট ও তস্য মাতা ভার্জিন মেরিকে নিয়ে মার্ক্স-এঙ্গেলস ও তাদের সমসাময়িক অন্যান্য সমাজতন্ত্রী এবং পরে ইউরোপীয় মার্ক্সবাদীদের মধ্যে ধারাবাহিক তর্ক চলেছে। বুর্জোয়া বিপ্লবোত্তর শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব তথা সমাজতন্ত্রের সাধনায় রিলিজিয়ন ও সেকুলারিজম নিয়ে সে বিবাদের ইতিহাস ঘাঁটলে মনে হতে বাধ্য—তোমার মহাবিশ্বে প্রভু হারায় না তো কিছু।

ক্রিস্টান ইউরোপের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সেকুলারিজম (মূলত ধর্মবিযুক্ত রাষ্ট্র, ব্যক্তিগত পরিসরে ধর্ম এবং পরে ধর্মহীন সমাজ ও ঈশ্বরহীন মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও অনিবার্যতা) আর আমাদের মতো সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা (গান্ধীর সর্বধর্মসমভাব বা সদ্ভাব, নেহরুর সকল ধর্ম থেকে দূরে আধুনিক রাষ্ট্রধর্ম বা নিম্নবর্গীয় ভক্তি আন্দোলনের ধর্মসমন্বয় বা ব্যক্তিগত ঈশ্বর) নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গেও সে বিতর্ক প্রাসঙ্গিক।

অন্যদিকে এদেশের নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার বিশেষ ধারার সুবাদে আমরা প্রথাগত ভাববাদ-বস্তুবাদ বাইনারির বাইরে বেরিয়ে ঔপনিবেশিক কালে দেশজ হিন্দু-মুস্লিম উচ্চকোটির ভাব ও বস্তুজগতের সমান্তরালে কৃষকচৈতন্যে দ্রোহচেতনার নেপথ্যে ধর্মীয় ও সেকুলার দুই উপাদানের বিচিত্র রসায়নের ভূমিকা জানতে পেরেছি। এমন উদাহরণ ইউরোপের প্রাক-বুর্জোয়া কৃষক বিদ্রোহগুলিতেও অজস্র। অন্য মহাদেশের ঔপনিবেশিক ও প্রাক-ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতাও বলে ঈশ্বরহীন বা দৈবী প্রেরণা ও আশীর্বাদহীন কোনও কৃষক বিদ্রোহ বা জনজাগরণ একেবারেই বিরল।

তবে এই প্রবন্ধের সীমিত পরিসরকে মনে রেখে আমি ইতিহাসের সেই সব পরত খুলছি না। শুধু রূপরেখা হিসাবে এটুকুই মনে রাখতে চাই মার্কসের নিজের অবস্থান তাঁর ইতিহাসবীক্ষার সামগ্রিকতায় মেলে। এঙ্গেলসের আগেই তিনি নাস্তিক হন। ঈশ্বরনির্ভরতা ছেড়ে মানুষের প্রজাতিগত ও ব্যক্তিগত প্রকৃত সম্ভাবনায় উত্তরণে বিশ্বাসী হলেও তিনি ধর্মকে শুধুই 'জনগণের আফিম' বলে নস্যাৎ করেননি। রাষ্ট্রধর্ম ও রাজধর্ম হয়ে ওঠার আগে খ্রীস্টধর্মের জনপ্রিয়তার নেপথ্যে আমজনতার ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ধর্মকে 'নিপীড়িতের দীর্ঘশ্বাস', বিচ্ছিন্নতা (এলিয়েনেশন) জনিত 'ভ্রান্ত চেতনা (ফলস কনসাসনেস)', শোষণ-শাসনের কঠোর বাস্তবতাকে হজম করতে প্রয়োজনীয় 'বিভ্রম (ইলিউশন)' বা 'বাস্তবতার জলছবি (ইনভারটেড রিয়েলিটি)' বলে সহানুভূতিও জানিয়েছেন। তাঁর মতে: ধর্ম সমাজের অসুখের লক্ষণ, তার কারণ নয়। অসহনীয় যন্ত্রণাকে সহনীয় করে তোলে বলে রোগের চিকিৎসার তাগিদটা মেরে বা ঝিমিয়ে দেয়। ঈশ্বরের নামে বা দেব-দেবীর নামে স্তোকবাক্য দিতে হবে না। কিন্তু রুগী বাঁচিয়ে রোগের চিকিৎসা করতে হবে। এই ভাবনার নেপথ্যে তাঁর পরিবারের ইহুদি অতীত কাজ করে থাকতে পারে। ব্রুনো বাউয়েরের মতো তিনি ধর্মহীন রাষ্ট্র হলেই সমাজ ঈশ্বরমুক্ত হবে বলে বিশ্বাস করতেন না। আমজনতার ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কামান দাগার চেয়ে তার আধিপত্যের উৎস রাষ্ট্র ও সমাজ তথা উৎপাদনব্যবস্থার খোল-নলচে বদলানোর মাধ্যমে ঈশ্বর ও তাঁর বার্তাবহনের দাবিদারদের অপ্রাসঙ্গিক করে তোলাতেই জোর দিয়েছেন তিনি। এঙ্গেলস লিখেছিলেন রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্পারটাকাসের নেতৃত্বে দাস-বিদ্রোহ বিফল হতে আমজনতা খ্রিষ্টধর্মকে আঁকড়ে ধরে। অবশ্য আমরা জানি খ্রিষ্টকে ঘিরে কৃষকদের দ্রোহচেতনা বহু প্রাচীন ও আধুনিক বহু উদাহরণ আছে। দুজনেই জানতেন ফরাসি বিপ্লবের পর্বে 'এনশিয়েন রেজিম'-এর অংশীদার চার্চের বিরুদ্ধে আমজনতার যুগান্তের ঘৃণা থাকলেও র‍্যাডিকাল বুর্জোয়া জ্যাকোবিন নেতাদের একাংশও চার্চ-মুক্ত খ্রিস্টের ধারণায় বিশ্বাস করতেন। সাধারণ জনমনেও তা প্রভাবশালী ছিল। এমনকি প্যারি কমিউনকে ঘিরে প্রলেতারীয় বিপ্লবচেতনার উন্মেষকালেও। এরপর ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের পর বুর্জোয়া বিপ্লবগুলিতে কৃষি থেকে উচ্ছেদ শহরে অভিবাসী শিল্প-শ্রমিকদের দুর্দশার অভিঘাতে রোম্যান্টিকতা-জারিত খ্রিষ্টীয় সমাজতন্ত্র বা ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রের ধারণা প্রবল হয়। বুর্জোয়াদের শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা তথা শ্রমজীবীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পাশাপাশি ফেবিয়ানদের অন্তসারশূন্যতার বিরুদ্ধে কলম ধরেন দুই বন্ধু। মার্কসের বক্তব্য: খ্রিষ্ট ধর্মের সামাজিক নীতি শুধুই কাপুরুষতা, আত্মঘৃণা, আত্মদমন, হতাশা, বশ্যতা—

এককথায় দাসত্ব শেখায়। অন্যদিকে প্রলেতারিয়েত শুধু রুটির জন্য লড়ে না। সে আত্মবিশ্বাসী, সাহসী ও স্বাধীনতাপ্রিয়। এই মাটির পৃথিবীতেই স্বর্গকে নামিয়ে আনতে চায়।

কিন্তু তাঁরা এটাও জানতেন আদি কমুনিজমের ধারণা এমনকি এলিয়েশনের ধারণাও ইহুদি-খ্রিষ্টধর্ম থেকে এসেছে। আদি কমুনিজমের ধারণার নেপথ্যে মুসা-ইসার আমলে ভিনধর্মী সাম্রাজ্যের দ্বারা দলিত-পীড়িত, দ্ররিদ্র আদি বিশ্বাসীদের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গত জীবনের স্মৃতি এবং বিশ্বাসীদের সমাজে সেই মূলে ফেরার আকাঙ্খা। মার্ক্স-এঙ্গেলস তাকে সমসাময়িক নৃতাত্বিক, সমাজতাত্বিক গবেষণার প্রেক্ষিতে পশুপালক, উপজাতীয় সমাজের সম্পতিগত যৌথতা ও সাম্য থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিভিত্তিক শ্রেণীবিভক্ত ধনতান্ত্রিক সমাজের অসাম্যের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় হাজির করলেন। শুধু তাই নয়, যুগে যুগে উৎপাদন উপকরণ তথা সম্পত্তি ও তাকে ঘিরে সমাজ-সম্পর্কের দ্বন্দ্বের সূত্রে ঐ মূলে ফেরার তাগিদটাকে মানুষের ইতিহাসের এক মৌলিক তাড়না এবং অনিবার্য পরিণাম বলে এক বস্তুবাদী বিশ্বাসের জন্ম দিলেন।

একইভাবে আদম ও ইভের আদি পাপের কারণে তস্য সন্তানদের ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং তদজনিত মানুষের আবহমানের দুঃখকষ্টের ধারণা ইহুদি-খ্রিষ্ট ধর্মের অন্যতম ভিত্তি। মার্ক্স তাকে সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা দিলেন। তিনি বললেন: মুনাফাখোর, পণ্যরতিসর্বস্ব বুর্জোয়া সমাজে পুঁজি-দাসত্বের জেরে শ্রমের ফসলের অধিকারহীন, মানুষের মর্যাদাহীন, প্রায় যন্ত্রে পর্যবসিত শ্রমজীবীদের বিচ্ছিন্নতাবোদের কথা। এর সঙ্গে জুড়লেন প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা, মানুষে মানুষে এবং ব্যক্তিমানুষের নিজের সঙ্গে ও দূরত্বের কারণগুলিও এই শেকড়ে জড়ানো। মানুষ যুগে যুগে এই বিচ্ছিন্নতার বেদনা থেকে মুক্তি চেয়েছে। ধর্ম থেকে শিল্প-সাহিত্যে এই বেদনাজাত দীর্ঘশ্বাস। এতে আশু অর্থনীতির দাবি পেরিয়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচনও তার উৎসাদনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মানবসভ্যতার দীর্ঘকালীন সামাজিক ও নৈতিক প্রণোদনাগুলির সমর্থন পেল। ধর্মীয় ব্যাখ্যায় যে জীবন ছিল জন্মজোয়াল টানার নিয়তিতাড়িত, মৃত্যুতেই সম্পূর্ণ হত পরিত্রাণহীন বেদনার বৃত্ত; তাকে পেরিয়ে নতুন আশাবাদের জন্ম হল। আর কোনও ঐশী অবতারের অপেক্ষা নয়; এবার প্রলেতারীয় মুক্তিদূতদের পদভারে মাটির পৃথিবী কেঁপে উঠবে।

মার্ক্স-এঙ্গেলসের ভাবশিষ্যদের প্রধানত দুটি ধারা। জার্মানিতে ভিলহেল্ম ভিটলিং- রোজা লুক্সেমবার্গ থেকে লাতিন আমেরিকায় লিবারেশন থিয়োলজির প্রবক্তারা চৈতন্যের স্তরে আধিপত্যের লড়াইতে ধর্মের ভূমিকা মেনেছেন। ভাববাদ-বস্তুবাদ বাইনারির বদলে এক ও বহু ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় ও তাঁর বার্তাবাহকদের ঘিরে দ্বন্দ্ব-দ্বন্দে দেশি শ্রেণীসংগ্রাম থেকে বিদেশি-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ছায়া-প্রচ্ছায়া খুঁজেছেন। অন্যদিকে বেবেলের নেতৃত্বে জার্মান কমিউনিস্টদের একাংশ ও লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা ধর্মের ইতিহাসের পাঠান্তরে তাকে শুধুই শাসক-শোষকদের বিশ্বস্ত সেবাদাস, প্রকৃত মুক্তিচেতনার প্রধান শত্রু তথা প্রতিক্রিয়ার অন্যতম দুর্গ বলে অভিহিত করেন। ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসকে ঝাড়ে-বংশে নিকেশ না করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র গড়া যাবে না বলে তাঁরা নিদান দিয়েছেন। এঁদের তর্কটাও মূলত খ্রিষ্ট ধর্ম, ভ্যাটিকানকেন্দ্রিক খ্রিস্টীয় মৌলবাদ ও ক্রিস্টান ইউরোপ ঘিরে।

মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েত শাসন-পর্বে তা ইসলাম ও স্থানীয় ঐস্লামিক সমাজ নিয়ে গড়ালেও তা বৃহত্তর মুসলিম জাহানকে ছোঁয়নি। তবে অটোমান সাম্রাজ্যের পতন ও আরব জাতীয়তাবাদের উন্মেষের পর থেকে পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ায় ইসলামিক মৌলবাদ, সেকুলার জাতীয়তাবাদ, মার্কসবাদের মধ্যে টানাপড়েন আজও অব্যাহত। অন্যদিকে আমাদের দেশি সেকুলার-বামেদের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বিভক্ত ভারতে ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার দেশজ স্বরূপ নিয়ে বিতন্ডাও ফুরোয় নি।

মার্ক্সবাদের সমালোচকরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে খ্রিষ্ট ধর্মের অনেক মিল খুঁজে পান।

ইতিহাস নামক নিরাকার ঈশ্বরের মানুষের উপর অনতিক্রম্য নিয়ন্ত্রণ, অভিকর্ষ-মহাকর্ষের মতো তাঁর অমোঘ নিয়মকানুন, বার্তাবাহকদের সূত্রে আসা ঐশী প্রত্যাদেশের আকর পবিত্র পুঁথিসকল, মুক্তিদূতেদের পুনরুত্থান ও শুভ-অশুভের মহাযুদ্ধের শেষে আমাদের হৃদয়-রাজের রাজত্বের প্রতিষ্ঠা। এটা ঘটনা মস্কো-কেন্দ্রিক ভ্যাটিকান মার্কসবাদকে একটি সেকুলার মৌলবাদে পরিণত করেছিল। তারপর নানা কূটকচালিতে ডগমা-ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক বিভাজন বেড়ে মিলটা আরও প্রকট হয়েছে। এদেশে তো আদিগুরুর বিগ্রহে

পেন্নাম ঠুকে তাঁর পুঁথির দোহাই দিয়ে বিপ্লবের ব্যাকরণ নিয়ে টুলো পন্ডিতদের চুলোচুলির ফাঁকে আমাদের দিন গেল। এর চেয়ে মার্কসের মুক্তিচেতনার মধ্যে যুগ-যুগান্তের ধর্মবিশ্বাসী আমজনতার দীর্ঘশ্বাস এবং আবহমানের আকাঙ্খাগুলির অনুরণন শুনতে পাওয়া ঢের ভালো নয় কি?

অন্যদিকে বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও সাধারণ পড়াশুনোয় যতটুকু বুঝেছি পশ্চিমী বিজ্ঞানের পজিটিভিস্ট দর্শনে দীক্ষিতরা যেমন ভাবে ভাবেন বিজ্ঞানের বিকাশ সেভাবে মোটেই ঘটেনি। প্রাকৃতিক আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার টানাপড়েনে আদিম মানবের বাঁচার লড়াই; খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের সন্ধানের ধারাবাহিকতাতেই মোটা দাগের ধর্মীয় বিশ্বাস, রিচুয়াল, ইন্দ্রজাল, ছোট ছোট প্রযুক্তিচর্চা থেকে উচ্চতর প্রকৃতিদর্শন ও বিজ্ঞানচেতনা বা প্রযুক্তিভাবনার জন্ম। উচ্চ কোটি ও নিম্ন কোটির জীবনের সর্বস্তরে র‍্যাশানালের নির্মাণে ইর‍্যাশানালের ভূমিকা বা দুটির সহাবস্থান আজ আর অজানা বা অস্বীকৃত নয়। পরিশীলিত বৈজ্ঞানিক মননেও সামাজিক-রাজনৈতিক বিশ্বাস বা অন্ধ কুসংস্কারের ভূমিকা কত ভয়ঙ্কর, তা দুটি বিশ্বযুদ্ধে বা পরবর্তী ঠাণ্ডা যুদ্ধে প্রমাণিত। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিকাশের বিভিন্ন পর্বে আগের যুগের স্বতঃসিদ্ধগুলি বা চলতি 'প্যারাডাইম'গুলির আধিপত্যের নেপথ্যে বিশুদ্ধ পরীক্ষালভ্য প্রমাণ বা অকাট্য গাণিতিক নির্ণয়ের বাইরেও সমসাময়িক বিশ্ববীক্ষার অভিঘাত যে স্পষ্ট, তার ঐতিহাসিক রেখাচিত্র বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে টমাস কুন ও সমমনস্কদের চর্চায় আমরা পেয়েছি। সে সব মনে রাখলে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানবাদ শুধু একটি সোনার পাথরবাটি মাত্র নয়, একটি সেকুলার মৌলবাদ বলে মনে হয়।

ধর্মের ইতিহাস চর্চা, ধর্মীয় ও সেকুলার মৌলবাদ

প্রাচীন ভারতের ধর্মীর জীবন নিয়ে এক আলোচনা (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, সম্পাদনা ডি সি সরকার, 1972) অধ্যাপক এন এন ভট্টাচার্য প্রশ্ন তুলেছিলেন: চার্বাক-লোকায়তিক, ন্যায়-বৈশেষিক-মীমাংসা দর্শনে এবং জৈন ও হীনযান বৌদ্ধ ধারায় নাস্তিবাদী দর্শনের এত তাত্ত্বিক সম্ভার থাকলেও কেন বাস্তবে ভারতের জনজীবনে তার প্রভাব নেই? উত্তর খুঁজতে গিয়ে আল-বেরুণির পর্যবেক্ষণ মতো অভিজাত হিন্দুদের শ্রেণী স্বার্থরক্ষায় আমজনতার অশিক্ষিত রাখার ব্যবস্থাকে অনেকটা দায়ী করেছেন। একই সঙ্গে এ প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ধারণা উল্লেখ করেছেন তিনি। তাঁর 'ইন্ডিয়ান এথেইজিম' বইতে দেবীপ্রসাদ লিখেছিলেন: নাস্তিবাদীরা তাঁদের দর্শনে সদর দরজায় ঈশ্বর নামে বিভ্রমকে ঢুকতে না দিলেও খিড়কিতে তাঁর সঙ্গী ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রবেশ আটকাতে পারেননি। তাঁদের নিজেদের মধ্যে প্রবল বিরোধ ছিল। আসলে কেঠো মার্ক্সবাদীরা বোঝেন না যে ভাববাদ ও বস্তুবাদের যাত্রা রেললাইনের মতো সমান্তরাল পথে নয়। চুলের বিনুনির মতো একে অপরের সংলগ্ন হয়ে এঁকে বেঁকে চলে এঁরা আজকের চেহারা পেয়েছে এবং জনমনে ঠাঁই নিয়েছে। এটা পূবে যতটা সত্যি, পশ্চিমেও ততটাই।

আমরা ভুলে গেছি ধর্মের ইতিহাসও শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। প্রতিটি ধর্মের মধ্যে ভাববাদ ও বস্তুবাদের লড়াই ছিল ও আছে। ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের প্রথাগত ধর্মীয় ব্যাখ্যার বাইরেও গত শতাব্দীতে আবিষ্কৃত 'ডেড সি স্ক্রোল' ও অন্যান্য নব-লব্ধ পুঁথিপত্র ও প্রত্নপ্রমাণের সূত্রে যীশু ও তাঁর সমসাময়িক ইহুদি বস্তু ও মানসজগত এবং পরে বাইবেল ঘিরে ক্রিস্টীয় বিশ্বাসের বিবর্তন নিয়ে মুক্তচেতন গবেষণা ইউরোপ ও আমেরিকায় অব্যাহত। পপুলার সাহিত্য-সিনেমায়ও তা চর্চিত। ক্রিস্টীয় মৌলবাদী বিশ্বাস ও চার্চের ঐতিহ্যের বাইরে খ্রিস্ট-জীবনের নানা দিক নিয়ে বিতর্ক চলছে। যদিও ইসলামিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও পশ্চিমি সভ্যতা রক্ষার নামে খ্রিষ্টীয় মৌলবাদ ও শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদের রমরমা বাড়ছে।

মুহম্মদ ও তাঁর ধর্ম ইসলামকে কেন্দ্র করে ইসলামিক জগতে নানা সময়ে আত্মজিজ্ঞাসা ও পরিপ্রশ্ন শোনা গেলেও আজ তার পক্ষে প্রধান বাধা ইসলামিক মৌলবাদ। একে ঐতিহাসিকভাবে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করেছে পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদ ও খ্রিষ্টানি মৌলবাদ। তবু অন্দরের প্রশ্নগুলিকে মেরে ফেলা যায়নি। প্রাচীন ইহুদি ধর্ম ও সমাজ তার প্রাচীনতর উৎস থেকে দূরে ফারাওয়ের ইজিপ্টে ও পরে খ্রিস্টান ইউরোপে ঘৃণা ও দমন-পীড়িত ছিন্নমূল জীবন কাটানর নানা পর্বে বারংবার বিশ্বাসের জগতে বহু স্বর ধ্বনিত হতে শুনেছে। কিন্তু আজ পশ্চিমি রাজনীতি ও অর্থনীতির কল্যাণে ইসলামিক জগতের বৈরিতা ও আধিপত্যবাদী ইহুদি রাষ্ট্রের প্যারানইয়ার জেরে তা রুদ্ধপ্রায় হলেও ফল্গুধারা শুকিয়ে যায়নি।

হিন্দু ধর্ম ও সমাজ ঘিরে এমনই এক অবরুদ্ধতার

ইতিবৃত্ত নির্মাণ করেছে হিন্দু মৌলবাদীরা যাদের বয়ানে ইসলাম ও মুসলিম সমাজ হল অন্দরের অবরোধকারী তথা ট্রোজান ঘোড়া। এই অবরোধের মুখে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং প্রতিবেশি সমাজের প্রতি তার মনোভাব নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা যাবে না। জিন্নার দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ ও পাকিস্থান গঠন এই বয়ানকে হিন্দু মানসে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করেছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজত্ব হিন্দু ও মুসলমান বৈরিতার আগুনে ধুনো ছিটিয়ে গেছে। অতীতকে ধামাচাপা দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির হিংস্র ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না।

ধ্রুপদী ফ্যাসিবাদের মতোই ঔপনিবেশিক শাসনের গর্ভজাত আধুনিক ধর্মীয় মৌলবাদ - তা সে হিন্দুত্ববাদী হোক বা তা তার ইসলামিক-খ্রিষ্টীয়-ইহুদি রকমফের - এক একরৈখিক ও সমসত্ব অতীত সভ্যতার গরিমাগাথা শোনায়। এতে ইতিহাস আর অতিকথার সীমানা ইচ্ছাকৃতভাবে ধূসর রাখা হয় বর্তমানের রাজনীতি-অর্থনীতির প্রয়োজনে। সভ্যতা-সংস্কৃতিগুলির ধারাবাহিক আদান-প্রদান, সঙঘাত-সমন্বয়ের ইতিহাসের বদলে দেশ-কাল, সমাজ-সময় নিরপেক্ষ মৌলবাদী বয়ানে নিজ গোষ্ঠী অপর জাতি-ধর্ম-ভাষাগোষ্ঠীর দ্বারা আক্রান্ত ও দূষিত, দুঃসময় পেরিয়ে দেবাংশী মুক্তিপুরুষদের হাত ধরে প্রাচীন মহিমায় ফের উদ্ভাসিত হওয়ার অপেক্ষায়।

বিশ্ব জুড়ে সব ধরণের ধর্মীয় মৌলবাদীদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জেরে ধর্ম ও সমাজ পরিবর্তন নিয়ে মুক্তচিন্তার পথে ক্রমশ দুস্তর বাধা। এই পরিস্থিতিতে ইসলাম-পূর্ব ভারতে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রিকভাবে বহুধাবিভক্ত হিন্দু সমাজের ইতিহাস চর্চা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই জরুরি প্রাচীন ভারতের অনেকান্ততা, সহিষ্ণুতা ও তর্কশীলতার ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার। দেশ ও কালের সীমানা পেরিয়ে যা কিছু খারাপ তাকে বর্জনের পাশাপাশি যা কিছু ভালো তাকে গ্রহণের মানসিকতাই মুক্তচেতনা। আধুনিকতার নামে পশ্চিমের অন্ধ নকলনবিশি জঙ্গি জাতীয়তাবাদ বা ধর্মীয় মৌলবাদের মতোই আর একটি মৌলবাদ। এক মৌলবাদ দিয়ে আরেক মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। যাচ্ছেও না।

প্রাচীন পাঠ্যের পুরোন বয়ানের বিনির্মাণ থেকে নতুন বয়ানের নির্মাণ, লেখক ও পাঠক বা বক্তা ও শ্রোতার নিজস্ব 'সাবজেক্টিভিটি'-কে স্বীকার করেই 'টেক্সট' ও 'কন্টেক্সট' মধ্যে মিলনসূত্র খোঁজার মাধ্যমে অতীত ও বর্তমানের সংযোগসাধনে হারমেনিউটিক্স ইত্যাদি আধুনিক বিদ্যা পশ্চিমি মননবিশ্বের সূত্রে এদেশেও সমাদৃত। কিন্তু এর সঙ্গে দেশজ জ্ঞানতত্ত্ব ও যুক্তিবিদ্যাকেও জেনে প্রাচীন ভারতকে বোঝা-জানা এবং বর্তমান ভারতের সঙ্গে তার সংযোগ-সূত্রগুলিকে খোঁজার চেষ্টা ফ্যাশনদুরস্ত নয়।

কেন না আমাদের বাম-চেতনায় ঐ প্রাচীন 'প্রি-হিস্ট্রি' মাত্র, যাকে আমাদের নাড়ী-কাটা আধুনিক অস্তিত্ব মাতৃগর্ভ বা ধাত্রীক্রোড় রূপে চিনতে পারে না, পারলেও স্বীকার করতে লজ্জা পায়। যেটুকু প্রাচীনচর্চা দরকার ছিল তা কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মধ্যে ডাঙ্গে-নাম্বুদ্রিপাদ কিছুটা আর বৌদ্ধিক স্তরে কোসাম্বি-কারভে-থাপার-মুখিয়া-শর্মারা করে গেছেন। এখন সঙঘ পরিবার ভারত ইতিহাসের লাশঘর থেকে মধ্য বা আধুনিক যুগের মুর্দা টেনে বের করলে আমরা পাল্টা সুরতহালে আছি। কিন্তু প্রাচীনে নেই। সংরক্ষণের অভাবে সেই যুগের লাশ এতটাই গলে-পচে গেছে যে তার হালতামামি আমাদের কাছে ফালতু কাজ। ফলে সেই লাশের উপর বসে এখন গেরুয়া-বাহিনির শব-সাধনা চলছে।

যৌনকর্মীদের অধিকার ও সংগ্রামের মুখপত্র **দুর্বার ভাবনা**
12/5 নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা-700006 ফোন: 033-25437560/7451
<sonagachi@sify.com>ওয়েবসাইট: www.durbar.org
সমর সেন প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক **Frontier**-এর ওয়েবসাইট
রবীন চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত: http://frontierweekly.com
(ফোন: 033-22659202)

রোগীর প্রয়োজনীয় রক্ত যোগারের কঠিন লড়াই

মালবিকা সেনগুপ্ত

গত কয়েক মাস ধরে প্রতিদিনের খবরের শিরোনামে দেখেছি 'ডেঙ্গু'তে মৃত্যু। কী ভয়ানক হৃদয় বিদারক সেই মৃত্যু - আমরা সবাই জানি। প্রতিদিনের এই মৃত্যু মিছিল - ভাবাচ্ছে সকলকেই। সেই ভাবনা থেকেই আজকের প্রতিবেদন। ডেঙ্গুর মৃত্যু অনেক সময়ই প্লেটলেটের সমস্যার জন্য হয়ে থাকে। প্লেটলেট রক্তের-ই একটা component যা রক্তের মতোই Blood Bank থেকে যোগার করতে হয়। অথবা একই blood group-এর donor-এর রক্ত থেকে platelet তৈরী করে দেয় Blood Bank এবং তা রোগীকে দিতে হয়। শুধু platelet না - যে কোনও রকম রক্ত সঠিক সময়ের মধ্যে যোগার করা এবং তা রোগীর শরীরে transfusion করা একটা কঠিন কাজ। আর এই জায়গাতেই লড়াইটা অনেক challenging হয়ে যায়। আমি দীর্ঘদিন এই ধরণের সমস্যার মধ্যে কাটিয়েছি বলেই ডেঙ্গুর মৃত্যুর কার্যকারণ সম্পর্কটা খানিকটা হলেও বুঝতে পারি। রোগী এবং রোগীর বাড়ীর লোকের অবস্থানটা আন্দাজ করতে পারি। আসলে রক্ত বা রক্তের কোনও component সঠিক সময়ে, সঠিক পরিমানে যোগার করাটা সত্যিই সমস্যা - তার কারণ মানুষের শরীর ছাড়া তো অন্য কোনও ভাবে রক্ত পাওয়া যায় না এবং এটা তো ওষুধ নয় যে কিনে নেওয়া যাবে বা আগে থেকে মজুত করে emergency সামলানো যাবে! রক্তের অভাব ছাড়াও রোগীর রক্তের প্রয়োজন হওয়া থেকে রোগীর শরীরে রক্তের transfusion করার মাঝে অসংখ্য ছোট বড় steps থাকে - যাতে involved থাকতে হয় ডাক্তার, নার্স, হাসপাতালের অন্য কর্মী, বাড়ীর লোক এবং Blood Bank-এর কর্মীবৃন্দকে। আর সেই কারণেই কাজটা এত কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ হয়ে পরে। এই steps গুলো সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ না দিলে বোধহয় এর গুরুত্বটা বোঝা যাবে না। রোগীকে blood দেওয়ার প্রয়োজন হলে, প্রথমে ডাক্তার বা নার্স রোগীর blood sample collect করবেন - এর পর ডাক্তার requisition মানে রক্তের চাহিদাপত্র তৈরী করে দেবেন। যেটিতে রোগীর বেশ কিছু তথ্য দিতে হয়। বাড়ীর লোককে সেই তথ্য জানাতে হয়। এরপর সেই blood sample আর requisition নিয়ে Blood Bank এ গিয়ে জমা দিতে হয়। Blood Bank-এ সাধারণত দীর্ঘ লাইন থাকে জমা দেওয়ার জন্য। এক/দেড় ঘন্টা সময় লেগে যায়। এরপর যদি blood পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে Blood Bank থেকে বলে দেন কখন আসতে হবে। সাধারণত কয়েক ঘন্টা সময় লাগে। তখন পৌঁছে লাইন দিয়ে, টাকা জমা দিয়ে, packet-এর নম্বর মিলিয়ে, সই করে, তার পর blood units collect করতে হয়। আর তখনই জানা যায় কত unit blood বা platelet পাওয়া গেল! বেশীর ভাগ সময়ই platelet-এর ভীষণ crisis থাকে এবং 6/8 unit চাইলে 3/4 unit-এর বেশী পাওয়া যায় না! কখনও একেবারেই পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক দূর্যোগ, উৎসবের মরসুমে blood donation camp হয় না বা খুব কম হয়—সেই সময় blood বা অন্যন্য component বিশেষত platelet-এর সাংঘাতিক অভাব থাকে। সেই সময় যে কী ভয়ানক অসহায় অবস্থায় পড়তে হয় রোগীর বাড়ীর মানুষকে—বলে বোঝানো যাবে না। যা হোক blood units পাওয়ার পরে তা পৌঁছে দিতে হয় হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কাছে। blood-এর প্রতিটি packet-এর গায়ে যে নম্বর থাকে তার list তৈরি করে, সই করে জমা দিতে হয় এবং নার্সরা সেই নম্বর মিলিয়ে দেখে তবে জমা নেন। এর পরেও ওই platelet যে রোগীকে দেওয়া হবে তার লিখিত নির্দেশ লাগে ডাক্তারের। এরকম প্রায় বার তিনেক আরো নম্বর মেলানোর মাধ্যমে official কাজ শেষ হলে— রোগীর হাতে channel তৈরী করা হয়, blood বা platelet দেওয়ার জন্য। সেটাও সাধারণত ডাক্তারই করে থাকেন। এর পরে ডাক্তার বা নার্স এসে blood/platelet চালিয়ে দেন। খুব সাবধানে চালাতে হয় - ক ফোঁটা platelet যাবে প্রতি সেকেন্ডে - তা ঠিক রাখতে হয়। একটা packet শেষ হলে পরেরটা চালাতে

হয় - একটা bubbleও যেন না ঢুকে যায় - তা খেয়াল রাখতে হয়। পুরো পদ্ধতিতে ডাক্তার এবং নার্সদের এতো বেশী involvement যে তাতেই অনেক বেশী সময় লেগে যায়। সরকারী হাসপাতালে ডাক্তার বা নার্স সব সময়ই ব্যস্ত থাকেন এবং ওনারা সেই কাজ শেষ করে তবেই সাধারণ এসব কাজে আসতে পারেন এবং তাতেই প্রতিটি step-এই খানিকটা সময় অপেক্ষা করতে হয়। অনেক সময় রোগী এতটা সময় লড়াই করতে পারে না - আর তখনই ঘটে যায় বিপর্যয়। জানি না কোনও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই নম্বর মেলানো, list বানানো এবং হস্তান্তরের পদ্ধতিকে সংক্ষিপ্ত করা যাবে কি না - তবে তা যে ভীষণভাবেই প্রয়োজন আজকের দিনে তা বলাই বাহুল্য। এখন সচেতনতার যুগ - তাই প্রতি পদক্ষেপেই লাগে লিখিত নির্দেশিকা। আইনের চোখে সঠিক পদক্ষেপ কি না - সেটা আজকের দিনে বেশী বিচার্য বিষয়। তাই রোগীর আত্মীয় অনেক অনেক কঠিন পথ পেরিয়ে রক্ত যোগার করার পরেও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয় এই সব official steps-এর জন্য। তাতে অনেক সময় প্রিয়জনকে হারাতেও হয়। স্বাভাবিক ভাবেই আইনের চোখে বা নিয়মের বিচারে সঠিক ভাবে কাজ হল কি না এটা যত বেশী গুরুত্ব পাচ্ছে - কোথাও যেন মানবিক নিয়মগুলো শিথিল হয়ে যাচ্ছে বলে আমার মনে হয়। এই ঘটনাক্রম মনকে খুবই ভারাক্রান্ত করে, হতাশও করে, তাই একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিতে চাই, যা হয়ত মনকে একটু শক্তি যোগাবে।

কয়েক বছর আগের কথা - স্বপন (ডঃ স্বপন দাস, আমার husband)-এর হয়েছিল অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। মানে রক্তটা তৈরি হত না ঠিক মতো। সাংঘাতিক বিপদের মুখোমুখি হয়ে পড়লাম। সরকারী, বেসরকারী হাসাপাতাল, আর Blood Bank এর ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে কেটে গেল প্রায় আড়াই বছর। একটা জীবনের সমাপ্তি আর একটা লড়াই-এর ইতি! সেই সব দিনগুলোকে আমি 'অতীত' করে দিতে চাই, কিন্তু প্রতিটি দিনের সেই অভিজ্ঞতা ছায়ার মতো আমার সাথে জড়িয়ে থাকে - পিছু ছাড়ে না। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা দিনের ঘটনা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

স্বপনের অসুখের প্রথম দিকে মূলতঃ (প্লেটলেটের সমস্যা ছিল। পরবর্তীকালে আরো অনেক blood component-এর সমস্যা হয়েছিল। তাই, বাইরে থেকে ওর শরীরে platelet দিতে হত বা platelet transfuse করতে হত। ডাক্তাররা SDP (Single Donor Platelet) দিতে prefer করতেন। একজন সঠিক donor-এর শরীরের platelet একটি যন্ত্রের সাহায্যে আলাদা করে তবেই SDP তৈরী করা যায়। এতে অনেকটা পরিমাণ platelet রোগীকে দেওয়া সম্ভব হয় আর রোগীর শরীরে তার স্থায়ীত্ব অনেক বেশী হয়। স্বপনকে অনেকবার SDP দেওয়া হয়েছিল।

SDP দেওয়ার জন্য অনেক ছোট/বড় ধাপ পেরোতে হত। ওর blood group ছিল A+ve, তাই A+group-এর donor-দের একদিন হাজির করতে হত Medical College-এর Blood Bank-এ, screening-এর জন্য। সেখানে ওনারা প্রাথমিক কিছু পরীক্ষা করতেন—যেমন, যিনি donate করবেন তাঁর height, শারীরিক গঠন ইত্যাদি আর বিশেষভাবে পরীক্ষা করতেন হাতের একটি vain যেটির মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে platelet সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলবে। এই প্রাথমিক পরীক্ষায় গড়ে 20 জনের মধ্যে 6/7 জন উত্তীর্ণ হতেন। যাঁরা উত্তীর্ণ হতেন, তাঁদের রক্ত পরীক্ষা করা হত। কয়েকদিন পর সেই blood report থেকে ডাক্তারবাবুরা list তৈরী করতেন donor-দের। blood test-এ অনেক কিছু দেখা হত। সর্বার্থে সুস্থ না হলে donor-এর থেকে রক্ত নেওয়া যায় না। আর বিশেষভাবে দেখা হত—Hemoglobin আর platelet count, এই দুটো নির্দিষ্ট level-এর থেকে সামান্য কম হলেও donor হিসেবে গণ্য করা যেত না। এসব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল donor-এর safety-র জন্য। এসব test ডাক্তারবাবুরা খুব নিষ্ঠা সহকারে করতেন। তাই অনেক ইচ্ছুক donor যোগার করলেও বাস্তবে গুটি কয়েকের বেশী donor আমরা পাইনি। এই কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে জেনেছি - গড়ে শহরাঞ্চলের মানুষের platelet একটু কমের দিকে থাকে, শহরতলীর মানুষের চেয়ে। তাই donor খুঁজে পাওয়া আমাদের কাছে আরো difficult ছিল। এদিকে 2013-র শেষের দিক থেকেই স্বপনের transfusion-এর প্রয়োজন বাড়তে থাকে। এই সময় internet-থেকে কয়েকটি phone no. যোগার করে দেয় আমার এক বন্ধু। সেই সব phone no -এ যোগাযোগ করে, তাদের এই সমস্ত পরীক্ষার পর, একজন donor-কে আমরা পাই যিনি SDP দিতে পারবেন। SDP তৈরীর জন্য ও অনেক steps, তাই প্রথমত Medical College-এর Blood Bank-এ যেখানে SDP তৈরী হবে, সেখানে একটা date নিলাম। সেই মতো SDP kit (যে যন্ত্রের সাহায্যে SDP তৈরী হবে)-এর লোকজন দের সাথে appointment করলাম। প্রায় ন হাজার টাকা

দিয়ে কিনতে হত এই kit, যা একবারই use করা যেত। আগের দিন রাতে সেই donor ভদ্রলোকের সাথে final কথা বলে নিলাম. অনেক instruction থাকত ডাক্তারদের, সেই সব বুঝিয়ে দিতে হত donor-কে। কি রকম পোষাক পরে আসবেন, কি খেয়ে আসবেন, কি করবেন না, ইত্যাদি। সেই সব কিছু খুব ছোট হলেও, খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যা হোক, এমন একজন অজানা, অচেনা মানুষ শুরুমাত্র আমাদের উপকারের জন্য এত কিছু করছেন ভেবে মনে মনে খুবই কুণ্ঠিত ছিলাম। এমনিতেও সকলের কাছ থেকে এত সাহায্য নিতে খুবই obliged feel করতাম - কিন্তু কিছু করারও ছিল না। মানুষকে এমন অনেক অবস্থাতেই পড়তে হয় জীবনে। যা হোক যেদিন SDP তৈরী হবে, সব রকম প্রস্তুতি সহই শুরু হল দিনটা। donor-কেকিছু official form fill up করতে হত, তার পর তিনি ভেতরে চলে যেতেন। একটা কাঁচের ঘরের মধ্যে SDP তৈরির processটা প্রায় দু/আড়াই ঘন্টা সময় লাগত। আমি/আমরা কিছু ওষুধ পত্র নিয়ে বাইরে বসে থাকতাম। সেদিনও তাই হয়েছিল, সব কিছু নিয়ম-মাফিক হচ্ছিল। আমি বাইরে বসেছিলাম। SDP-র process শুরু হল, কয়েক মিনিট কেটেও গেল। কাঁচের ঘরের বাইরে থেকে দেখতে পেলাম - হলুদ রঙের platelet জমা হতে শুরু হয়েছে bag-এ। মিনিট কুরি/পঁচিশ কাটতে না কাটতেই হঠাৎ donor ভদ্রলোক সাংঘাতিকভাবে বমি করে ফেললেন। ওনার সারা শরীর, bed মেঝে - সর্বত্র বমিতে ভেসে গেল। যেই ডাক্তার SDP processটা চালাচ্ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি সব বন্ধ করে দিলেন। donor ভদ্রলোক কিন্তু নড়াচড়া করার মতো অবস্থায় নেই। কারণ ওনার দেহের সাথে যন্ত্রপাতি লাগানো - পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সেগুলো খোলাও যাবে না। বাইরে থেকে এ দৃশ্য দেখে ছুটে গেলাম ডাক্তারবাবুদের কাছে, request করলাম যদি আমায় ভেতরে যেতে দেন, তা হলে ঐ ভদ্রলোককে একটু মুছিয়ে পরিষ্কার করে দেব বলে। কিন্তু ওনারা আমায় allow করলেন না। বললেন খবর দেওয়া হয়েচে cleaner-কে, তিনি আসবেন, একটু সময় লাগবে। সবই ঠিক। সেটাই নিয়ম। কিন্তু এ দৃশ্য তাকিয়ে দেখা আমার পক্ষে ভীষণই কঠিন ছিল। এক একটা মুহূর্ত অনেক লম্বা মনে হতে লাগল। কেমন দিশাহারা লাগছে। এমন সময় দেখলাম একজন সিনিয়র ডাক্তার খবর পেয়ে ছুটে আসছেন। উনি এসেই ভিতরে ঢুকলেন। কাঁচের বাইরে থেকে দেখলাম - উনি নিজে হাতে তুলো আর গজ দিয়ে donor ভদ্রলোকের সারা দেহ পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। সে যে কী মানবিক দৃশ্য - বলে বোঝানো যাবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস নিলাম আমি। তার খানিক সময় পরে সাফাইকর্মী এলেন, বাকী কাজ করলেন। সব নিয়মের উর্দ্ধে সেই মানবিক আচরণকে স্যালুট করি। স্যালুট করি সেই অচেনা বন্ধু (donor)-কেও, যিনি আমার বিপদের দিনে এগিয়ে এসেছিলেন এবং এমন অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতার পরেও দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন আশানরূপ support দিতে পারেননি বলে। সেদিন সেই অল্প SDP দিয়েই সামলাতে হয়েছিল স্বপনকে। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন খাওয়া-দাওয়ার সামান্য কিছু অনিয়মের জন্যই সম্ভবত সেই ঘটনা ঘটেছিল। যা হোক, সেই donor ভদ্রলোককে আমার বন্ধুরা গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দেয় এবং খবর নিয়ে জেনেছিলাম পরবর্তীকালে ওনার আর কোনও সমস্যা হয়নি।

সেই সিনিয়র ডাক্তারের এমন মর্মস্পর্শী ব্যবহার আমরা অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি। 2014 সালে, স্বপনের শরীর তখন খুব খারাপ, hemoglobin খুব কম। দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সেই ডাক্তারের সাথে দেখা করতে গিয়েছি, উনি তখন laboratory-র ভিতর ছিলেন। সেখানে একটাই চেয়ার ছিল, তাতে বসেই উনি কাজ করছিলেন। ওনাকে জিজ্ঞেস করেই ভিতরে ঢুকলাম, উনি দেখেই বুঝতে পারলেন বোধ হয় - স্বপনের কষ্ট হচ্ছে। উনি ওনার চেয়ার ছেড়ে জোর করেই বসালেন স্বপনকে। অবিশ্বাস্য! ভাবলে আজও চোখে জল আসে। সেদিন Blood Bank থেকে বেরিয়ে বাক্যহারা ছিলাম দীর্ঘক্ষণ। গাড়ীতে বসে দুজনেই এই অদ্ভুত অনুভূতিতে কেঁদে ফেলেছিলাম।

সেই দিনের ঘটনা স্বপনকে যুগিয়েছিল বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা। সেই দিনের সেই মানবিক বার্তা আমার সারা জীবন মনে থাকবে। আর আশা থাকবে - আগামীদিনে এ রকম আন্তরিক এবং মানবিক সোনার কাঠির ছোঁয়া অসংখ্য এমন অসুস্থ মানুষের মনকে শক্তি যোগাবে, বেঁচে থাকার কঠিন লড়াই জেতার জন্য!

আমাদের হাসপাতাল, ফুলবেড়িয়া, তেঘরি, বাঁকুড়া
শ্রমজীবী হাসপাতাল, বেলুড় (বালি), শ্রীরামপুর (বড় বেলু), সরবেরিয়া (সুন্দরবন)

জুপিটারিয়ানস্

নিখিলেশ পাল ও সুমিত চক্রবর্তী

"Each beat and each tune indescribably profound, no words are needed for those who understand music."

Zen Buddhist Parable

ধরা যাক বৃহস্পতির একটি বিশেষ উপগ্রহে প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেল। গুটিকয়েক মহাকাশচারী নিয়ে এক দীর্ঘমেয়াদি মহাকাশ অভিযানে হাত দিল নাসার বিজ্ঞানীরা, অবশ্যই আন্তর্জাতিক সহযোগিতায়। ধনী রাষ্ট্রগুলো আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল এই বিপুল আয়োজনে। অনেক প্রত্যাশা আর বিস্ময় নিয়ে এই অভিযান, অনুসন্ধান শুরু হল। উৎক্ষেপন মঞ্চের নির্ধারিত নিরাপদ দুরত্বে দাঁড়িয়ে এক প্রযুক্তিবিদ ভাঙা বাংলায় গেয়ে উঠলেন;

"ওগো সুদূর ওগো সুদূর বিপুল ও সুদূর,
তুমি বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী"

ভারতীয় বংশদ্ভূত, ভূতত্ত্ববিদ নাসা'র-ই এক বন্ধু-সহকর্মী সুদীপ্তার কাছে গানের এই কলিটি শিখেছিলেন জিন করভিন, ক্যান্টিনের কফির টেবিলে। এই নতুন দুনিয়ায় পৌঁছে পৃথিবীতে এই বার্তা পাঠাল যে তারা সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে 'ঈশ্বর'-এর দেখা পেয়েছে। সেখানকার প্রতিটি অধিবাসি কার্যত এক একটি 'আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান'। যেখানে রঙিন ঢিলেঢালা পোষাক পরা 'পুরোহিত' রয়েছে। সেখানে জীবন এবং মৃত্যুর প্রধান ঘটনাগুলোকে নিয়ে গভীর গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান হয়। তারা বিশেষ ধরণের ধ্যান-প্রার্থনা করে, যার গভীর মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে। মহাকাশচারিদের কাছে সূক্ষ্ম শারীরবৃত্তিয় পরিমাপক পদ্ধতি/যন্ত্র রয়েছে, যারা দ্বারা প্রশান্তি এবং দুঃখ কষ্টের বাড়া-কমা মাপা যায়। উপগ্রহবাসীদের কাছে রয়েছে প্রচুর শাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজা, রাষ্ট্রপতি, ধর্মীয় নেতাদের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা সমবেত হলেন। তারা ঠিক করবেন মহাকাশচারিদের বার্তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কি জানাবেন। তারা জানালেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নভোশ্চররা যেন ঐ জগতের শাস্ত্রগুলি পড়তে শেখেন, তাদের ভাষা দ্রুত শিখে নেন যাতে তাদের সাথে অন্তত ওই শাস্ত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

মহাকাশচারিরা যত তাদের লক্ষ্যের দিকে এগোতে লাগলেন, তাদের পাঠানো বার্তা ক্রমশঃই উৎসাহব্যঞ্জক হয়ে উঠতে লাগল। তারা জানালেন এখানকার লোকেদের বিশেষ করে এদের অগ্রণী পুরোহিতদের চিন্তা ভাবনা আমাদের মতই। ধর্ম বিষয়ে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান শব্দগুলি আমরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি। আমরা যে অর্থে তাদের ব্যবহার করি তারা প্রায় সেই অর্থেই এগুলি ব্যবহার করে। মহাকাশচারিদের উৎসাহ যেন পৃথিবীর যাদের সাথে তারা বার্তা বিনিময় করছে তাদের চেয়েও বেশি। খ্রিষ্টিও, ইহুদি এবং মুসলমান সমাজের প্রধান প্রধান ধর্মীয় প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে অতি তীব্র সংলাপে লিপ্ত হল। তারা মহাকাশচারিদের পরামর্শ দিতে চাইছে যাতে তারা আরো গভীরভাবে অপর দুনিয়ার বিষয়গুলির গভীরে যেতে পারেন। সম্ভবত নিজেদের ধর্মতত্ত্বের মধ্যেকার ভিন্নতাকেও পুরোপুরি মিটিয়ে চূড়ান্ত মিমাংসায় পৌঁছনোর চেষ্টাও তাদের ছিল। তারা মহাকাশচারীদের উৎসাহিত করতে লাগলেন, মধ্যযুগে প্রচলিত ধর্মীয় বিতর্ক সভার মত সভার আয়োজন করতে। যেখানে নতুন দুনিয়ার ধর্মীয় প্রধানদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে হবে।

অনিবার্যভাবেই মহাকাশচারীদের মধ্যে একজন অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি অন্য দুনিয়ার ভাষা শিক্ষায় এগিয়ে গেল। সেই মহিলা নভশ্চর যথাযথ এবং তীক্ষ্ণ সব প্রশ্ন করতে লাগলেন অন্য জগতের মানুষদের। নির্ধারিত বিতর্ক সভা (public debate)-র আগে ক'দিন ধরে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা কয়েকজন জুপিটারবাসীর সাথে কাটালেন। অদ্ভুত ব্যাপার হল, যত তীক্ষ্ণ প্রশ্ন তিনি করতে লাগলেন,

জুপিটারিয়ানদের জবাব যেন তত রহস্যময় হয়ে উঠতে লাগল। তখন এই নভশ্চরের সন্দেহ হতে লাগল, ব্যাপারটা কি? জুপিটারিয়ানরা যেন তার প্রশ্ন শুনে মজা পাচ্ছিল।

উত্তর দেবার বদলে এবার তারা উল্টে প্রশ্ন করল, এ রকম প্রশ্নের উত্তর তুমি জানতে চাইছ কেন? অক্সফোর্ডে দর্শন পড়া এই নভশ্চরের এবার যেন এদের কথার সাথে উইটজেইনস্টাইনের ছায়া দেখতে পেলেন। [পশ্চিমের দার্শনিক উইটজেইনস্টাইনের 'Tractatus Logico Philosophicus' রচনার একদম শেষাংশ থেকে তার মতবাদের একটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে, 'Wovon man nicht sprechen kann, daruber muss man schweigen' অর্থাৎ that whereof one cannot speak, one must be silent.]

এদিকে বিতর্কের দিন এগিয়ে আসছে এবং তাকেই দলের নেতাদের বলতে হবে কি ভাবে বিতর্কসভা পরিচালনা করতে হবে। অথচ অপর পক্ষের বিচার, অনুভব তিনি এখনো বুঝেই উঠতে পারছেন না, তার উদ্বেগ বেড়ে চলল। এবার তিনি অন্যভাবে এগোনোর চেষ্টা করলেন। দার্শনিক প্রশ্ন করার বদলে তিনি বোঝার চেষ্টা করলেন, ধর্ম সংক্রান্ত যে শব্দগুলিকে তারাও পৃথিবীর অনুরূপ অর্থেই ব্যবহার করেন বলে নভশ্চর ধরে নিয়েছিলেন, সেটা আদৌ ঠিক কি না!

তিনি 'আত্মা' বা যাকে পৃথিবীর ধর্ম উদাসীন ব্যক্তিরা 'সত্তা' বলে, সেই শব্দ দিয়ে শুরু করলেন। এবং তিনি দেখলেন, এই অর্থে কোনো শব্দই তাদের নেই। যেন তাদের ধারণা অনুযায়ী এটা কোনো স্থির বস্তু নয়, বরং একটা প্রক্রিয়া (process)। তারা বলে 'সবকিছুই ক্রমাগত বদলে চলেছে।' তারা ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে কথা বলে। বিশেষ্যপদ প্রায় সেখানে নেই।

এবার তিনি 'ঈশ্বর' শব্দে এলেন। তিনি তাদের নিউটন এবং আইনস্টাইনের তত্ত্ব, মহাবিশ্বের পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলি বললেন। দেখলেন তাদের জুপিটারিয়ান বিজ্ঞানের সাথে আমাদের নিখুঁত মিল রয়েছে। এবং তিনি তাদের বললেন, পৃথিবীর বহুলোক মনে বিশ্বাস করে, এক সত্তা আছে যাকে তারা 'ঈশ্বর' বলে। সেই সত্তা এই মহাবিশ্বকে ধারণ করে আছে। তিনিই জগতের নিয়মগুলি তৈরি করছেন, যে নিয়ম জীবনের বিকাশের জন্য যথাযথ। এখানে এসে এবার তিনি বুঝতে পারলেন, এ রকম কোনো ঈশ্বরের ধারণা তাদের নেই। ঈশ্বরের মত কোনো 'সত্তা' তাদের ধারণায় নেই। এবং তাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কোনো ঈশ্বর নয়। সুতরাং স্রষ্টা অর্থে 'ঈশ্বর' শব্দ ধরে নিয়ে তারা (নভশ্চররা) ভুল করেছিল। সামগ্রিক আত্মা বা সামগ্রিক অন্তর্বস্তুর চেয়ে সামান্যই বেশি অর্থে 'ঈশ্বর' শব্দ তারা ব্যবহার করে। তিনি এটাও বুঝতে পারলেন, সবকিছু এমন কি একটা পাথরেরও এ রকম 'ঈশ্বর' থাকতে পারে।

এবার তিনি সত্যি ঘাবরে গেলেন। পৃথিবীর লোকেরা যেখানে কিছু উদ্‌ঘাটিত হবে আশা করছিলেন, তিনি দেখলেন তার কেন্দ্রে রয়েছে বিশাল গহ্বর। কিন্তু বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি আনন্দিত হলেন। তিনি আনন্দের সাথে বলে উঠলেন, এতদিনে ধরা ছোঁয়া যায়, বোঝা যায়, এমন অর্থে আধ্যাত্মিতার চর্চার সন্ধান পেলাম। বৃহস্পতির কোনো উপগ্রহে গিয়ে, নভশ্চরদের এ রকম অভিজ্ঞতা হওয়া অব্দি অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন অবশ্য আমাদের নেই। পশ্চিমী মিশনারিরা যখন বৌদ্ধ দর্শনের সন্ধান পেলেন, তাদের এ রকম অভিজ্ঞতাই হয়েছিল।

"Non sai tu che la nostra anima e composta di armonia?"

[Do you not know that our soul is composed of harmony?]

Leonardo da vinci

অনুপ্রেরণা:

রুবিয়া, সুভাষদা, সব্যসাচী, বিপ্লব, শিলাদিত্য, পল্লবী (বোলপুর)

তথ্যসূত্র:

Denis Noble-এর *The Curtain Call; The Artist Disappears* (Oxford University Press, 2008), 'Biology Beyond Genes' প্রবন্ধের ছায়া অবলম্বনে।

ভোর বেলার ফরসা আকাশ, ফাঁকা মাঠের টাটকা বাতাস, নানা রঙের পাতার বাহার, দূরে ঝাপসা ডিগরি পাহাড়, শ্যামা কোয়েল বুলবুল তান, কাকের ডাক সাঁওতাল গান, পলাশ ফুলে ঝক্‌মক্ আলো, আমার লাগে দেওঘর ভালো।

— গিরীন্দ্র শেখর বসু

সাক্ষাৎকার

যৌনকর্মীদের সন্তানদের রাহুল বিদ্যানিকেতন গড়ে ওঠার পটভূমি ও ইতিহাস

সাক্ষাৎকার ও রেকর্ডিং—**সৌমেন গুহ**
রেকর্ডিং অনুলিখন—**মালবিকা সেনগুপ্ত ও শান্তনু ত্রিবেদী**

2016 সালের 6ই নভেম্বর, অনেক দিন পরে ঠিক হলো 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার কাছে-দূরের বন্ধুদের আড্ডা বসবে, কলকাতা থেকে কিলোমিটার দূরে বারুইপুরের কোথাও। জায়গাটা বারুইপুর থেকে ক্যানিং যাওয়ার পথে রামনগর। সেখানেই পথের ধারে 'রাহুল বিদ্যানিকেতন', বন্ধুরা সেখানেই সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাটাবো। অবারিত মাঠ, পুকুর, ছোটো কোলাহল ছোটাছুটির মধ্যে আমরা এসে পড়লাম। সেদিন ছিলো আমাদের পুনর্মিলনের সাথে এক নতুন অভিজ্ঞতার পালা। ছোটো ছেলেমেয়েদের অপাপবিদ্ধ সান্নিধ্যে আমাদের অনেকটা সময় ভরে উঠেছিলো। ওদের সাথেই খাওয়া-দাওয়া, ওদের অনুষ্ঠানে থাকা। তখনই মনে হয়েছিলো, আমাদের 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকায় তো এদের জায়গা দিতেই হবে।

এই শিশুরা ছিলো আমাদের চলতি সমাজে চোখে, হতভাগ্য 'ব্রাত্য'। কারণ তাদের মায়েরা যে 'বারবণিতা', 'বেশ্যা', আজকের নতুন শব্দচয়নে যারা 'যৌনকর্মী' বা 'সেক্স্-ওয়ার্কার' (Sex-Worker)। নিজের ঘরেতে তারা অনাচার দেখেছে, ব্যাভিচার দেখেছে, শৈশবের কাম্য মিষ্টি দিনগুলোতে। বাইরের দুনিয়ায় তারা পিতৃপরিচয়হীন অচ্ছুৎ। তাই বিদ্যালয় শিক্ষার আভিজাত্য থেকে বঞ্চিত। অন্যান্য শিশুদের, ছোটো ছেলেমেয়েদের সাথে মেলামেশার তারা স্বাদ পায়নি। এমন এক সময় যৌনকর্মীদের নিজস্ব সংগঠন 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি' গড়ে ওঠে শিশুদের মায়েদের অধিকার, অস্তিত্ব আর স্বীকৃতির জন্যে। একদিন এই যৌনকর্মী মায়েরা অনুভব করলো, তাদের সন্তানদের দীর্ঘ দিনের এই বিপন্ন অস্তিত্বের সমস্যাটাও সমাধান করতে হবে, নিশ্চিত ভাবে। নতুন প্রচেষ্টা, সংগ্রাম আর পরিশ্রম দিয়ে গড়ে উঠলো 'রাহুল বিদ্যানিকেতন'। এটা কোনো বিদ্যালয় নয়। এটা যৌনকর্মী মায়েদের সন্তানদের আবাসিক কেন্দ্র বা হোস্টেল। এখানে শিশুরা খোলামেলা আলো বাতাসে খেলাধুলো লেখাপড়া নিয়ে থাকে। তারা সাধারণত পড়তে যায় কাছের রামনগর হাই স্কুলে, অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে মিলেমিশে, বন্ধুত্বে, আনন্দে। ওদের জীবন থেকে অন্ধকারের গ্লানি আর কালিমা মুছে দিয়েছে রাহুল বিদ্যানিকেতন।

7 ও 8 ডিসেম্বর 2017, তারই শুরু থেকে গড়ে ওঠার চিন্তা ভাবনা, সংগ্রামের কাহিনী শুনতে সাক্ষাৎ করেছিলাম পুতুল সিং, অক্ষয় মুখার্জী আর ভারতী দের সাথে, দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির কলকাতা অফিসে। দু' দিন ধরে দীর্ঘক্ষণ সাক্ষাৎকারে আমরা জানতে পেরেছি অনেক অজানা তথ্য, কাহিনী। চিরাচরিত সাক্ষাৎকারের ধাঁচে নয়, আমরা ওদের বলতে দিয়েছি নিজেদের কথায়, ভাষায়, আবেগে, স্বতঃস্ফূর্ততায়। প্রশ্ন-উত্তরের ছকে বাঁধতে চাইনি। আর আমাদের পত্রিকায় তার উপস্থাপনাতেও আমরা সেটুকু বজায় রাখতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। কোনো কোনো তথ্যে, তিনজনের বর্ণনায় অসঙ্গতি, মূল ইতিহাস বুঝতে অসুবিধা করবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। তাই তিনজনের বক্তব্যের কোথাও সংশোধন করা হয়নি। সাক্ষাৎকারটি ব্যবস্থা করার ব্যাপারে আমরা আমাদের পুরোনো বন্ধু ডাক্তার স্মরজিৎ জানার কাছে কৃতজ্ঞ।

পুতুল সিংয়ের কথা

পুতুল সিং: নমস্কার। আমি পুতুল সিং। আমি দুর্বারের একজন কর্মী। আজ 25 বছর ধরে এই সংগঠনের সাথে জড়িত।

সৌমেন: বাচ্চাদের কী সমস্যা হয়েছিল, যার জন্যে

মনে হলো এটা করতে হবে?

পুতুল: যৌনকর্মীরা তো নিজের মতো করে জীবন যাপন করছিল, কিন্তু যেটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছিল - যৌনকর্মীদের রাস্তা দেখানোর কেউ ছিল না। তারা যখন পেশায় লিপ্ত হত, তখন বাচ্চারা তাদের সামনেই থাকত। তখন আমাদের মনে হয়েছিল, বাচচারা কী শিখবে? এ ছাড়া তারা এডুকেশন পাচ্ছিল না। সরকার তো বলে বাচ্চাদের কথা। কিন্তু সেই সময় খুব বেছে বেছে স্কুলে নেওয়া হত। যৌনকর্মীদের সন্তান মানেই স্কুলে কোনও এন্ট্রি নেই। তুমি অমুক জায়গায় থাক, তুমি এই স্কুলে পড়তে পারবে না। এবং সমাজের আর পাঁচটা বাচ্চার থেকে কিন্তু আলাদা রাখা হত যৌনকর্মীদের সন্তানদের।

এই সব দেখে আমরা ভাবলাম, আমরা যখন 'দুর্বার' সংগঠন গড়ে তুলতে পেরেছি, আমরা তো একটা ছাতা পেয়েছি - আমাদের সমস্যা হলে আমরা একসাথে মেটাবো। কিন্তু আমরা চাই আমাদের বাচ্চারাও পড়াশুনা শিখুক। তারাও একটা ভাল সমাজ পাক। তারাও স্কুল-কলেজ যাক। এই কথাটা সব মায়েরই মনে ছিল, আমাদেরও মনে ছিল। সেই জায়গা থেকে আমরাই চিন্তা করলাম যে, আমরা বাচ্চাদের জন্য একটা হস্টেল তৈরি করব। কারণ বাইরের হস্টেলে দিতে গেলে প্রচুর টাকা লাগবে, সেই টাকা আমাদের কাছে ছিল না। তা ছাড়া আমাদের আয়ের ঠিক ছিল না। হয়ত আজকে রোজগার হয়েছে - কাল হয়নি। কিন্তু আমাদের অনেক জায়গায় টাকা দিতে হত। বাড়ীওয়ালা আছে, কিস্তিওয়ালা আছে, থানা আছে, পুলিশ আছে, সবাই আমাদের পয়সা মেরে খেত। তার সাথে সাথে সন্তানরাও আছে। এ ছাড়া যার আন্ডারে থাকতাম, তাকেও দিতে হত। এত লোককে দেওয়ার পরে, আমাদের আর কি থাকত! তা থেকে আমরা খাব কি, আর বাচ্চাকে মানুষ করব কি! তো সেই জায়গা থেকে আমরা সবাই একদিন বসে চিন্তা করলাম, যে নিজেদের একটা হোস্টেল হোক।

আমাদের দূর্বারের যে চাঁদা উঠত আর আমাদের অনেক শুভাকাঙ্খীদের সাহায্যে আমরা বারুইপুরে খুব কম পয়সায় একটা জমি কিনে, ছোট্ট বিল্ডিং তৈরি করলাম। তখন 75টা বাচ্চা নিয়ে আমরা হোস্টেলে রাখি। এবার হোস্টেলে রেখে খাওয়া দাওয়া দিলে তো শুধু হবে না, তাদের কে তো কিছু শেখাতে হবে। তাদের তো বড় করতে হবে! সেই ভাবনা থেকে—বাচ্চাদের ফুটবল খেলা শেখানো শুরু হল। এ ছাড়াও খেলাধূলার মাধ্যমে বাচ্চাদের অনেক কিছু শেখানো হতে লাগল। সব মায়ের আর পাঁচটা বাচ্চা যে ভাবে মানুষ হয়, স্কুল কলেজে, সেই ভাবে আমাদের বাচ্চাদেরও তৈরি করা হচ্ছিল। এবার হস্টেলের বাচ্চাদের জন্য বাইরে থেকে খাবার এলে, জানি না কে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাই আমাদের ওই টুকুনি জায়গাতেই শাক, সব্জি লাগিয়েছিলাম, যা থেকে আমাদের বাচ্চারা খাবার পায়। এবং তার সাথে সাথে নিশ্চয় আপনারা শুনেছেন - আমাদের বাচ্চারা প্রত্যেক বছরে সবাই ভাল রেজাল্ট নিয়ে পাশ করে। তার সাথে সাথে খেলাধূলাতেও সুনাম পেয়েছে। ফুটবল খেলতে আমাদের বাচ্চারা তিনবার বিদেশে গেছে। বিদেশে গিয়ে আমাদের বাচ্চারা জয়ী হয়ে এসেছে। সেই জন্য আমাদের অনেক গর্ব যে, আমাদের সন্তানরাও সমাজের আর পাঁচটা বাচ্চার মতো মানুষ হয়েছে, সেভাবে তৈরি হয়েছে, বিদেশ যাচ্ছে। আমরা কখনও ভাবিনি - আমাদের বাচ্চারা বিদেশে গিয়ে এভাবে জয়ী হয়ে আসবে। এর থেকে বড় কিছু হয় না। এ ছাড়াও আমরা মেয়েদের হাতের কাজ, আঁকা ইত্যাদি শেখানোর ব্যবস্থা করেছি। মানে বাচ্চাদের যা যা প্রয়োজন, সব রকম ব্যবস্থা করেছি হোস্টেলে। আমাদের বাচ্চারা আজকে নাচ, নাটক, গান ইত্যাদিতেও পারদর্শী হয়ে উঠছে। আমাদের একটা কালচারাল টিম আছে 'কোমল গান্ধার' - নিশ্চয়ই জানেন। সেই টিমের মাধ্যমে তারা চারিদিকে পারফর্মেন্স করছে। তাদের সবাই ডাকছে শো করার জন্য। এইভাবে আমরা কিন্তু একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছি। এবং আমরা বার বার বলছি যে - আমাদের সন্তানরা আজকে কিন্তু বড় হয়েছে। কিন্তু তারা তাদের মাকে ভুলে যায়নি। কারণ হচ্ছে, মা যে পেশাতে আছে, তারা সেটা জানে এবং তা নিয়ে তাদের মনে কোনও গ্লানি নেই— তারা বুক ফুলিয়ে বলে আমার মা একজন যৌনকর্মী, আমি একজন যৌনকর্মীর সন্তান।

সৌমেন: সে বলে?

পুতুল: হ্যাঁ বলে।

সৌমেন: কিন্তু, খুব প্র্যাক্টিকাল জায়গা থেকে বলছি - স্কুলে বাবা মায়ের নামের জায়গায় কী লেখে?

পুতুল: হ্যাঁ, একটা সময় ছিল কি, বাবার নাম না হলে হত না। সেই জায়গায় আমাদের সংগঠন ভীষণভাবে

লড়াই করে এবং এবং তাদের যুক্তি দিয়ে বোঝায়, জন্ম দিয়েছে তো মা। বাবা তো দশটা হতেই পারে, তো কটা বাবার নাম নেওয়া যাবে! তাই মায়ের নামটাই থাক না।

সৌমেন: আচ্ছা ভীষণ প্র্যাক্টিকাল কথা, বারুইপুরের স্কুল দেখেছি - এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে অনেক টাকার দরকার। এটা এখন একটা ফুল-ফ্লেজেড স্কুল, তার টিচার আছে, আরো সব কিছু আছে। তো এই টাকাটা যোগার হচ্ছে কিভাবে?

পুতুল: হ্যাঁ, আমাদের জায়গাটা আপনারা ঘুরে দেখেছেন - এখানে মাছ আছে, শাক-সব্জি আছে, সেই সব থেকেও আমাদের কিছু রোজগার হয়। এ ছাড়া যাদের বাচ্চারা পড়ে, তাদের মায়েরা কিছু কিছু দেয়। এ ছাড়া দূর্বার, উষা - সেখান থেকেও কিছু ডোনেট করা হয়, যাতে বাচ্চারা খেয়ে পড়ে ভালভাবে থাকতে পারে এবং স্কুলটা ভাল ভাবে চলতে পারে।

সৌমেন: আচ্ছা। কিন্তু বিরাট অঙ্কের টাকা তো, আপনি কি মনে করেন, ভবিষ্যতেও এই ভাবে চালিয়ে যাওয়া যাবে?

পুতুল: একদম। কারণ হচ্ছে কি বলুন তো— এই যে আপনি আজকে ভিজিট করলেন, ভিজিট করে কিছু তো একটা মনে হচ্ছে? এই ভাবে ভিজিট করে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন জিনিস দিয়েছে— কেউ খাট দিয়েছে, কেউ বিছানা দিয়েছে - কেউ হয়ত বই দিয়েছে, এ রকম করে দেয়। নানান প্রয়োজনীয় জিনিস দেয়।

দ্বিতীয় কথা মানুষ ভিজিট করে আনন্দ পায় - ভাবে সত্যি বাচ্চারা এখানে থেকে দাঁড়িয়েছে, তারা আগামী দিনে যদি আরো এগোতে চায় - তো সেই ভেবে সবাই সাহায্য করে। আমাদের বাচ্চারা যে বাইরে যায় ফুটবল খেলতে— সেই জন্য বড় বড় টিম মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল—তাদের জার্সি দেয়, খেলার সরঞ্জাম দেয়। প্রয়োজনীয় সব কিছু দেয়। ওরা সকলের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস দেয়।

সৌমেন: আপনাদের স্কুলটা উচ্চমাধ্যমিক নিশ্চয়? বাংলা মাধ্যমের তো? ইংরেজী মাধ্যম তো নয়?

পুতুল: সব রকম শেখানো হয় - ইংরাজীও শেখানো হয়।

সৌমেন: সে তো মাধ্যমিকেও ইংরেজী শেখানো হয়। মাধ্যমিক কি একবারও হয়ে গেছে?

পুতুল: সেটা আমার ঠিক জানা নেই। ঠিক বলতে পারব না।

সৌমেন: ছেলেমেয়েরা ঠিক কবে থেকে এখানে এসেছিল, ডেট বলতে পারলে ভাল হয়।

পুতুল: হোস্টেল শুরু হয় 1993/94সালে।

সৌমেন: সে তো অনেক বছর আগে - মানে তো অনেক স্টুডেন্ট পাশ করে বেরিয়েছে। তারা কি কলেজে পড়ছে? উচ্চ শিক্ষায় কি তারা যেতে পেরেছে?

পুতুল: হ্যাঁ নিশ্চয়ই। অনেকে গেছে।

সৌমেন: যারা এই হোস্টেল ছেড়ে চলে আসছে - তখন তারা থাকছে কার কাছে?

পুতুল: মায়ের কাছেই। অনেকে মায়ের কাছেই ফিরে আসছে - মায়ের কাছে থেকেই কলেজ বা অফিস করছে।

সৌমেন: কিন্তু তাদের মানসিক ধাক্কা কিছু নেই যে, তাদের মা এ রকম ভাবে আছে?

পুতুল: না, মায়ের প্রতি তাদের ঘৃণা নেই। মা তো তাদের মানুষ করেছে। আমাদের দুটো ভয় ছিল — এক হচ্ছে আমাদের বাচ্চারা চোর গুন্ডা হয়ে যাবে কি না। আর দুই হচ্ছে—বড় হয়ে মাকে মেনে নেবে কি না। তা দুটো সমস্যাই আমরা দূর করতে পেরেছি।

সৌমেন: এই স্কুলটা তৈরির সময় আপনারা নিজেরা কাজ করেছেন? মানে মাটি কোপানো, গাছ লাগানো ইত্যাদি, হাতে কলমে করেছেন?

পুতুল: একদম নিজেরা করেছি।

সৌমেন: বেশ আসলে স্কুলটা তো অনেক বড় জায়গা নিয়ে, কতটা জায়গা বলতে পারবেন?

পুতুল: স্কুলটা তো এতো বড় ছিল না— প্রথমে খুব ছোট জায়গাতেই ছিল। এখন কতটা জায়গা ঠিক বলতে পারব না। অনেক সেচ্ছাসেবীদের সহায়তায় এখন এত বড় হয়েছে।

সৌমেন: এটা আমার একটু জানতে ইচ্ছে করে, ছেলেরা যখন ফিরে এল আবার মায়ের কাছে, তখন একটা সমস্যা তৈরি হবে না?

পুতুল: কোন সমস্যা তৈরি হচ্ছে না।

সৌমেন: হচ্ছে না তো?

পুতুল: হচ্ছে না। যদি হয়েও থাকত। আমরা তো ওদের মানুষ করে দিয়েছি। এখন ওরা যদি মনে করে, ওরা

এর থেকে ভাল জগতে যাবে যেতে পারে। কিন্তু সেটা হয়নি।

সৌমেন: সাধারণভাবে আপনাদের কি জানা নেই - মাকে ছেড়ে চলে গেছে?

পুতুল: না, এ রকম হয়নি। দেখুন সমাজের সব জায়গাতেই ভালমন্দ আছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দেখছি, ছেলেরা মায়ের কাছে তার বউকে নিয়ে আছে। চাকরি পেলে মনে করল কি, মায়ের ঘরটা ছোট, হয়ত মাকে একটা ঘর নিয়ে দিল। মায়েদের ঘেন্না করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সেভাবেই তাদের বড় করা হয়েছে। আমাদের বাচ্চারা যে সকলের সামনে বলছে - হ্যাঁ, আমার মা একজন যৌনকর্মী - এর থেকে খুশির আমাদের আর কিছু নেই। আমরা নিজেরা তো কাজটাকে কখনও ঘেন্না করিনি।

সৌমেন: বেশ খুব ভালো। এই স্কুলটার ব্যাপারে আপনার আর কিছু বলার আছে?

পুতুল: না, শুধু এটাই বলব—যেটা আগে বলেছি - আমাদের দুটো ভয় ছিল - আমাদের সন্তানরা কি চোর গুন্ডা হবে? আর বড় হয়ে মাকে কি তারা ঘেন্না করবে? এই দুটো দিক থেকেই আমরা এই স্কুলের মাধ্যমে সফলতা পেয়েছি।

সৌমেন: বা! খুব ভালো। ঠিক আছে।

অক্ষয় মুখার্জীর কথা

মূলত আমি এই সংগঠনের সঙ্গে 1998-এর গোড়ার দিকে যুক্ত হয়েছিলাম। তখন দূর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির অফিসটি এখানে ছিল না। ছিল কলেজ স্ট্রীটের ওখানে রাজা গেস্ট হাউস নামের রেস্টুরেন্ট কাম হোটেলের বেসমেন্টে। তো আমি এখানে যুক্ত হওয়ার আগে বীরভূমের ওদিকে অন্যান্য কাজ করতাম। পড়াশনা করেছি সোসাল ওয়ার্ক নিয়ে। তারপর এখানে যখন যুক্ত হলাম - দেখলাম এটি যৌনকর্মীদের সংগঠন, সেই সংগঠনে যৌনকর্মীসহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর অধিকার আন্দোলনে কাজ হচ্ছে। তো এসে আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি, সংগঠনের টাইপ - তারপর যখন ডক্টর জানার সঙ্গে আমি বসলাম - উনি অনেক লোকের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিলেন। তারপর যখন আমি কাজে যুক্ত হলাম - একটা টাইমে তখন মূলত শিক্ষার কাজ, স্বাস্থের কাজ বড় ভাবে হচ্ছিল। হঠাৎ একদিন একটা মিটিং হচ্ছিল কালীঘাট খিদিরপুর, সোনাগাছির যৌনকর্মীদের নিয়ে দলগত একটা আলোচনা হচ্ছিল - সেই দলগত আলোচনাতে আমি তখন মিটিংয়ের মধ্যেই ছিলাম - শুনছিলাম তখন - যৌনকর্মীরা তখন বলছিলেন যে আমাদের ছেলেরা যে আমাদের সাথে ঐ পরিবেশে আমাদের সাথে থাকে, সেটা একেবারেই ভাল হচ্ছে না। ছেলেরা সেই অর্থে অসামাজিক হয়ে যাচ্ছে। আপনি আমাদের ছেলেদের জন্য কিছু করুন। ডক্টর জানাকে বল। ডক্টর জানা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের ছেলেদের জন্য কি করার কথা ভাবছেন?' ওনারা বললেন দেখুন আজকে যেমন আমরা যৌনকর্মী একটা আন্দোলনের জায়গায় এসে, আমরা নিজেদের অনেকটা সমাজের কাছে উপস্থাপন করতে পারছি, কিন্তু আমাদের ছেলেদেরকে পারছি না। আমাদের ছেলেদের স্কুলেও ভর্তি নেয় না। আমাদের ছেলেদের বাবার পরিচয় দিতে পারি না। মায়ের পরিচয় দিলে স্কুলে ভর্তি নেয় না। আর আমাদের লোকাল স্কুলগুলোতে ভর্তি করাতে যাই, যখনই আমাদের পরিচয় দিই. ছেলেদেরকে ভর্তি নেয় না। তখন যৌনকর্মীদের নেতৃত্বের জায়গায় ছিলেন মালা সিং, পুতুল সিং। তখন ডক্টর জানা এই যৌনকর্মীদের নেত্রীদের এবং আরো কিছু লোককে নিয়ে বসলেন - যৌনকর্মীরা, তথা যৌনকর্মীগোষ্ঠী চাইছে যে তাদের বাচ্চাদের জন্য শিক্ষামূলক কাজ করা হোক। এবং তাদের আর একটা দাবী, সমাজের আর পাঁচটা বাচ্চা যেমন স্কুলে যায়—আমাদের বাচ্চারাও সেই সুযোগ পাক। যৌনকর্মীরাও তো মানুষ - যৌনকর্মীদের যে অধিকারগুলো রয়েছে, সেই মৌলিক অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত হব না। আমরা চাইছি যে শহরের কোনও একটা জায়গায় স্কুল খোলা হোক আমাদের ছেলেদের জন্য। তখন ডক্টর জানা এবং যৌনকর্মীদের নেতৃত্বে যারা ছিলেন, তারা বললেন ঠিক আছে, তা হলে আমরা সার্বিকভাবে মিটিং ডেকে সিদ্ধান্ত করি, যৌনকর্মীদের সন্তানদের জন্য স্কুল বা আবাসিক যদি কিছু করতে পারি। তখন যৌনকর্মী ও কিছু অযৌনকর্মীদের মধ্যে মতানৈক্য হয়, এটা করে কি হবে বা স্পেশালি এটা করে কি লাভ, ইত্যাদি কথা ওঠে। তখন সার্বিকভাবে সবশেষ সিদ্ধান্ত হয়, যৌনকর্মী শুধু নয়, তাদের বাচ্চাদের অধিকারের লক্ষ্যেও কিছু করা দরকার। তাদের বাচ্চাদের জন্য একটা আবাসিক বিদ্যালয় করব। সেই সিদ্ধান্তের পরে একটা কমিটি হয়েছিল, সেই কমিটিতে আমিও ছিলাম। প্রাথমিক কর্মীদের মধ্যে আমি একজন। আমি যেহেতু বীরভূমের ছেলে, সামাজিক কাজকর্ম, আন্দোলন সম্পর্কে

অভিজ্ঞতা ছিল বলে ডক্টর জানা এবং অন্যান্যরা আমাকে এই কর্মকাণ্ডে সাহায্য করতে বললেন।

সৌমেন: সেটা কোন সাল?

অক্ষয়: সেটা 1998-99 সাল। তখন আমাদের সিদ্ধান্ত হল, জমি দেখতে হবে—কোথায় জমিটা পাওয়া যায়। জমির ক্রাইটেরিয়া ছিল, কম দাম. এবং যে জায়গায় জমি আমরা কিনব, তা যেন শহর থেকে একটু দূরে হয়, যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ রয়েছে, এবং যেখানে আমরা নিজেদের মতো করে, স্কুল সহ অন্যান্য কিছুও তৈরি করতে পারি। তখন সংগঠনের অর্থনৈতিক কাঠামো তো খুব ভাল ছিল না, তাই কম পয়সায় একটু ভাল পরিবেশে জমি পাওয়াটা দরকার ছিল। তো টিম তৈরী করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আমরা জমি দেখতে শুরু করি। জমি দেখতে দেখতে 1999-এর গোড়ার দিকে, বারুইপুরে রামনগর পঞ্চায়েতের অধীনে বেশ কিছু জমি আমরা যোগাযোগ করার পেয়েছিলাম। প্রথমে হোমটা করার জন্য পাঁচ-সাত/দশ বিঘে জমি কিনেছিলাম। বেশী জমি কিনতে পারিনি। জমিটা আমরা লোকাল লোকেদের সহযোগিতায় কিনেছিলাম। তবে তখন জমি আমরা কম দামেই পেয়েছিলাম। পরিবেশ, কলকাতা থেকে দূরত্ব দাম সব দেখে এই জমিটাই নেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। জমি কেনার পর যৌনকর্মীদের সন্তানদের মূল স্রোতে ফেরানোর জন্য আবাসিক তৈরী করাটা তখন মূল চ্যালেঞ্জ হল। জমি কেনার পরেই আমাকে দু-তিন জন কর্মীর সাথে ওখানে পোস্টিং করে দেওয়া হয়। এলাকাটা আপনারা দেখেছেন—এখনকার তুলনায় 1998-99-এ আকাশ-জমিন ফারাক ছিল। ধূ-ধূ-মাঠ - মাইলের পর মাইল শুধু ফাঁকা - তখন একটা পথ ছিল - যেটা ক্যানিং রোডের যে রাস্তা যেখান থেকে গোচরণ বলে একটা জায়গায় যাচ্ছিল। ঐ পথ দিয়ে যত অসামাজিক লোক যাতায়াত করত। রাতের অন্ধকারে ঐ রাস্তা তাদের জন্য খুব সুবিধেজনক ছিল। জমি কেনার পর জানতে পারলাম ঐ এলাকায় কিছু অসামাজিক লোকের বসবাস ছিল।

যা হোক, আমরা প্রথম যখন কাজ শুরু করছি - আমরা ঠিক করেছিলাম প্রথমে পাঁচিল দেব, আর ছোট্ট একটা ঘর তৈরী করব। আমি সেই সময় লিডারশিপে ছিলাম। সেই কাজের শুরুতে এক কোদাল মাটি যখন কাটব - সেই দিনই পঞ্চায়েত থেকে লোক চলে এল। রামনগর পঞ্চায়েত - তখন বামফ্রন্টের আমল - তাদের প্রশ্ন-এ সব কি করছেন? বললাম যৌনকর্মী সন্তানদের শিক্ষার জন্য স্কুল করতে চাই। জিজ্ঞেস করল - আপনাদের পাঁচিল করার প্ল্যান আছে কি না। আমরা বললাম, পাঁচিল করার জন্য কি প্ল্যান লাগে না শুনেছি। একটা সামাজিক কাজ করছি। ওনারা বললেন পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে দেখা করুন - আমাদের কাজ বন্ধ করেছিলেন। প্রধানের সঙ্গে আমরা দু-চার জন মিলে দেখা করলাম। প্রধান বললেন - না, পাঁচিল করলেও প্ল্যান লাগে। আমরা কয়েক দিন গিয়ে পাঁচিলের জন্য প্ল্যানটাও বের করলাম। তারপর কাজ শুরু হয়।

কিন্তু পাঁচিলের কাজ শুরুর সময় আমরা তিনজন ছিলাম সারা দিন রাত। তখন ওখানে এক হাঁটু জল। জোঁকে ভর্তি, কোনও ঘর ছিল না। পাঁচ মাইল। আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। অনেক দূরে মুসলিমদের একটা ছোট এলাকা ছিল। আর রামনগর গ্রামটা ছিল অনেকটা দূরে। আর কিচ্ছু ছিল না। এখন ওখানে প্রচুর পিকনিক স্পট, প্রচুর স্টুডিও—তখন কিছুই ছিল না। তখন খাবার জল আনতে এক কিলোমিটার যেতে হত। আমরা দু-তিন জন - হাঁটু জলে চারটে খুঁটি পুঁতে একটা তালপাতার মাচা করেছিলাম - মশা আর জোঁক থেকে বাঁচার জন্য। সেই মাচার উপরে সারাদিন চারজন বসে থাকতাম। আর খাবার বলতে কিছু নেই। অনেক দূরে কূলতলা বলে একটা দোকান আছে, ওখান থেকে কাঁচা পরোটা নিয়ে আসতাম, আর চিনি বা গুড় কিনে নিয়ে আসতাম। সেটাই আমাদের দিনের বেলার খাবার ছিল।

আমরা কষ্ট করেছি, সেটা বড় কথা নয়—চ্যালেঞ্জের মুখে সেটা মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু সমস্যা হল - আমরা কাজ শুরু করতেই পারিপার্শিক লোকজন মনে করেছিল সোনাগাছির মতো এখানে একটা 'খান্‌কিপাড়া' হবে। এই শব্দটাই বলেছিল। ওখানকার কিছু নেতা, ব্যবসায়ী, দালালরা সাধারণ মানুষকে লেলিয়ে দিয়েছিল—আমাদের বিরুদ্ধে বলেছিল এরা এখানে এসে অসামাজিক কাজকর্ম করবে এবং এখানে একটা 'খানকিপাড়া' করার চেষ্টা করছে। আমাদের কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। আমরা ঠুঁটো জগন্নাথের মতো বসেছিলাম। এই তক্‌মাটা দিয়ে কাজ বন্ধ করা, ওদের কাছে খুব সহজসাধ্য হয়েছিল। আমরা কিন্তু পিছিয়ে আসিনি - আমরা ওখানে বসেছিলাম।

বিভিন্ন জায়গায় শতশত যৌনকর্মীরা ওখানে র‍্যালি

7-B

করেছিল। পঞ্চায়েতে র‍্যালি করেছিল। ওখানে হোমের সামনে তারা দাঁড়িয়ে পড়েছিল যে, 'কে আয় কাজ বন্ধ করবি। তোমরা কাজ কর।' ডক্টর জানা তখন বিশজন, পঞ্চাশজন যৌনকর্মীকে পাঠিয়ে দিতেন। ওরা দাঁড়িয়ে যেত। ওরা চ্যালেঞ্জ দিতো— 'অক্ষয়দা, তুমি কাজ কর দেখি। কে বন্ধ করতে পারে।'

এত বাধা পেরিয়ে কাজটাকে কয়েকদিন আমরা চালিয়েছিলাম। কিন্তু সরকারী ছাঁচের বাইরে কতদিন থাকব? প্রশাসন, সরকারের বিধি একদিকে যাচ্ছে - আমরা অন্যদিকে যাচ্ছি। মানে স্রোতের উল্টোদিকে আমরা কাজ করছিলাম। তখন বাধ্য হয়ে কিছুদিন কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। এটা হল 1999-2000 সাল। তখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ডি.এম. ছিল সম্ভবত আলাপন ব্যানার্জী। এবং চব্বিশ পরগণার এম.এল.এ. ছিলেন সুজন চক্রবর্তী। তখন আমাদের অফিস থেকে একটা টিম বানিয়ে, প্রশাসনিক স্থরের নেতা এবং রাজনৈতিক স্তরের নেতাদের সাথে কথাবার্তা চলতে লাগল। কাজটা হয়ত বন্ধ ছিল - কিন্তু একটা পরিবেশ তৈরি হচ্ছিল। প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ জন, কুড়ি জন যৌনকর্মী প্রত্যেক দিন যাচ্ছিল। আমরা ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমরা ওখানে একটু ভাত ফুটিয়ে চারজন মিলে খাচ্ছিলাম। ওখানে রাতের বেলাতেও পরে থাকতাম আমরা চার পাঁচজন মিলে। এই ভাবে কাজ করার একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি করছিলাম।

আবার প্যারালালি, সরকারী আমলা আর রাজনৈতিক নেতাদের সাথে কথাবার্তা চলছিল। সরকারী আমলারা তো দায় সারার মতো। আর সূজন চক্রবর্তী সেই সময় একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল। বলেছিল, দুর্বারকে আমি চিনি। কিছু সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু যতটা সাহায্য করার কথা, সেটা হয়নি। ডি.এম. আলাপন ব্যানার্জী প্রশাসনিকভাবে আমাদের এই কাজটার প্রতি সহযোগিতা করেছিলেন। আমাদের প্ল্যান ইত্যাদি পঞ্চায়েত স্তর থেকে সরকারীভাবে এই কাজটাকে হ্যাঙ করে দিচ্ছিল। সেই পথটা অনেকখানি পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন আলাপন ব্যানার্জী। পরিকাঠামোটা তৈরী করার বাধাটা আমাদের পরিষ্কার হয়েছিল। তারপর শুরু হল কাজ।

ওখানকার লোকাল লোককে আমি নিয়েছিলাম - রামনগর তার পাশের মুসলিম প্রধান গ্রাম চঙ্গ, সূর্যপুর গ্রাম, উত্তরভাগ ইত্যাদি জায়গার লোকাল লোককে আমি নিয়েছিলাম। এখন আমরা কাজ করি মুর্শিদাবাদের রাজমিস্ত্রি নিয়ে। কিন্তু তখন আমার মনে হয়েছিল লোকাল লোকদের ইন্‌ভল্‌ভ করলে বিরোধিতা অনেকখানি কম হবে। সেই জন্য টোটাল কাজটা আমি লোকাল লোককে নিয়ে করেছিলাম। আর বিশ-পঁচিশ দিন কাজ করার পর লোকাল লোকেদের সথে আমাদের একটা সম্পর্কও তৈরী হয়ে গেছিল।

আর সব বাধা পেরিয়ে তৈরী হল একটি মাটির ঘর, চল্লিশ-পঞ্চাশটি বাচ্চা রাখার মতো। ওপরে টিনের চাল। আর সামনে একটি বারান্দা। তার না[illegible]দওয়া হল রাহুল বিদ্যানিকেতন। রাহুল সংকৃত্যায়ন-এর নাম অনুসারে রাহুল বিদ্যানিকেতন নামটি দিয়েছিলেন ডক্টর জানা। যে দিন থেকে ওখানে গেছিলাম - আর যেদিন ঘরটা তৈরী হওয়ার পর সাইনবোর্ড লাগালাম - এতদিন আমি দাড়ি কাটিনি। একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। এক মুখ দাঁড়ি। আমার পক্স হয়েছিল - ডাক্তারের কাছে যাইনি। আমি ওখানেই পড়ে থাকতাম। দু-একটা ঘটনা বলব সেই সময়কার।

সবে যেদিন বারান্দার গ্রিল লাগানো হয়েছে, লম্বা পাঁচিলের পরেই আমাদের সেই অনেক কষ্টের ঘর - রাহুল বিদ্যানিকেতন। সন্ধে বেলা আমরা কয়েকজন - দূর্গাপুরের বন্ধু বিশ্বও ছিল - সেদিন খুব আনন্দের দিন। তাই আমরা একটা মুরগী নিয়ে এসেছি—চাল কিনে নিয়ে এসেছি - রান্না করে খাব। রাত তখন বারোটা হবে। দেখলাম ঠিক পাঁচিলের গা ধরে জনা পঁচিশ লোক আসছে। আমাদের ঘরে টিম টিম করে হ্যারিকেন জ্বলছে। আর কাঠের উনুনে রান্না হচ্ছে। ওরা এসে আমাকে বলল, 'এই শালা, গ্রিলটা খোল।' আরো বিভিন্ন ভাষায় বলল, গ্রিলটা খুলতে। আমি বললাম, আজকের লাগানো গ্রিল খুলতে গেলে, খুলে যাবে। ওরা বলল- 'কোন দিকে ঢুকব বল।' আমি পেছন দিক দিয়ে আসতে বললাম। ওরা পেছন দিকে ঢুকে এসে, আমায় জিজ্ঞেস করল মেশিন কোথায় তোর? আমি বললাম মেশিন মানে? খিস্তি দিয়ে বলল - মেশিন জানিস না? আমরা বললাম - আমরা তো গরিব মানুষদের হোম তৈরি করতে এসেছি - মেশিন তো জানি না। ওরা খিস্তি দিয়ে বলল, এখানে কাজ করতে এসেছিস—জানিস এটা কোন জায়গা—মার্ডার করে এখানে পুঁতে দিই। আমরা ছ'মাস ওখানে কাজ করে দেখেছি - মার্ডার করে এখান ওখানে ফাঁকা মাঠে ফেলে দিত। বাচ্চা ছেলে। মারা গেলে মাটিতে পুঁতে দিত, আমাদের মেইন গেটের

সামনে। আমি একদিন দেখেছি একজন মহিলাকে - মার্ডার করে ফেলে দিয়ে গেছে - যার মাথা নেই। তারপর পুলিশ এসে তুলে নিয়ে গেল।

এবার ওরা বলল—টাকা কোথায় বল। আমি বললাম আমরা কাজ করতে এসেছি, টাকা কোথায় পাব? আমার কথা শুনে হাতে একটা রড্ ছিল, আমার গায়ে না মেরে ভয় দেখিয়ে দেওয়ালে মারল। টাকা নেই ঘরটা এমনি হচ্ছে? আমি ভদ্র ভাষায় বলছি, আমরা কর্মী আমাদের কাছে টাকা নেই। টাকা তো অফিস থেকে দোকানে দেয়। ইট কেনে। আপনি যা করবেন, করুন, মারুন। ওরা খিস্তি দিচ্ছিল - কিন্তু আমি সবটাই ভদ্রভাষা বলি। আমি জানতাম ভদ্রভাষায় বললে, ওরা আমার কোনও ক্ষতি করবে না। তারপর ওরা, ওদের হাতের তরোয়াল দিয়ে দুটো বালিশ কেটে দিল - টাকা আছে কি না দেখার জন্য। কুড়ি-পঁচিশ জন আমাদের ওই বারান্দায় এপাশ-ওপাশ যাতায়াত করছে। তখন ওদের মধ্যে একজন, আমাদের জামাকাপড় আর টুকটাক যা জিনিস ছিল, তুলে নিচ্ছিল। তখন ওদের মধ্যে যার মুখ কাপড় বাঁধা ছিল, তাকে বললাম - 'দেখুন আমরা এই দুটো ভাত রেঁধে খাই। এই কটা জামা কাপড় নিয়ে নিলে, আমরা কালকে কী পড়ব?'

তারপর চলে গেল। তারপর আবার এসেছিল, কোনও ক্ষতি করেনি। শুধু খোঁজ করল, কি কাজ ঠিকঠাক চলছে তো? এতো গেল রাতের কথা। এ ছাড়া দিনের বেলাতে গুন্ডা-মস্তান, মটর সাইকেল নিয়ে চলে আসত। বলে, কোথা থেকে মাল নিচ্ছ? বললাম, অমুক জায়গা থেকে। বলল- মাল আমি দেব। বললাম, দেখুন আমি তো জানি না। অফিসের ফোন নম্বর দিয়ে দিচ্ছি। অফিসের ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি, আপনি সেখানে কথা বলুন। আমাকে অফিস যেখানে থেকে মাল দেবে, তাই দিয়েই আমি কাজ করাবো। কোথা থেকে নিচ্ছ? এই মন্ডল বিল্ডার্স থেকে মাল নিচ্ছি।

আবার অন্য একদল এসে বলল, তোমরা এখানে কাজ করছ - তোমার মালিককে বলে দিতে, এক লাখ টাকা যেন দেয়। বললাম - বলে দেব। আবার তিন দিন বাদে এসে বলল—অ্যাই বলেছিস? আমি - হ্যাঁ বলেছি। কবে টাকা দেবে? আপনি দেখা করুন। আমি তো বলে দেওয়ার মালিক - বলে দিয়েছি। কি রান্না করেছিস? বলল - মাছ আছে? বললাম খাওয়া হয়ে গিয়েছে। এ রকম সব লোক আসত। টাকাও নেবে - আপনি যা রান্না করবেন, সেটাও খেয়ে নেবে।

প্রথম ঘরটা হওয়ার পর, আরেক যুদ্ধ করে, অনেক বাধা পার করে - রাহুল বিদ্যানিকেতন ঐ ঘরটিকে তৈরি করলাম। আট-দশ জন বাচ্চা নিয়ে শুরু হল। 2001 সাল। তারপরেও একটা ইন্সিডেন্স হয়েছিল। যৌনকর্মী ছাড়া অযৌনকর্মীরা ও রকম একটা ফাঁকা ইন্সিকিওর্ড জায়াগায় যেতে চাইত না। আমি তো ছিলামই - এ ছাড়া এক ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা, ওখানে থেকে হোমটা চালাতে রাজি হয়েছিলেন, দূর্বার পরিচালনায়। কিন্তু তখনও লোকাল কিছু গুন্ডা ভয় দেখাতো প্রতিদিন এসে। টাকা দিতে হবে। এর মধ্যে লোকাল দুটি ছেলে একদিন সন্ধে বেলায় এসে বলল - আমাদের এক লক্ষ টাকা দিতে হবে। ঐ ভদ্রলোক বললেন - যে আমি টাকা কোথায় পাব? ওরা বলল টাকা না দিলে, চালাতে দেব না। এক্স-সার্ভিসম্যান ভদ্রলোক সাহসী ছিলেন। আমি তখন যাতায়াত করি। ইন্‌ফাস্ট্রাক্চার ডেভেলপ ইউনিট হয়ে গিয়েছি। যৌনকর্মীদের নেতৃত্বে ওনারা দুজন দায়িত্ব নিয়ে হোমটি চালাছিলেন। সেই সময় লোকাল অসামাজিক ছেলেটি এসে, টাকা দেওয়া নিয়ে বচসা হয়। সে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসেছিল। বচসার জেরে সেই ছেলেটি গুলি চালিয়ে দেয়। ভদ্রলোক আগেই ছেলেদের যাতে ক্ষতি না হয়, তাই জন্য গ্রিলটা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। যা হোক ভদ্রলোকের হাতে গুলি লাগে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে খবর শুনতে পাই। তারপর আমরা ওনাকে বারুইপুর হসপিটালে ভর্তি করি। বারুইপুর হসাপিটাল থেকে কলকাতার বাঙুর হসপিটালে নিয়ে আসে। এই করতে করতে একটা টাইমে, ওর গ্যাংরিন হয়েছি এবং ঐ ভদ্রলোক মারা যায় বাঙুর হাসপাতালে। সেটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা।

সৌমেন: ভদ্রলোকের নাম কী?

অক্ষয়: ভদ্রলোকের নামটা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। পরে বলে দেব। তারপরে ওনার স্ত্রী আমাদের সঙ্গে ছিলেন। টিচার হিসেবেই ছিলেন। বহুদিন পর তার যখন বয়স হয়ে যায়, তখন তিনি নিজেই বলেছিলেন - আমি আর পারব না। তখন সে চলে গেছিল। যাই হোক, তাকে যতটা সম্ভব সহযোগিতা দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি থেকে করেছিলাম। কিন্তু নতুন হোম স্থাপিত হওয়ার পরেই এ রকম একটা ঘটনা ঘটে গেল। কিন্তু সংগঠনের পক্ষ থেকে যা যা পদক্ষেপ নেওয়া যায়, নেওয়া হয়েছিল। ছেলেটি অ্যারেস্ট হয়েছিল। ছেলেটির কিছুদিন আগে একবার জামিন হয়েছিল এবং অন্যান্য অসামাজিক কাজে আবার লিপ্ত হয়েছিল। আবার

ও জেলে যায়। সেই ছেলেটি মোটামুটি শেষ হয়েগিয়েছে।

এত কিছু ঘটনার পরেও আমরা কিন্তু থেমে যাইনি। এই করতে করতে চলছিল। এর পর বিভিন্ন কর্মী দুর্বার থেকে পাঠানো হয়। আস্তে আস্তে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। তখন আলাপন বন্দোপাধ্যায় অনেকখানি সাহায্য করেছিলেন আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে। বারুইপুর পুলিশ স্টেশন থেকে তখন কয়েক মাসের জন্য একটা ফাঁড়ি করে দিয়েছিল। যাতে আর গন্ডগোল না হয়, ইস্কুলটা ভাল করে চলে। এবং এলাকার লোক বুঝতে পেরেছিল, এদের মানে এই সংগঠনের প্রচুর ক্ষমতা আছে। অসামাজিক লোকেরাও এই ক্ষমতাটা বুঝতে পারল। আস্তে আস্তে তারা পিছু হটল। এ ছাড়া ওখানকার মস্তান, রাজনৈতিক বেশধারী মস্তান, ব্যবসায়ী, যারা পেছন থেকে ইন্ধন যোগাতো, তারাও এই ক্ষমতাটা বুঝতে পারল। বুঝল, এরা এদের লক্ষ্য থেকে সরে যাবে না। তার উপর সেই ছেলেটির যখন কোর্ট থেকে শাস্তি হয়ে গেল, তখন সবাই পিছু হটতে লাগল। এই ভাবে যেতে চলতে, হোমে ক্রমাগত বাচ্চা বাড়তে থাকে। এ রকম প্রশাসনিক সহযোগিতা ছাড়াও, বিভিন্ন রকম সহযোগিতা আসতে থাকে। কত ধরণের মানুষ - সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বড় বড় কোম্পানির লোক, সরকারী বিভাগের প্রচুর লোক নিজের উদ্যোগে সেখানে যেতে শুরু করেছিল। যে যেভাবে পারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিল। সেই ঘটনার পরে, এই কারণে আর আমাদের কাজে আর কোনও অসুবিধা হয়নি।

সৌমেন: সেই ঘটনাটা কত সালে হয়েছিল?

অক্ষয়: সেই ঘটনাটা 2001 আর 2002 এর মাঝে ঘটেছিল।

2002–2003 পর্যন্ত ঐ ক্যাম্পাসটুকুই ছিল—খুব বেশি জমি ছিল না। যৌনকর্মীদের বাচ্চাদের স্কুল করা ছাড়াও, নিজেদের জন্য কিছু করার স্বপ্নও ছিল। যৌনকর্মীদের পরিবারের অনেক বিষয় আশয় ছিল। যেমন অনেক জমি বা পুকুর ছিল, যা তারা ফেলে এসেছে। সে সব কথা বিভিন্ন আলোচনায়, মিটিং-এ সকলে জানতে পারি। যা হোক, সেই যৌনকর্মী দিদিদের মনে হয়েছিল, যদি নিজস্ব কিছু জায়গা কিনে ঘর-বাড়ি-গরু-বাছুর ইত্যাদি করা যায়, তবে ওনারাও মাঝে মাঝে দু-চার দিন সেখানে গিয়ে থাকতে পারেন। ফেলে আসা দিনগুলোকে, একটু হলেও ফিরে পেতে পারবেন। সেই জন্য ঊষা কো-অপারেটিভ ওখানে 10/15 বিঘে জমি কিনল। রাহুল বিদ্যানিকেতনের কথা ভেবে, দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির সঙ্গে একজোট হয়ে। এর পাশে ঊষার ঊষা মাল্টিপার্পাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের কিছু জমি ছিল।

এরপর রাহুল বিদ্যানিকেতনের উন্নয়নের পথে পা দিলাম। সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই বিদ্যানিকেতন দেখতে আসতেন। বিভিন্ন স্কুল কলেজ, ইউনিভার্সিটির, দেশের বাইরের ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা। তখন সরকারী লোকরা, ইন্ডিভিজুয়াল লোকরাও এসে সাহায্য করতে লাগল। হয়ত কারো ভাল লাগল, দশটা বই কিনে দিল। স্টেট ব্যাঙ্ক যেমন ভিসিট করেছে - তারা বাচ্চাদের জন্য দুটো আলমারি দিয়েছে। এইভাবে বহুজন সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল, প্রথম দিকটায়। তখন 2004/2005, এই সময় কিছু ফান্ডিং এজেন্ট ছিল - নরওয়ের একটি ফান্ডিং এজেন্ট দুর্বার যৌনকর্মী সমন্বয় সমিতি ও তাদের সন্তানদের উন্নতির জন্য কিছু টাকা দিয়েছিল। তারা এবার বারুইপুরের বিদ্যানিকেতন ভিসিট করে খুশি হয়ে টাকা দিয়েছিল। আমরা প্রোপোজাল ওদের কাছে দিয়েছিলাম, ছাত্র সংখ্যা বাড়লে ইন্‌ফ্রাস্ট্রাকচারের দরকার ইত্যাদি দেখিয়ে আর্থিক সাহায্য চেয়েছিলাম। তখন তারা যে আর্থিক সাহায্য করে, তা দিয়ে প্রথম ঘরটা থেকে একটু গিয়ে আমরা একটা বিল্ডিং তৈরি করতে পেরেছিলাম। সেই বিল্ডিং তৈরি হতেই আমরা বাচ্চাগুলোকে ট্র্যান্সফার করে ওখানে নিয়ে চলে যাই। বাচ্চাসংখ্যাও দিন দিন বাড়তে লাগল। তখন ওখানে পানীয় জলের খুব সমস্যা ছিল। আমাদের হাজার ফুট টিউবওয়েল আছে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে একটু লেয়ার কমে যেত। তাই তখন চিন্তা হল যে কি করা যায়। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন একটা হাজার ফুটের টিউবওয়েল ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এই ভাবে বিভিন্ন সাহায্যের হাত ধরে কয়েক বছর কেটে যায়। এরপর ঊষার সাহায্যে তখন যৌনকর্মীদের পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর স্বপ্ন মেটানোর জন্য আর দ্বিতীয়ত আবাসিক ছাত্রদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার জন্য, এগ্রিকালচার ল্যান্ড করা হল। সেখানে এখন গেলে দেখতে পারবেন, ধান হয়, বাচ্চাদের খাবার প্রায় অনেকটা হয়ে যায়। জৈব সার দিয়ে কিছু শাক সব্জি হয়, যা বাচ্চাদের চাহিদা অনেকখানি মেটায়। এইভাবে সকলে মিলিত প্রচেষ্টায় বিদ্যানিকেতনের উন্নয়ন খুব তাড়াতাড়ি হয়েছিল সেই সময়।

কিন্তু আবাসিক বিদ্যালয়ে তখন টিচার পাওয়া যেত

না। বাইরের টিচারদের মধ্যেও দ্বিধা ছিল, যৌনকর্মীদে সন্তানদের হোম, ওখানে পড়াতে যাব! তারপর তারা যখন দেখল সমাজের সব ভাল ভাল লোক, সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক সেখানে যাচ্ছে, এবং যার নাম সারা ভারতবর্ষে, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, বিভিন্ন সংবাদে যখন এগুলো ছড়িয়ে পড়ল, তখন তারা নিজেরাই এগিয়ে এল। আমরা বিজ্ঞাপন দিতে লাগলাম, দু ঘন্টা পড়ানোর ইত্যাদি। আমরা লোকাল কর্মী পেতে লাগলাম। প্রশাসনিক স্তর থেকে এম.পি., এম.এল.এ., পঞ্চায়েত প্রধান, ওনারা বিভিন্নভাবে সাহায্য করেতে লাগল। যারা কিনা আগে বিরোধিতা করেছিল। সাংসদের কিছু টাকা দিয়ে খেলার মাঠ করে দিয়েছিল। বর্তমানে তার নাম হল দুর্বার স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। প্রথমে একটা মাঠ ছিল, ঐ মাঠটা ঊষা কিনেছিল। ঊষা সেই জমিটা দান করে দিল। তারপর সাংসদের টাকায় ঐ মাঠ হল। প্যারালালি বিল্ডিং হল। আবাসিকভাবে যারা কাজ করছিলেন তারা থেকে গেলেন। বাইরের লোক আসতে শুরু করলেন। একটা সুস্থ পরিবেশ তৈরি হল। আগে, 2001 সালে বাচ্চাদের মায়ের পরিচয় দিয়ে ভর্তি হওয়ার সমস্যা ছিল। তারপর যখন সুনাম হল, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রামনগর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আমাদের বাচ্চারা পড়ে। প্রথমে সেই স্কুলের মাস্টার বা হেড মাস্টার একটু বাঁকা চোখে দেখতেন। তারপর যখন আইনটা পরিবর্তন হয়ে গেল, বাবার পরিচয় লাগবে না, মায়ের পরিচয়ে বাচ্চা ভর্তি হতে পারবে। তারপর আর কোনও অসুবিধা হয়নি। তারপর পরিবেশটা ঠিক হল। পরিকাঠামোর উন্নয়ন হল। এবার যৌনকর্মীদের সন্তানদের কথা আর যৌনকর্মীদের ফেলে আসা জীবনের ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন, এই দুটোকে মেলাতে চাইলাম। তখন আমাদের গুরু বলব - ডক্টর জানা এই স্বপ্নটাকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে গেছেন - আর অনেকেই এই কাজে ডক্টর জানার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ডক্টর জানা যদি সেদিন লিডারশিপটা না নিতেন, আমার মনে হয় এই হোমটা হত না। এত বাধা বিপত্তিতেও তিনি দমে যাননি, বলেছেন, কিছু হবে না। এগিয়ে যাও।

সৌমেন: আচ্ছা এই ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে পড়ে হচ্ছে রামনগরে। বিদ্যানিকেতনটা স্কুল?

অক্ষয়: সেটা বলছি। বর্তমান পরিস্থিতি, যেটা রাহুল বিদ্যনিকেতন এখন বিশেষভাবে পরিচিত। ক্যানিং রোডে বা স্টেশনের যে কোনও অটো বা বাস-ওয়ালাকে যদি বলেন রাহুল বিদ্যনিকেতন যাব, আপনাকে সসম্মানে পৌঁছে দেবে। রাহুল বিদ্যানিকেতন একটা স্টপেজ হয়েছে। আমি এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বলে বলছি আপনাকে, রাহুল বিদ্যনিকেতন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রশাসনিক স্তর এবং রাজনৈতিক স্তরের আমলা বা নেতৃবৃন্দের কাছে একটা ঐতিহ্য এখন। যেখানে যা ফেস্টিভ্যাল হয়, রাহুল বিদ্যানিকেতনকে নেমন্তন্ন করছে। ওখানের যে কোনও অনুষ্ঠানে নেতা-নেত্রীদের, এম.পি., এম.এল.এ.-কে ডাকলে, ওখানে যান। বর্তমানে এখানে দু-তিনটে বিল্ডিং হয়েছে - 70 থেকে 80 জন স্টুডেন্ট রয়েছে। প্রায় 40 জন ছেলে, বাকীরা মেয়ে। এই বাচ্চারা এখানে থাকে, খাওয়া দাওয়া করে, আবাসিকভাবে পড়াশুনা হয়। তার জন্য ওখানে কিছু রেসিডেন্সিয়াল টিচার রয়েছে। এবং বাইরের কিছু পার্ট টাইম টিচার রয়েছে। মোট প্রায় 15 থেকে 20 জন টিচার রয়েছে। তা ছাড়া এখানে সুপারিন্টেন্ডেন্ট আছে, ইনচার্জ রয়েছে। ওখানে গার্ড রয়েছে, হিসাব রক্ষক রয়েছে। মানে যা যা দরকার, সেটা এখন রয়েছে।

সৌমেন: আচ্ছা যৌনকর্মীদের বাচ্চাদের ওখানে পাঠাতে গেলে, কিছু টাকা দিতেই হয়?

অক্ষয়: হ্যাঁ।

সৌমেন: প্রথম অ্যাডমিশানের সময় কত দিতে হয়? আর মিনিমাম কত বয়সের বাচ্চা নেওয়া হয়?

অক্ষয়: প্রথমে 2000 দিতে হয়, সিক্যুরিটি মানি হিসেবে, যা পরে ব্যাক করে দেওয়া হয়। পাঁচ বছরের উপরের বাচ্চাদের নেওয়া হয়। আর মাসে মাসে 1000 করে দিতে হয়। কিন্তু অ্যাক্টিভিটিটা দিলে আপনি বুঝতে পারবেন - বাচ্চাদের আমরা কী সাপোর্ট করি। পার্ট টাইম আর পার্মানেন্ট টিচাররা পড়াচ্ছেন। তাদের একটা রুটিন রয়েছে, কখন কী পড়াবেন। দু নম্বর হল, টিচার-ইন্-চার্জ রয়েছে ওখানে। তিনি টিচারদের দেখভাল করেন। তা ছাড়া বাইরে থেকে শিক্ষক যান - গান বাজনা করান। খেলার জন্য কোচ যান। তিনি খেলাধূলা করান, বিশেষত ফুটবল। আপনি জানেন হয়ত, এখানকার স্পোর্টস অ্যাকাডেমি, আই.এফ.এ.-র অনুমোদিত। এই স্পোর্টস অ্যাকাডেমির যৌনকর্মীর সন্তানরা দেশে বিদেশে বহু নাম করেছে। দু বছর আগে ম্যাঞ্চেস্টারে একটা খেলা হয়। সেখানে রাহুল বিদ্যানিকেতনের ছাত্ররা প্রতিনিধিত্ব করেছে। গত 2016-তে ডেনমার্কে একটা খেলা হয়—সেখানেও রাহুল বিদ্যানিকেতনের আবাসিকরা, ছিল টিম নিয়ে যোগদান

করেছিল। এবং আই.এফ.এ.-র জুনিয়র এবং সিনিয়র টিমে রাহুল বিদ্যানিকেতনের ছেলেরা খেলছে।

সৌমেন: আচ্ছা মাধ্যমিক পাশ করার পরেও কি কয়েকজন থেকে যায়, এই স্কুলে?

অক্ষয়: না ব্যাপারটা এ রকম নয়। এখানে বাচ্চাদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, কিন্তু ওরা বাইরের স্কুলে পড়ে। ওখানে রাহুল বিদ্যানিকেতনের ছেলেরা এক থেকে দশের মধ্যে থাকে। এরা যদি 3 দিন স্কুলে না যায়, হেডমাস্টার নিজে কল্ করে সুপারিন্টেন্ডেন্টকে, কেন তোমাদের ছেলেরা আসছে না!

সৌমেন: আচ্ছা আমি পুতুল আর ভারতীকেও জিজ্ঞেস করেছি, এই বাচ্চারা পাশ করার পর কী করবে? তারা কি মায়ের কাছে ফিরে যাবে?

অক্ষয়: প্রথম আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছিল - বাচ্চারা মাধ্যমিক পর্যন্ত এই খানে থাকতে পারবে। কিন্তু সকলের সাহায্যে আমাদের ইন্‌ফ্রাস্ট্রাকচার বেড়েছে। আবার অনেক যৌনকর্মীর নিজেদের বাড়ি রয়েছে দেশে। বা কোথাও বাড়ি কিনেছে। সোনাগাছিতে হয়ত সে পেশা করছে, কিন্তু ডায়মন্ডহারবার, বা ক্যানিং বা নর্থে বর্ধমানে কোথাও তার বাড়ি রয়েছে। সেটা ভাল বাড়ি। সেখানে তার মা নিয়ে গিয়েছে, কলেজে ভর্তি করে দিয়েছে। এ রকম দৃষ্টান্ত আছে, লোকাল কলেজে পড়ছে। গ্র্যাজুয়েশান করেছে, তারপর কম্পিউটার নিয়ে পড়ছে, কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। এমনও ছেলেমেয়ে আছে, যারা আর্ট নিয়ে পড়ছে। তার মা গাইড করছে। মা চেয়েছিল, প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত এখানে ছেলেকে যদি মানুষ করে দেওয়া হয়, তা হলে সেটা একটা বড় মাপের কাজ। ঐ বাচ্চা যদি ঐ পরিবেশে থাকত, তবে বাজে অ্যান্টিসোসাল কাজের সাথে লিপ্ত হয়ে যেত। সেইটে অতিক্রম করে, আবাসিক বিদ্যালয়ে যখন আমরা মাধ্যমিক পাশ করিয়ে দিচ্ছি, এই বিদ্যানিকেতনের যা পরিবেশ, যা ডিসিপ্লিন, যা অ্যাক্টিভিটি, তাতে তার পরিবর্তন হয়ে যায়। মাধ্যমিকের পর কোনও মায়ের যদি পড়ানোর মতো কোনও জায়গা, থাকে সমন্বয়কে আমরা বলেছি, ওয়েল, তুমি নিয়ে যাও। খোঁজও নিয়েছি, তারা ভাল আছে। এখন আপনার সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, মাধ্যমিকের পর কোনও ছাত্র ছাত্রী যদি মনে করে যে, আমরা যাব না— আমরা এখানেই পড়ব—তা হলে তাদের আমরা রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। ইতিমধ্যেই আমাদের একজন দু জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে, বারুইপুর কলেজে পড়ছে - কেউ ক্যানিং কলেজে পড়ছে। কেউ আর্ট কলেজে পড়ছে। তারা ওখানে রয়েছে। রমা দেবনাথ বলে একজন নেত্রী রয়েছেন, তার ছেলের সাথে পরিচয় হল। প্রণাম করছিল আমায়। সে আমাদের রাহুলে পড়েছিল। তারপর তার মা নিয়ে গিয়েছিল, হায়ার সেকেন্ডোরী পাশ করে সে গ্র্যাজুয়েশান করেছে। সে এখন আই.টি.আই. পড়ছে । ইলেক্ট্রিশিয়ানের কন্ট্রাক্ট দিচ্ছে কাজের। আমাদের আর একটা বিশেষত্ব আছে। এই ধরুন যখন বাচ্চারা মাধ্যমিক বা হায়ার সেকেন্ডোরী পড়ছে - আমরা স্কিলটা কোথায় তা জানার জন্য বিভিন্ন রকম প্রসেস করি। মিটিং করি- সে যা হতে চায় তার জন্য আমরা প্যারালালি ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছি। পুরোটা করতে পারি না। কিন্তু আগামী দিনে আমরা চাইছি যে, ভবিষ্যতে সে যা হতে চায়, প্রশিক্ষণ দিয়ে সেটাতেও আমরা চেষ্টা করব। যেমন ঊষা করেছে এগ্রিকালচার, ফিসারি....এই গুলো ছোট ছোট মাইক্রো প্রোজেক্ট করেছে। আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে - ভবিষ্যতে যদি কোনও ছাত্রছাত্রীর দেখি চাষবাসের ইচ্ছা আছে—তা হলে আমরা চাষবাসের প্রশিক্ষণ দেব। কেউ যদি মনে করে যে, আমি গাড়ি চালাতে পারব, আমরা যদি পারি ভবিষ্যতে মোটর ট্রেনিং বা ড্রাইভিঙের ট্রেনিং দিতে পারি। এই ভাবে হাতে কলমে শিক্ষা যদি আমরা অ্যারেঞ্জ করতে পারি, সেই প্রশিক্ষণ দেওয়াটাই আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ। আর এখন সবাই মাধ্যমিক পাশ করে চলে যায় না। একটা অফার দিয়ে দিয়েছি - তোমরা থাকতে পার। তারা থাকে।

সৌমেন: শেষ কথা, আপনার কি মনে হচ্ছে। আপনার আর কিছু বলার আছে?

অক্ষয়: দেখুন বারুইপুর হোম সম্বন্ধে আমার বলা থামবে না, শেষ হবে না।

সৌমেন: না যথেষ্ট ইন্‌ফর্মেশান পেয়ে গেছি। আপনার আর কিছু অ্যাড করার ইচ্ছে আছে কি না - যেমন ভবিষ্যৎ পরিকল্পানাও আপনি বলেছেন।

অক্ষয়: না, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আমাদের অনেক আছে। অনেক চিন্তাভাবনা আছে। একবার ভেবেছিলাম যদি ওখানে কোনও ইন্‌স্টিটিউশান বা গবেষণা কেন্দ্র করতে পারি - বা কোনও ট্রেনিং সেন্টার করতে পারি। দেখা যাক্, কতদূর আমরা এগোতে পারি। একটা কথা বলতে ভুলে

গেছি.....

সৌমেন: বলুন

অক্ষয়: এই রাহুল বিদ্যানিকেতন - এই যে হোমটি, এটি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের সোসাল ওয়েলফেয়ার হোম থেকে রেজিস্ট্রেশন করা আছে। বর্তমানে ওরা আবার বিভিন্ন আইন পরিবর্তন করছে। সরকারী আর্থিক সহায়তা হয়ত পাচ্ছি না। কিন্তু রেজিস্ট্রেশান আছে বলে অন্যান্য সাপোর্টগুলো পাচ্ছি। আর সরকারী আর্থিক সহাযতা যদি পাই, তবে রাহুল বিদ্যানিকেতনকে আগামী দিনে আরো উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পারব বলে আশা রাখি।

সৌমেন: আমার একটা কনক্লুসিভ প্রশ্ন আছে - এতো কিছু করার পরে, নিজের কেমন লাগছে!

অক্ষয়: আমি 1998 সাল থেকে যৌনকর্মীদের আন্দোলনের সাথে রয়েছি। রাহুল বিদ্যানিকেতন আমার রক্তে রয়েছে। আগেও বলেছি এক কোদাল মাটি থেকে আজও অবধি রয়েছি। এখনও প্রতি সপ্তাহে দুদিন যাই। এবং রাহুল বিদ্যানিকেতন যাতে এক কদম এক কদম করে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছতে পারে—সেটা আমি চেষ্টা করি। আমি ডক্টর জানা স্যারকেও বলি, আমি যদি কোনও দিন এই সংগঠনের কাজ শারীরিকভাবে না করতে পারি, মানসিকভাবে আমি কিন্তু পাশে থাকব।

সৌমেন: নিশ্চয়ই আপনার বুকটা অনেক বিস্তৃত হয়ে যায়?

অক্ষয়: আমি বলি, ডক্টর জানা আমাকে অনেক দিন ধরেই বলছেন, রাহুল বিদ্যানিকেতন নিয়ে কিছু লিখতে। আমি বলেছি, যদি লিখতে পারি লিখব। তো আমাকে যখন আপনার কথা বলল, আমার বুকটা বড় হয়ে গেল। রাহুল বিদ্যানিকেতনের জন্য প্রথম থেকে যা করে যাচ্ছি—মানে যে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি, তো সেখানে রাহুল বিদ্যালিকেতনের ইতিহাসটায় আমি যে একজন সৈনিক ছিলাম - সেটা যদি কোনও লেখার মাধ্যমে স্বীকৃতি পায়, আমার হৃদয় ভরে যাবে।

সৌমেন: নিশ্চয় এই লেখা বেরোবে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাকর্মী'র আগামী সংখ্যায়। অনেক ধন্যবাদ।

সৌমেন: ভারতীদি, আপনি কবে থেকে কিভাবে দুর্বারের সাথে যুক্ত হলেন?

ভারতী: আমি ব্যারাকপুরের বাসিন্দা ছিলাম। 1997 সালে দুর্বার সমন্বয় কমিটি এইচ আই ভি প্রতিরোধে চালু হওয়া স্বাস্থ্য প্রকল্পের কাজে আমাদের এলাকায় কাজ করতে যায়, সেই সময় ওদের সাথে পরিচয় হয় এবং সেই থেকে এই প্রকল্পে আছি।

সৌমেন: শুনেছি, আপনি রাহুল বিদ্যানিকেতন তৈরীর পরিকল্পনার দিন থেকেই এর সাথে যুক্ত ছিলেন। এ সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা যদি একটু জানান।

ভারতী: আমাদের দুর্বারের এক সভায় অনেক আলোচনার মধ্যে থেকে একটা বিষয় ক্রমে প্রাধান্য পেতে থাকে যে, এইড্স সম্পর্কে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে যেমন আমাদের ক্লিনিক তৈরী হয়েছে, যৌনকর্মীরা আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর হতে, যেমন ঊষা কো-অপারেটিভ সাফল্যের সাথে কাজ করছে, আমাদের ছেলেমেয়েদের করা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিশেষ করে নাচ-গান-নাটক, যেমন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, তেমনই আমাদের ঘরের বাচ্চাদের শিক্ষিত করে, মূলস্রোতে ফেরানোর জন্য একটা নিজস্ব ব্যবস্থা থাকা দরকার। সকলে একমত হল যে, নিজেদের জায়গা আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা থাকার ব্যবস্থা, নিজেদের স্কুল আমাদের গড়তেই হবে। সেই থেকে শুরু।

সৌমেন: তারপর? কিভাবে গড়ে উঠল বারুইপুর সংলগ্ন এই হোম?

ভারতী: সকলে বিভিন্নভাবে জায়গায় সন্ধান করতে লাগল। একজন মারফৎ বারুইপুরের কাছে প্রথমে চার বিঘে জমির এই প্লটটি দেখা হল। দামও বেশ কম। তা ছাড়া চারদিক বেশ ফাঁকা নিচু জলাজমি আর ধান ক্ষেত, মাইলের পর মাইল। বড় গাছপালাও ছিল বেশ কিছু। বারুইপুর স্টেশন থেকে কাছে, কিন্তু বেশ নিরিবিলি। সকলের পছন্দ হয়ে গেল। 4 বিঘে জমির পুরোটাই কিনে নেওয়া হল। পরে অবশ্য আরো কিছু জমি কেনা হয়েছে।

সৌমেন: শুনেছি বহু বাধা এসেছিল হোম তৈরীর বিভিন্ন পর্যায়ে। কি করে সে সব বাধা অতিক্রম করলেন?

ভারতী: আমাদের সাহস, সংকল্প ও লেগে থাকার ক্ষমতার

জন্যই, এই হোম গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। যেদিন প্রথম গাঁথা হবে, সেদিন থেকেই স্থানীয় মস্তান তথা বিল্ডার্স-সাপ্লায়ার্সরা শাসিয়ে গেল, ওদের কাছে মালপত্র না কিনলে, ওদের মিস্ত্রি দিয়ে কাজ না করালে, একটা ইঁটও গাঁথতে দেবে না। চলল চোখ রাঙানি, বিভিন্নভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা, প্রায় প্রতিদিন।

সেই সময় পুলিশ-পঞ্চায়েত-প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানানো-বোঝানো-আলোচনার চেষ্টা হল। এতেও বিশেষ কাজ না হওয়াতে, ধর্না মিছিল ইত্যাদিও করতে হল। তখন প্রতিদিন শয়ে শয়ে যৌনকর্মী সে সমস্ত ধর্না মিছিলে অংশ নিয়েছে। এত সবের পর কিছুটা বাধা পেরোনো গেল। আরম্ভ হল বিল্ডিং তৈরীর কাজ। সেই সময় মিস্ত্রী-যোগানদারদের উপর হামলা রুখতে, প্রতিদিন পালাকরে যৌনকর্মীরা থাকতেন। মিস্ত্রীদের পাশে থেকে সাহস যুগিয়েছেন। বাইরের যে কোন রকম আক্রমণ রুখেছেন। এইভাবে আস্তে আস্তে আমাদের স্বপ্নের হোমের ঘর তৈরী হল।

সৌমেন: কত জন ছাত্রছাত্রী হোমে ভর্তি হয়েছিল?

ভারতী: সে আর এক গল্প। আমাদের হোম তৈরীতে বাধা দিতে না পেরে, স্থানীয় কিছু মানুষ রটিয়ে দিল, এখানে একটা সোনা গাছির মত রেড লাইট এরিয়া তৈরী হবে। অসামাজিক কাজকর্ম চলবে হোমের ভিতর। রামনগর, সূর্যপুর, উত্তরভাগ সহ আশপাশের সমস্ত গ্রাম না কি অসামাজিক কাজের পীঠস্থান হয়ে উঠবে। তাই কোনভাবেই হোম চালু করা যাবে না। বিভিন্ন ছুতোয় বাধা দিতে আরম্ভ করল। অসহযোগিতা চলতেই থাকল। এর সঙ্গে বিভিন্ন রকম হুমকি ও টাকা আদায়ের চেষ্টা তো ছিলই। এত ঝামেলার মধ্যেও আমরা ওখান থেকেই একজনকে সর্বক্ষণের রক্ষী হিসাবে নিয়ে; দুজন দুর্বারের সহযোগী থেকে শিক্ষক বাছাই করে এবং মাত্র চারজন ছেলেমেয়ে নিয়ে হোম চালু করলাম। সেই থেকে এ হোমের যাত্রা শুরু হল।

সৌমেন: তখন থেকেই হোমটি চলছে?

ভারতী: না, না। শুরুর পরই ঝামেলা বাড়তে লাগল। কিছু লোকের চোখ রাঙানি উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। অবশেষে একদিন দুষ্কৃতিরা ঐ রক্ষীকে একদম সামনে থেকে গুলি করে দিল, স্পট ডেড। রক্ষীর মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই সকলে ভীষণ ভয় পেলাম। শিক্ষক ছাত্রছাত্রী সকলেই হোম ছেড়ে চলে এল। হোম বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু আমরাও ছাড়লাম না। সকলের এক শপথ, এ লড়াইয়ে জিততেই হবে। হলও তাই। পুলিশ-প্রশাসনকে বিভিন্ন উপায়ে চাপ দেওয়ায় খুনী গ্রেপ্তার হল। কিন্তু সকলকে অবাক করে মাসতিনেকের মধ্যেই ফিরে এল। এতে ছেলেমেয়েদের মায়েরা ছেলেমেয়েদেরকে ওখানে পাঠাতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। কেউই থাকতে সাহস পাচ্ছিল না। ফলে হোম বন্ধই থাকল বেশ কিছুদিন।

এই অবস্থায় আমরা আবার প্রশাসনের উচ্চ মহল, বিভিন্ন মাপের নেতার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে খুনীকে আবার গ্রেপ্তার করাতে সক্ষম হই ও বিচারে দশ বছরের কারাদন্ড হয়। হোম আবার চালু হয়।

সৌমেন: এখন কী অবস্থা?

ভারতী: অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ঐ বদমাইসদের কেউ আর সহজে কাছে ঘেঁসে না। আশপাশের গ্রামের লোকজন দোকানদার সকলেই কমবেশী সাহায্য করে। এটা যে কোন অসামাজিক কাজের কেন্দ্র হয়নি বা হবে না, এ ব্যাপারটা এতদিনে তারা কিছুটা বুঝেছে। বাইরে থেকে অনেক ধরণের শিক্ষিত লোকজন এখানে যাওয়া আসা করে। এ সব থেকেও ওরা কিছুটা আমাদের কাজের ধরণের আন্দাজ পেয়েছে। শুধু তাই নয়, আশেপাশের এলাকারও অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ার মত। অনেক দোকান-পাট, রিসর্ট, কারখানা ইত্যাদি হয়েছে। আগে বিদ্যুৎ ছিল না। এখন ঘরে ঘরে আলো জ্বলে, পাখা চলে। বারুইপুর স্টেশন থেকে আসা যাওয়াও অনেক সহজ হয়েছে, পরিবহন রাস্তা ঘাটের উন্নতির জন্য। খুব অল্পদিনের মধ্যেই আশপাশের সামজিক চেহারাটাই অনেক পাল্টে যাচ্ছে।

আমাদের হোমের ছেলেমেয়েরা এখন শুধুমাত্র নিজেদের মায়েদের পরিচয়েই আশেপাশের বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। এ ব্যাপারেও এক সময় বাধা ছিল। পিতৃ পরিচয় ছাড়া স্কুলে ভর্তি নিতে চাইত না। ছেলেমেয়েরা পড়াশুনাতেও মোটামুটি ভাল। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন মাধ্যমিক পাশ করে, বিভিন্ন ভোকেশনাল ট্রেনিং নিয়ে চাকরী-বাকরী করছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এইচ.এস. পড়ছে দু জন। একজন গ্রাজুয়েট হয়েছে। আরও একজন বি.এ.র দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছে। এ ছাড়াও গান বাজনা নাচ, বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতায় ওরা অংশ গ্রহণ করে। একটা মাল্টি-জিম আছে, খেলার জন্য ফুটবল অ্যাকাডেমি গড়া হয়েছে। হোমের

লাগোয়া বিশাল মাঠ, পুকুর, ধানক্ষেত। সব দিক থেকেই এখন ছেলেমেয়েদের মূলস্রোতে ফিরে আসবার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করতে পেরেছি।

সৌমেন: ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক পাসের পর কী করে? তাদের কি আবার সেই আগের জায়গাতেই ফিরে যেতে হয়?

ভারতী: না না। বরং উল্টোটাই। আমরা চাই ওরা হোমে থেকে যত বেশী দিন পারে পড়াশুনা চালিয়ে যাক। বিভিন্ন ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠুক, আত্মবিশ্বাস, মর্যাদা বোধ তৈরী হোক। এখন তো আমরা চাইছি, ওদের মধ্য থেকেই হোমের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক তৈরী করতে, ওদেরকে হোমের বিভিন্ন কাজে যুক্ত করতে। তবে সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের হোমের শিক্ষকদের প্রতিমাসে যে টাকা দেওয়া হয়, তা খুবই কম। এখনই অনেক টাকা দেওয়াব ক্ষমতাও নেই। তাও এখন চেষ্টা চলছে, যাতে তাঁদের জন্য কিছু বেশী অর্থের ব্যবস্থা করা যায়।

সৌমেন: এখন কতজন এই হোমে থাকে?

ভারতী: বাচ্চা আছে সত্তর জন। বিভিন্ন বয়সের। ছয় বছর থেকে আরম্ভ করে আঠেরো-কুড়ি অব্দি। একজন রাধুনী, ক্রেসমাদার ছ জন। সংখ্যাটা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। সিকিউরিটি গার্ড আছে একজন, প্রধানত রাতপাহারার জন্য। এগারো জন শিক্ষক। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ডাক্তার আসেন। দু জন সর্বক্ষণের কর্মী আছেন, যারা সংলগ্ন জমির চাষবাস দেখাশোনা করেন। পুকুরে মাছ চাষ হয়। হোমের বাইরে তাদের থাকার বন্দোবস্ত আছে। আপনার শুনলে ভাল লাগবে যে, হোমের ছেলেমেয়েরা এখানে উৎপন্ন চাল, শাকসব্জি, মাছ, এমন কি গরুর দুধও খেতে পায়, বছরের বেশীর ভাগ সময়। ভাল জাতের কয়েকটা গরু-ছাগল আছে। হাঁস মুরগীও পালন করা হয়। ক্রেসমাদাররাই বাচ্চাদের দেখভালের সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি সমস্ত কিছুই তারা সামলান। এমন কি প্রয়োজনে রাধুনীকেও সাহায্য করেন।

সৌমেন: আপনাদের এই বিশাল কর্মযজ্ঞের জন্য তো বিশাল পরিমাণ টাকার প্রয়োজন, তাই না? এত টাকার যোগান আসে কী ভাবে?

ভারতী: বাচ্চাদের মায়েদের কাছ থেকে মাসিক এগারোশো টাকা নেওয়া হয়। এবছর, 1918 থেকে তেরোশো করে নেওয়া হবে। ভর্তির সময় অগ্রিম হিসাবে তিন হাজার টাকা নেওয়া হয়। হোম ছাড়ার সময়, তা থেকে দু হাজার টাকা ফেরত দেওয়া হয়। ঐ এক হাজার টাকা হোমের উন্নয়ন বাবদ রাখা হয়। যৌনকর্মীদের তৈরী ঊষা কো-অপারেটিভ থেকেও কিছু টাকা পাওয়া যায়। 1997 সালে 'নোরা' (NORA) আমাদের এই প্রকল্পের জন্য এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়, যা ঊষা ব্যাঙ্কে জমা আছে। তা থেকেও মাসিক প্রায় এক লাখ টাকার উপর আসে। এ ছাড়াও 'ফ্রেন্ডস অফ দুর্বার' আছে। ঐ সব বন্ধুরা এবং বেশ কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী বিভিন্নভাবে হোমকে সাহায্য করেন। এইভাবে বিভিন্ন সোর্স থেকে টাকা যোগার হয়ে যায়।

সৌমেন: আপনাদের এত রিসোর্স, আপনারা শুধুমাত্র শিশুদের জন্য হোম না করে, যৌনকর্মীর ছেলেমেয়েদের জন্য একটা নিজেদের বিদ্যালয় তৈরী করলেন না কেন?

ভারতী: সেটা ঠিক হ'ত না। আমরা অনেক তর্ক বির্তক, আলোচনার পর সচেতনভাবে এই রকম স্কুল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিনি। কারণ, এই রকম বিদ্যালয়ে যে সব ছাত্রছাত্রী পড়ত, তারা প্রথম থেকেই সমাজের কাছে চিহ্নিত হত একটা বিশেষ পরিচয়ে, যা হয়তো শিশুকিশোরদের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগত, হয়তো বা হীনমন্যতায় ভুগতো। এ সব ছোটদের সুস্থ মানসিক বিকাশে সহায়ক হত কি? তাই আমরা ঠিক করেছিলাম, হোমের ছেলেমেয়েরা মূলস্রোতের বিদ্যালয়গুলোতেই অন্য সকলের সাথে মিলেমিশে, খেলাধূলা-পড়াশোনা করে বড় হোক। প্রথম দিকে এতেও একটু অসুবিধা হত। এখন রাহুল বিদ্যানিকেতনের শৃঙ্খলাপরায়ণ এই সব ছাত্রছাত্রীদের স্থানীয় স্কুলের সকলেই ভাল চোখেই দেখে। এ ক্ষেত্রেও আমরা সফল হয়েছি অবশ্যই।

সৌমেন: আমার শেষ প্রশ্ন। আপনাদের এই সফল উদ্যোগ সম্পর্কে আপনার আর বিশেষ কিছু কি বলতে ইচ্ছে করে? তেমন কিছু কথা আছে কি?

ভারতী: দেখুন আজ দুর্বার পঁচিশ বছরে পৌঁছুবে। জন্মক্ষণ থেকে আজ পর্যন্ত, পথটা কিন্তু মসৃণ ছিল না। শুধুই চ্যালেঞ্জ, লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই আজ যৌনকর্মীরা তাদের অনেক অধিকার আদায় করে নিতে সফল হয়েছে। তাদের আইডেন্টিটি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। তারা যেমন কর্মীর মর্যাদা পেয়েছে তেমনি সমবায় গড়ে তুলেছে। নিজের নামে ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে পারে, নিজেদের ছেলেমেয়েদের

মূলস্রোতের বিদ্যালয়ে সকলের সাথে মিলেমিশে পড়াশনা করাতে পারে। এ সব অধিকার এসেছে অনেক আলোচনা, আন্দোলন, বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে। আজ প্রতিটি যৌনপল্লীতেই বেশ কিছু মাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়ে পাওয়া যাবে। পনেরো বছর আগে যা ভাবাই যেত না।

আমরা চাই আমাদের হোমের ছেলেমেয়েরা শুধু পড়াশুনা নয়, খেলাধূলাতেও সমানভাবে পারদর্শী হয়ে উঠুক। জানেন তো আমাদের ছেলেদের একটা ফুটবল টিম আছে - যারা বহু টুর্নামেন্টে জিতেছে। ঐ টিমের দুজন ফুটবলার বিদেশের মাটিতে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের ইচ্ছে, আগামী দিনে আমাদের মেয়েদের একটা ফুটবল টিম তৈরী করার। সে জন্য বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা নিশ্চিত, আগামী দিনে প্রতিটি ক্ষেত্রের মত, এই ফুটবল টিম তৈরী করতেও অবশ্যই সফল হবো।

প্রসঙ্গ: চিকিৎসা

একটি অভিজ্ঞতা

দিলীপ বৈদ্য

[কথায় বলে শরীর, ব্যাধিমন্দিরম্। শরীর থাকলে ব্যাধি থাকবে, এতে আর আশ্চর্যের কী? রোগ যেমন আছে, তেমন রোগের নানা রকম চিকিৎসার ব্যবস্থাও রয়েছে। অবশ্য সকলে সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। যাইহোক, বর্তমান নিবন্ধে অভিজ্ঞতা বর্ণনাকারী একজন রোগিনীর স্বামী। বর্তমানে তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত আধাসরকারী কর্মী। তিনি কলকাতা শহর থেকে 65 কি.মি. দূরের এক গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁর অভিজ্ঞতা মিলবে না। তবু তা শুনলে মনে হয়, অনেকের মন্দ লাগবে না। সেই আশায় এখানে বিশদভাবে সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হল।]

কয়েক বছর আগে, আমার স্ত্রীর শরীরে এমন কিছু উপসর্গ দেখা গেল, যেগুলো দেখে শুনে অভিজ্ঞজনেরা বললেন যে, সেগুলো সব উচ্চ রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করা বৃদ্ধির উপসর্গ। গেলাম একজন বয়স্ক এম.বি.বি.এস (জেনারেল ফিজিসিয়ান) ডাক্তার বাবুর কাছে। তিনি সব দেখে শুনে এবং প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করানোর পর, সাত মাসের ওষুধ লিখে দিলেন। হজমের গোলমাল হয়, তার জন্য একটা ঔষুধ। ঘুমের অসুবিধা হয়, তার জন্য একটা। থাইরয়েডের প্রবণতা আছে, তার জন্য একটা ঔষুধ। রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য একটা ওষুধ। উচ্চ রক্ত চাপ কমিয়ে আনার জন্য একটা ওষুধ, ইত্যাদি। এই ভাবে রোগিনী যত অসুবিধার কথা বলেন, তত ওষুধের সংখ্যা বেড়ে যায়।

যাইহোক, এই সব ওষুধ এক বছর ধরে চলছে। এমন সময় স্ত্রীর চোখের সমস্যা দেখা দেয়। বড় চক্ষু হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর কথামত চোখের ফেকো সার্জারি করাতে যাই। গিয়ে দেখা গেল রক্তে শর্করার পরিমাণ না কমলে সার্জারি সম্ভব নয়। ডাক্তারবাবুর কথামত চললো ইনসুলিন ইনজেকশন। বেশ কয়েক দিন পর ডাক্তারবাবু বললেন, এবার সার্জারি করা যাবে বটে, তবু এ ব্যাপারে বেশ ঝুঁকি রয়েছে। আমি বোকার মত বললাম, সার্জারি করুন, কিছুই হবে না। ডাক্তারবাবু মৃদু হাসলেন। তারপর—এক বছরের মধ্যে পর পর দুটো চোখে সুষ্ঠুভাবে ফেকো সার্জারি হয়ে গেল। পাঁচ ছ বছরের মধ্যে চোখের কোন সমস্যা হয়নি।

এর পর এলো হাঁটুর ব্যথা ও যন্ত্রণা। নামকরা অলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দেখালাম। ছ, আট মাসেও কোন সুফল পাওয়া গেল না। এমন সময় ভিন রাজ্যে প্রস্তুত এক আয়ুর্বেদিক ওষুধের সন্ধান পাই। সেই ওষুধ খেয়ে যন্ত্রণা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। ব্যথাও 80 শতাংশ কমে গেল। মোটকথা রোগিনী আগের চেয়ে সচ্ছন্দে হাঁটাচলা করতে লাগলেন। বর্তমানে সে ওষুধ আর খেতে হয় না।

এর দুবছর পর রোগিনীর পা এবং পায়ের পাতা

ফুলে গেল। এলাকার নামজাদা এবং এম.বি.বি.এস ডাক্তারবাবুর কাছে গেলাম। তিনি আগের ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপশন দেখলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই সব ওষুধ বজায় রাখলেন। বেশ কিছুদিন সেই ওষুধ খাওয়ার পরও ফোলা কমার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

এরপর গেলাম পশ্চিম বাংলার এক নামী বেসরকারী হাসপাতালে। সেখানকার ডাক্তারবাবু সব দেখে শুনে, পঁচিশটা পরীক্ষা করানোর নির্দেশ দিলেন। রাজ্যের এক বিখ্যাত ল্যাব থেকে পরীক্ষাগুলো করালাম। অত্যন্ত দুর্বল রোগিনীকে চোদ্দ ঘন্টা কিছু না খাইয়ে খুব কষ্ট করে পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো করাতে হয়েছে। এক সময় এমন অবস্থা হয়েছিল যে, রোগিনী মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন।

যাইহোক পরীক্ষার পর রিপোর্টগুলি নিয়ে আবার সেই বেসরকারী হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর কাছে গেলাম। তিনি 14 রকমের ওষুধ লিখলেন। এই 14 রকম ওষুধ খেতে খেতে দেখা গেল যে, একটা ওষুধ খাওয়ার পর রোগিনীর অত্যন্ত বমির ভাব হয়। তা শুনে ডাক্তারবাবু আর একটা ওষুধ লিখে দিলেন। এবার ওষুধ হল 15 রকম। এর মধ্যে ইনসুলিন ইঞ্জেকশনও ছিল। এই 15 রকম ওষুধ চলতে চলতে ডাক্তারবাবুর নির্দেশমত রোগিনীর চোখের পরীক্ষা করানো হয়।

ইতিমধ্যে পায়ের যে ফুলো কমেছিল তা আবার বেড়ে গেল। দেখে শুনে ডাক্তারবাবু এক কিডনি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে নির্দেশ দিলেন। সেই মত রাজ্যের প্রখ্যাত এক বয়স্ক এম.ডি. কিডনি বিশেষজ্ঞের কাছে গেলাম। তিনি সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্ট দেখে, আগের ডক্তার বাবুর নির্দেশিত 4টে ওষুধ রেখে, সেই সঙ্গে আরও 7টা ওষুধ যোগ করলেন। তার মানে তাঁর ওষুধ হল 11 রকম। এর মধ্যে ছিল কিডনির জন্য 3 রকম, সুগারের জন্য 2 রকম এবং হাই ব্লাড প্রেসারের জন্য 2 রকম ওষুধ। আগের ডাক্তারবাবু পরের ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপশন মেনে ওষুধ খেয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। ফলে বাতিল হল আগের 15 ওষুধ এবং শুরু হল পরের 11 টা ওষুধ। আগেই বলেছি এর মধ্যে আগের 4টে ওষুধ ছিল। কিডনি বিশেষজ্ঞের নির্দেশিত ওষুধ খেতে খেতে দশ দিন পর পায়ের পাতার ফুলো সম্পূর্ণ উবে গেল। কিন্তু রোগিনীর জ্বর ও সর্দি কাশি হল। দু দিনের মধ্যে খাওয়া ত্যাগ করলেন তিনি। সব কিছু তেতো লাগছে বলে কোন খাদ্যবস্তু মুখে তুললেন না এইভাবে চারদিন ধরে কোন কিছু না খাওয়ার ফলে, শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে গেল। একা হেঁটে ঘরের পাশের বাথরুমেও যেতে পারতেন না। এই অবস্থায় আবার বমির ভাব হোত। সেই সঙ্গে নাক মুখ দিয়ে সর্দি বের হোত। সেই সময় কোনভাবে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এমন কি কোথাও তাঁর ফোন নম্বর বা ই-মেল আইডি পাওয়া যায়নি। ডাক্তারবাবু যে কোন কারণে হোক ফোন নম্বর কাউকে জানান না। রোগিনীর অবস্থা দেখে এক স্থানীয় ডাক্তার প্রথমে ক্যালপল ও টেক্সিমো 200 খেতে দেন। তাতে জ্বর না কমায়, রক্ত পরীক্ষা করানো হয়। তার রিপোর্টে খারাপ কিছু পাওয়া যায়নি। কিন্তু জ্বর না কমায় সেই ডাক্তারবাবু জোসেফ সি.ভি. 500 এম জি ও পলিভিয়ান সিরাপ দেন। ট্যাবলেটটা 9টা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এটাই কোর্স। কিন্তু এক দিকে সম্পূর্ণ খালি পেট, মিনিটে মিনিটে কাশি ও বমিভাব, সেই সঙ্গে সর্দি বের হওয়া, সব মিলিয়ে শরীর খুব দুর্বল। একা পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারেন না। একা পাশের বাথরুমে যেতে পারেন না। শরীর থর থর করে কাঁপে। এই অবস্থায় বোকার মত পুরানো সব ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিলাম। এইভাবে কিছু না খাওয়া তিন চার দিন কেটে যাবার পর, রোগিনীকে যেভাবে হোক কিছু খাওয়ানোর প্রয়োজন মনে করলাম। তাই এক ডাক্তারবাবুর পরামর্শে, স্থানীয় এক নার্সিং হোমে রোগিনীকে ভর্তি করে দিলাম। আশা, যে ভাবে হোক, ওখানে রোগিনীকে খাওয়ানো যাবে। সেখানে স্যালাইনের মাধ্যমে দু দিন ধরে কিছু খাওয়ানো হল। এই কথা শুনে আমার পূর্বোক্ত বেসরকারী হসপাতালের ডাক্তারবাবু রেগে বলেছিলেন—'স্যালাইন খাবার নাকি? সে তো শুধু জল।' এই 'জল' খেয়ে কিন্তু দু তিন দিনের মধ্যে জ্বর সেরে গেল। শারীরিক দুর্বলতা বেশ কেটে গেল। এক কথায় রোগিনী বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন।

অন্যদিকে আরেক উপসর্গ দেখা দিল। কদিন প্রায় সব রকম চালু ওষুধ বন্ধ রাখার ফলে, পায়ের পাতাও পা বেশ ফুলে গেল। এই অবস্থায় ঠিক করলাম, এবার সেই কিডনি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেব। সেই মত তাঁর কাছে নাম লেখাতে যাই। এই নাম লেখাতে গিয়েও ঝামেলা । তিনি আমার বাড়ি থেকে 26 কিমি দূরে একটা ওষুধ দোকানে সপ্তাহে একদিন বসেন। সেখানে নিয়ম একদিন আগে নাম লেখাতে হয়। পুরানো রোগী হওয়া সত্ত্বেও, প্রেসক্রিপশন

দেখাতে পারিনি বলে নাম লেখানো গেল না। ফলে অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্তেও ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করা গেল না। অনুরোধ করে বললাম যে, রোগিনী নার্সিং হোমে ভর্তি আছেন। কিডনি বিশেষজ্ঞের কথামত কয়েকটা পরীক্ষাও করিয়ে এনেছি। সুতরাং এ সময় তাঁর পরামর্শ অত্যন্ত জরুরী। তবুও হল না। তাই ফিরে আসতে হল। এ রকম এক পরিস্থিতিতে সেই বেসরকারী হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর কাছে সব ঘটনা জানিয়ে ই-মেল করলাম। তিনি জানান যে, ঠিক সেই সময় তিনি তাঁর গুরুতর অসুস্থ এক প্রিয়জনকে নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন। কারণ প্রিয়জনটি তখন ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি ছিলেন। ফলে তাঁর সঙ্গে যেন এক সপ্তাহ পরে যোগাযোগ করা হয়। ফলে আমি অত্যন্ত নিরুপায় হয়ে পড়লাম। কারণ তখন আমার রোগিনীর অবস্থা সংকটজনক।

তারপর অনেক ভেবেচিন্তে আমি বোকার মত কিডনি বিশেষজ্ঞের প্রেসক্রিপশন বাদ দিলাম এবং উক্ত বেসরকারী হাসপাতালের ডাক্তারবাবু নির্দেশিত একটা সুগারের ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেট ঘেঁটে দেখলাম। যতগুলো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা বলা হয়েছে, আমার স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রায় সবগুলো দেখা গেছে। চিকিৎসা চালাকালীন সুগারের যে ওষুধটা প্রথমোক্ত ডাক্তারবাবু কিছু দিন পর বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কিডনি বিশেষজ্ঞ সেই ওষুধটা আবার লিখেছিলেন এবং তার পাওয়ার 15 এমজি থেকে 40 এমজি করে দিয়েছিলেন।

এই সব ঘটনার টানা পোড়েনে, প্রায় 7 দিনের মত সময় সব রকম ওষুধ খাওয়া বন্ধ ছিল। তার ফলে সুগার অনেক বেড়ে গেল। এই ঘটনার কথা ই-মেল করে বেসরকারী হাসপাতালের সেই ডাক্তারবাবুকে জানাই।। কিন্তু তিনি ই-মেলের উত্তর না দেওয়ায় তাঁকে ফোন করি। তিনি অত্যধিক সুগার বাড়ার কথা শুনে রেগে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—কিডনি বিশেষজ্ঞ ইনসুলিন বন্ধ করলেন কেন? নার্সিং হোম কেন রোগিনীকে ছেড়ে দিল। নার্সিং হোম রোগিনীকে কি ভাবে খাইয়েছেন, এ সব বিশদ বলতে গেলে, তিনি আরও রেগে বললেন—আপনি একা শুধু বলে চলেছেন! আমার প্রশ্নের উত্তর দিন! আসলে ডাক্তারবাবু কিছু কথা ভুলে গেছেন। কারণ ইনসুলিন 6 ইউনিট করে 5 দিন তিনি দিতে বলেছিলেন। তারপর থেকে বন্ধ আছে।

এত খরচ করে, এত ঝামেলা সহ্য করে, যখন মনের মত চিকিৎসা করা গেল না, তখন স্থানীয় একজন সমাজমনস্ক গরীব-দরদী এম.বি.বি.এস.(মেডিসিন)-এর শরণাপন্ন হলাম। তিনি শহরের এক বেসরকারী হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। এই ডাক্তারবাবুর সুচিকিৎসায় আমার স্ত্রী বর্তমানে অনেক ভালো আছেন। সবচেয়ে বড় কথা হল, তাঁর সঙ্গে যে কোন সময় পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করা যাচ্ছে।

যাইহোক, যে তিন চারজন ডাক্তারবাবুর সান্নিধ্যে আমি গিয়েছি, তাঁরা অত্যন্ত বড় মাপের ডাক্তারবাবু। তাঁদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ অনুযোগ নেই। তবে সমগ্র ঘটনাটি আমাকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। প্রশ্নগুলো পরপর সাজানো হচ্ছে।

(1) পৃথিবীর সব দেশের অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারবাবুরা কি কোন রোগীকে এক সঙ্গে 15/16 টা ওষুধ খেতে দেন?

(2) কোন রোগীকে বেশি পাওয়ারের ওষুধ দেওয়ার আগে, রোগীর শারীরিক অবস্থা এবং সেই ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া কি ডাক্তারবাবুর ভালো করে জেনে নেওয়া উচত নয়?

(3) একটা ওষুধের দশটা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া থাকলেও, সকল রোগীর ক্ষেত্রে সবগুলি নাও দেখা যেতে পারে। কিন্তু যখন কোন রোগীর বেশির ভাগ পার্শ্বক্রিয়া দেখা যায়, তখন কি ডাক্তারবাবুর উচিত নয়, বিকল্প ওষুধের ব্যবস্থা করা?

(4) বারবার রোগীকে সোডিয়াম পটাসিয়াম পরীক্ষা করতে বলা হচ্ছে। পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, দুটো কমে যাচ্ছে। তখন তার জন্য ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। অথচ, অন্য কোন রোগের জন্য রোগীকে অন্য যে ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে, তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হল সোডিয়াম পটাসিয়াম কমিয়ে দেওয়া। তা হলে সোডিয়াম পটাসিয়াম বাড়ানোর জন্য প্রদত্ত ওষুধটা কতটুকু কার্যকরী হবে?

(5) সুগার নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক ডাক্তারবাবু এমন ওষুধ দেন, যাতে রোগীর কিডনির বা অন্য কোন প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হয়। এ ক্ষেত্রে কি 'সেফ ড্রাগ' খোঁজা উচিত নয়?

(6) রাজ্যের প্রখ্যাত কোন প্যাথলজিক্যাল ল্যাব থেকে কোন বিষয়ে পরীক্ষার পর, কোন রিপোর্ট নিয়ে যদি কোন প্রখ্যাত ডাক্তারবাবু সন্দেহ প্রকাশ করেন, তা হলে মানুষ কোথাকার ল্যাবে পরীক্ষা করাতে যাবে?

(7) একই রোগীকে একজন ডাক্তারবাবুর উপদেশ—

একবেলা কেন দুবেলা ভাত খাবেন না, কাঁচা নুন খাবেন না, দেড় লিটার জল খাবেন। অন্য ডাক্তারবাবু বলেছেন—দুবেলা ভাত খাবেন, চা চামচের এক চামচ নুন খেতে পারেন, জল পান করতে পারেন আড়াই লিটার। দুজন ডাক্তারবাবুই বড় মাপের। এই অবস্থায় মানুষ বিভ্রান্ত হবে না কি?

(8) ডাক্তারবাবু রোগীকে বলছেন, হাইপারটেনশন ত্যাগ করুন। কিন্তু আশ্চর্য রোগীর এতটুকু দুশ্চিন্তা নেই। তাঁর স্বামী, সন্তান, পরিবারের অন্য কারুর বিষয়ে কিংবা কোন আত্মীয় স্বজন বিষয়েও কোন রকম দুশ্চিন্তা নেই। তবে কমবেশি চিন্তা সব মানুষের থাকে। সেটাকে নিশ্চয় দুশ্চিন্তা বলা যায় না। তা হলে কি ডাক্তারবাবু ডাক্তারি শাস্ত্রমতে বলতে হয় তাই বলছেন?

(9) কোন কোন ডাক্তারবাবু নিজের ফোন নম্বর বা ই-মেল আইডি কেন রোগীর অভিভাবককে জানাতে চান না? এর ফলে জরুরী অবস্থায় কত অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে, তা কি ডাক্তারবাবুর জানা নেই?

(10) সংশ্লিষ্ট ডাক্তারবাবু কোন বিষয়ে এম.ডি. কিংবা কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা ট্রেনিংপ্রাপ্ত তা স্পষ্ট করে লিখে রেখে মানুষকে জানানোর অসুবিধা কোথায়?

(11) অনেক ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশনে ওষুধের নাম ইচ্ছা করে এমনভাবে লেখেন, যা অনেক ওষুধ দোকানীও পড়তে পারেন না। এই কৌশলের দরকার কি? এর ফলে রোগী তো ভুল ওষুধ খেতে পারে।

(12) অনেক সময় রোগীর অভিভাবক সংশ্লিষ্ট ডাক্তারবাবুকে রোগীর কী রোগ হয়েছে জিজ্ঞেস করলে রেগে যান। কিন্তু কেন? তিনি তো রোগের নাম বলতে ও লিখতে দায়বদ্ধ। রোগী বা তাঁর অভিভাবক শিক্ষিত কিংবা শিক্ষাবঞ্চিত, যাই হোন না কেন, তাঁকে তো সংক্ষেপে বলা যায়— রোগটার নাম এই এবং এই রোগে এই এই ঘটে। এমন বললে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

(13) যে কোন ডাক্তারবাবুর কি বদমেজাজী হওয়া উচিত? আমাদের দেশে অসংখ্য শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের বাস। তাঁরা অপ্রাসঙ্গিক কোন কথা বলতেই পারেন। অনেকেই ডাক্তারবাবুর প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে গুছিয়ে দিতে পারেন না। এতে ডাক্তারবাবু যিনি কিনা 'দ্বিতীয় ঈশ্বর', যিনি কিনা 'ক্রিম অব দ্য সোসাইটি', তিনি রাগ দেখাবেন কেন?

(14) কোন রোগীর সুগার 549 দেখেও ডাক্তারবাবু কি করে বলেন - "ভয়ের কোন কারণ নেই।"

এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেলে আমি 73 বছর বয়সে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করতে পারি।

এশীয় মনোচিকিৎসার পথিকৃৎ গিরীন্দ্রশেখরকে বিস্মরণ ও ধ্বংসলীলা

সৌমেন গুহ

আমার বাড়ি থেকে বন্ডেল গেটে গেলে কেমন মনটা ভারী হয়ে যায়। লেভেল ক্রসিঙের পূর্ব দিকে কবরডাঙা থেকে সরু একটা রাস্তা অনেকটা লম্বা, নাম 'ডাক্তার গিরীন্দ্র শেখর বোস রোড'। আর লেভেল ক্রসিঙের পশ্চিম দিকে আরো সরু একটা রাস্তা, নাম 'যামিনী রায় সরণী'। ভাবতে কেমন লাগে, আমরা দুটি মহাতীর্থের ধ্বংসাবশেষের মাঝখান দিয়ে যাই, যে মহাতীর্থ বাঙালীর অজানা, অজ্ঞাত, অবহেলিত ও অন্ত্যজ। পশ্চিম পারে সে মহাতীর্থ ছিল, শিল্পী যামিনী রায়ের বাড়ি। আর পূব দিকে মহাতীর্থ ছিল, গিরীন্দ্র শেখর বসুর 'লুম্বিনি পার্ক মেন্টাল হস্পিটাল'। লজ্জায় মাথা হেঁট হওয়ার বদলে, আমাদের অশিক্ষিত, অকৃতজ্ঞ ঐতিহ্য একই রকম উদ্ধত থাকে।

মহামূল্যবান মনোচিকিৎসার আন্তর্জাতিক পত্রিকার বাঁধানো কয়েক খন্ড পনেরো টাকা কিলো দরে কিনেছিলাম। বইগুলোর আসল মালিক ছিলো মনোচিকিৎসক গিরীন্দ্র শেখর বসু। যখন কিনেছিলাম তখনও জি. বোস লেখা ছিলো বাদামী চামড়া-বাঁধানোর গায়ে।

প্রায় পঁয়তিরিশ বছর আগের কথা। তখন কলেজ

স্ট্রীট পাড়ার পুরোনো বইয়ের বহু বিক্রেতার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তাদের একজন খবরটা দিলো — 'এক্ষুনি এসো। গিরীন্দ্রশেখরের বই কিলো দরে বিক্কিরি হয়ে যাচ্ছে।'

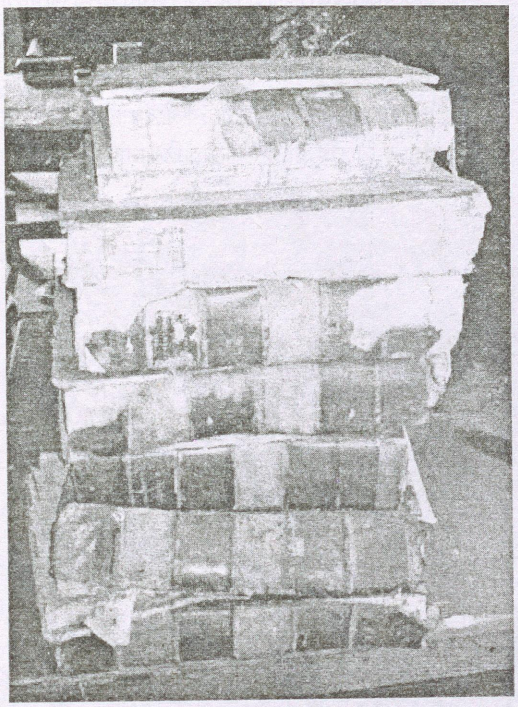

বুকে একটা ধাক্কা খেলাম। ছুটে গেলাম কলেজ স্ট্রীটে। তখনও কয়েকটা খন্ড পড়ে আছে। বইগুলো পুরোনো বইয়ের গোলা কিনেছিলো 2 টাকা কিলো দরে। বা হয়তো তার থেকে কমে! আমি তারই কয়েকটা পেয়ে গেলাম! কারা বেচেছে বইগুলো? নিশ্চয়ই গিরীন্দ্রশেখরের ঘনিষ্ঠ লোকজন। তার বাড়ি, পরিবার, সহকর্মী, সংগঠন? কারা এ বইগুলো বেচে দিয়েছে, আন্দাজ করা ভীষণ সহজ। আমাদের অশিক্ষিত অকৃতজ্ঞ ঐতিহ্য! এতো অবহেলা, অবজ্ঞা শুধু নয়, এতো অপরাধ! তার পরেও অহংকার? এ লজ্জা, অন্যায়, অপরাধের দায় আমাদের সবার।

'গিরীন্দ্র শেখর বসু', আমার কাছে এক আশ্চর্য নাম। আমার কুষ্ঠিয়া আবাসনের থেকে পাঁচ-সাত মিনিট হাঁটলে 'লুম্বিনি পার্ক মেন্টাল হস্‌পিটাল' মেয়েদের বিভাগ। আসতে যেতে সহস্রবার দেখেছি। আজ থেকে প্রায় পঁয়তিরিশ বছর আগে, আমাদের 'মানস' সংগঠনের কর্মী হিসেবে, লুম্বিনি পার্ক মানসিক হাসপাতালের এই মেয়েদের আউটডোরে ডাক্তারবাবুদের সাহায্যকারী হিসেবে যেতাম। তখন ডাক্তার ব্যানার্জী আর ডাক্তার দেব ওই আউটডোরে তাঁদের রোগী দেখার সময় আমি সারাক্ষণ কাজ দেখতাম, নোট নিতাম, সীমাবদ্ধ সাহায্য করতাম। সেই নোটখাতা এখনও আছে। তার পর, এক সময় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার Lumhini Park Mental Hospital Acquisition Act 1984 আইনটি বলবৎ করলো লুম্বিনি পার্ক হাসপাতাল অধিগ্রহণ করার জন্যে। এতো দিন হাসপাতালটি 'সোসাইটি ফর মেন্টাল কেয়ার' আর 'ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিকাল সোসাইটি'র তত্বাবধানে চলতো। কিন্তু 1984 সাল থেকে এবার সরকার এই হাসপাতালের দায়িত্ব নিলো। এই আইনের প্রথমেই ভীষণ আশাব্যঞ্জক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, '.....the acquisition of the Hospital known as the Lumbini Park Mental Hospital at No.115, Girindra Sekhar Bose Road, Kolkata-39 (in the district of 24-Parganas) for its better management and maintenance in the public interest....'। কিন্তু বাস্তবে এক ভয়ানক দুর্দিন নেমে এলো লুম্বিনি পার্কে। অচিরেই কর্মীরা দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে, লাগাতার ধর্মঘট করতে নেমে পড়লো! তখন দেখতাম, ডাক্তার, নার্স, আয়া বিহীন হাসপাতালের এই মহিলা বিভাগে, অর্ধ নগ্ন, প্রায় নগ্ন মহিলারা এলো চুলো, স্নানহীন, খাদ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে, অনেকে সারা দিন। সাধ্য মতো পরিচিত সাংবাদিক, আলোকচিত্রী বন্ধুদের এনে চেষ্টা করলাম খবরটা প্রকাশ করতে। কিন্তু খবর প্রকাশেও কারো কোনো উদ্বেগ হলো না। সবাই সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত একেবারে নীরব। অবশেষে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকদেখানো লোকঠকানো প্রতিশ্রুতির স্বরূপ বেরিয়ে পড়লো। সেই ইংরেজ আমলের রাজকীয় পুরাতন অট্টালিকাটি ভেঙে ধূলিস্যাৎ করা হোল। লুম্বিনি পার্ক হাসপাতাল মহিলা বিভাগের এতোকালের বাড়িটি, যে অঞ্চলটির নাম ছিল 'নাটোর পার্ক', চিরকালের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নাটোর পার্কের রাস্তা ধরে কিছুটা দূরে ছিলো, একটা ঘিঞ্জি বাড়িতে, লুম্বিনি পার্ক মানসিক হাসপাতালের পুরুষ বিভাগ। সেটায় মহিলা বিভাগের অবশিষ্ট জিনিসগুলো নিয়ে

চলে গেল। এতো বড়ো ঘটনায়, কোনো আলোড়ন হলো না, কোনো খবর হলো না।

আমি ভাবি, এশিয়ার কোনো প্রতিযোগিতায় সামান্য একটু ব্রোঞ্জ পেলে, তাকে তো লোকজন সংবাদমাধ্যম মুরুব্বিরা মাথায় তুলে রাখে। আর, এশিয়াতে প্রথম হলে তো 'গোল্ডেন গার্ল' খেতাব পর্যন্ত পায়। বাড়ি গাড়ি নগদ টাকা খেতাব, 'অর্জুন' 'পদ্মশ্রী' আরো কত কি! কই, গিরীন্দ্র শেখর বসু কিছু তো পেলো না!

মনোচিকিৎসার জন্যে নাম লেখালো। শুরু হওয়ার প্রথম বছরেই মোট 174 জন রোগী এই বিভাগে মনোচিকিৎসার জন্যে এসেছিলো।

এর পর 1940 সালে গিরীন্দ্র শেখর বসুর উদ্যোগ ও পরিচালনায় কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'লুম্বিনি পার্ক মেন্টাল হসপিটাল'।

গিরীন্দ্র শেখর তার ডক্টরেটের গবেষণাপত্র 'কন্সেপ্ট অফ রিপ্রেশান' নিজেই পার্শিবাগানের ঠিকানা থেকেই

এই 'নাটোর পার্ক'-এ পুরোনো অট্টালিকাতেই ছিলো 'লুম্বিনি পার্ক মানসিক হাসপাতাল'-এর মহিলা বিভাগ। এটা এখন নিশ্চিহ্ন। জঙ্গলাকীর্ণ জমিটি এখন প্রোমোটারের বেড়া দিয়ে ঘেরা।

আজ থেকে পঁচাশি বছর আগে, 1933 সালে এশিয়ায় প্রথম মনোচিকিৎসা বহির্বিভাগ বা 'সাকিয়াট্রি আউটডোর' চালু হলো, গিরীন্দ্র শেখর বসুর উদ্যোগ ও পরিচালনায়।

1 মে 1933 সালে, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রথম মনোচিকিৎসা বহির্বিভাগ খোলা হলো। আর 2 মে 1933 তারিখে প্রথম রোগী এখানে

প্রকাশ করেছিলো। এটা হাতে পেয়ে আনন্দিত সিগ্‌মান্ড ফ্রয়েড প্রথম গিরীন্দ্র শেখরের মনোবিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়, তা এদের চিঠিপত্রেই পাওয়া যায়। এটা খুব আশ্চর্যের নয় যে, গিরীন্দ্র শেখরের সেই 'কন্সেপ্ট অফ রিপ্রেশান' তখনকার 'দ্য ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট' পত্রিকায় (অক্টোবর 1921) অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনার মুখে পড়ে। অবজ্ঞা অবহেলার সেই তো শুরু, আজও অব্যাহত।

With best Compliment
from

MALAYADRI SARKAR

GOVT. CONTRACTOR
&
GENERAL ORDER SUPPLIERS

KHADIMPUR, BALURGHAT,
Dist: DINAJPUR
Mob: 9851977636

Vigyan O Vigyankarmi
Reg. No. 34929/79

Rs. 50

Vol.XL, No.1-4
January 2017 - December 2017

লজ্জা!

বিপন্ন শৈশব

বায়ু দূষণ রোধ করুন

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ
(পরিবেশ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

বর্ণ সংস্থাপন রেখা চক্রবর্তী, স্বপ্নরেখা গ্রাফক্স, গ্রাম ও ডাক ময়দা, দক্ষিণ 24 পরগণা, ফোন 7384185775
'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাকর্মী' পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে
আদি জয়কালী প্রেস, গোয়াবাগান, কলকাতা থেকে মুদ্রিত।